পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

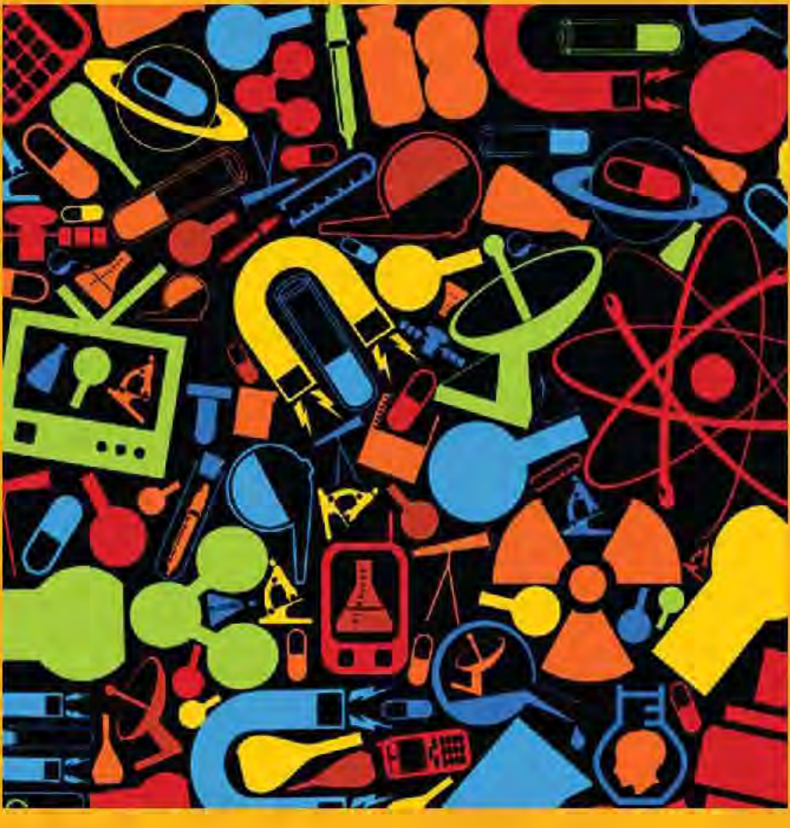

পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

তাম্রলিপি
38/2 ka, Banglabazar, Dhaka -1100

উৎসর্গ

যারা ঠিক করেছে বড় হয়ে বিজ্ঞানী হবে

ভূমিকা

আমি বহুকাল থেকে পদার্থবিজ্ঞানের একটা পাঠ্যবই লিখতে চেয়েছিলাম, আজ আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। বইটি লেখা শেষ হয়েছে– তবে এ ধরনের বই কখনো শেষ হয় না। প্রতি বছর বইয়ের পরিবর্তন হয়, নূতন বিষয় সংযোজন হয়, কাজেই এই বইটির বেলাতেও তাই হবে। প্রতিবছরই এর একটু পরিবর্তন হবে, একটু নূতন কিছু যোগ হবে।

এটি নবম-দশম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। এই বয়সী ছেলেমেয়েদের পদার্থবিজ্ঞান শেখার জন্য কী কী পড়া উচিত সে বিষয়ে আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে; কিন্তু বইটি লেখার সময় আমি আমার চিন্তাভাবনাকে বাক্সবন্দি করে তাদের যে পাঠ্য বইটি আছে সেই বইটির বিষয়গুলোর মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছি। সেই বইয়ে যা ছিল তার প্রায় সব কোনো না কোনোভাবে এই বইয়ে আছে, কিছু কিছু জায়গায় একটু বেশি আছে। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক সহজ বিষয় নবম-দশম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে না অজুহাতে তাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হয়। আমি আড়াল করে রাখিনি– উদারভাবে কিছু কিছু উদাহরণ হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

তবে কোনো ছেলেমেয়ে যেন ভুলেও মনে না করে যে এটি পড়ে তারা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবে! এটি মোটেও পরীক্ষায় ভালো নম্বরের জন্য লেখা হয়নি– এটা লেখা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞান শেখার জন্য। আমি আমার মতো করে বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করেছি, নিজ হাতে প্রতিটি ছবি এঁকে অনেক উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলো সহজ করার চেষ্টা করেছি।

তবে আসল পাঠ্য বইয়ের সাথে এখানে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। ঠিক কী কারণ জানা নেই আমাদের পাঠ্য বইয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রাশিগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করে ফেলা হয়। ইলেকট্রনকে আমি ইলেকট্রন বলি কিন্তু চার্জকে কেন আধান বলি সেটি আমার কাছে একটা রহস্য। সবচেয়ে বড় কথা এখানে যে ছেলেমেয়েটি চার্জকে আধান বলতে শিখছে– দুই বছর পরেই সে যখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান শিখবে তখন কিন্তু তাকে সেটাকে চার্জই বলতে হবে– তাহলে কেন মাত্র কয়েক বছরের জন্য শুধু শুধু একটা বিচিত্র শব্দ শিখতে হবে?

কাজেই এই বইয়ে আমি পদার্থবিজ্ঞানের রাশিগুলোর যে নামে তাদের পরিচিত হওয়া উচিত সেই নামগুলো ব্যবহার করেছি। ব্রাকেটে মাঝে মাঝে বিচিত্র নামগুলো দিয়ে রেখেছি যেন ছেলেমেয়েরা জানে কোনটা কী! ইংরেজি চার্জকে বাংলা আধান লেখায় তবু জোর করে হয়তো একটা যুক্তি দাঁড় করানো যায় কিন্তু আয়নার মতো চমৎকার একটা বাংলা শব্দকে কেন দর্পণ বলতে হবে, সেটি আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকেনি– কোনোদিন ঢুকবে না।

এখানে সবাইকে আরো একটা জিনিস মনে করিয়ে দিই। পদার্থবিজ্ঞান শেখা মানে নয় কিছু সংজ্ঞা মুখস্ত করা। পদার্থবিজ্ঞান শেখা মানে সমস্যার সমাধান করতে পারা। এই বইয়ে অনেকগুলো সমস্যা উদাহরণ হিসেবে দেয়া আছে তাই কারো যদি পদার্থবিজ্ঞান শেখার ইচ্ছে হয় তাদেরকে এই উদাহরণগুলো প্রথমে নিজে নিজে করার চেষ্টা করতে হবে। বইয়ের শেষে যে অনুশীলনী আছে সেগুলো সবাইকে করতে হবে। শুধু তাহলেই মনে করবে পুরো বইটা পড়া হয়েছে।

এই বইটা লেখার সময় আমি আমার নিজের লেখা থিওরী অব রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, একটুখানি বিজ্ঞান এবং আরো একটুখানি বিজ্ঞান বইগুলো থেকে কিছু অংশ ব্যবহার করেছি। বইয়ের কিছু অনুশীলনী তৈরী করার জন্যে David Halliday এবং Robert Resnick এর লেখা আমার প্রিয় পদার্থবিজ্ঞানের বই Physics থেকে সাহায্য নিয়েছি।

এই বইটি একটা এক্সপেরিমেন্ট! যদি দেখা যায় এই এক্সপেরিমেন্ট ঠিক ঠিক কাজ করেছে তাহলে পরের এক্সপেরিমেন্টগুলো শুরু করে দেয়া হবে!

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

সূচি

1. প্রথম অধ্যায়: ভৌত রাশি আর তার পরিমাপ		...	11
2. দ্বিতীয় অধ্যায়: গতি	...	...	23
3. তৃত্বীয় অধ্যায়: বল	...	...	51
4. চতুর্থ অধ্যায়: কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি	...	...	79
5. পঞ্চম অধ্যায়: পদার্থের অবস্থা ও চাপ	...	...	109
6. ষষ্ট অধ্যায়: বস্তুর উপর তাপের প্রভাব	...	...	131
7. সপ্তম অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ	...	...	151
8. অষ্টম অধ্যায়: আলোর প্রতিফলন	...	...	167
9. নবম অধ্যায়: আলোর প্রতিসরণ	...	...	189
10. দশম অধ্যায়: স্থির বিদ্যুৎ	...	...	217
11. একাদশ অধ্যায়: চলবিদ্যুৎ	...	...	239
12. দ্বাদশ অধ্যায়: বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া	...	...	263
13. ত্রয়োদশ অধ্যায়: আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্স		...	277
14. চতুর্দশ অধ্যায়: মানুষের জন্যে পদার্থবিজ্ঞান		...	301
15. পরিশিষ্ট-1	...	...	309
16. পরিশিষ্ট-2	...	...	311
17. পরিশিষ্ট-3	...	...	313

প্রথম অধ্যায়

ভৌত রাশি আর তার পরিমাপ

(Physical Quantities and Measurement)

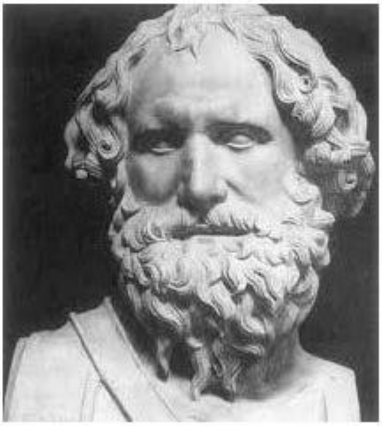

Archimedes (287 BC-212 BC)

আর্কিমিডিস

আর্কিমিডিস ছিলেন একজন গ্রিক গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, আবিষ্কারক এবং জ্যোতির্বিদ। তিনি একদিকে যেমন গোলকের আয়তন, পাইয়ের মান, অসীম সিরিজের যোগফল এ ধরনের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছেন, ঠিক সে রকম অন্যদিকে পানি উপরে তোলার জন্য স্ক্রু পাম্প, শত্রুর যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করার জন্য বিচিত্র যন্ত্র কিংবা দূর থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য বিশেষ আয়না তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন গণিতবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। তাঁর শহর রোমান সৈন্যরা যখন দখল করে নেয় তখন তিনি একটা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কোনো ক্ষতি না করার নির্দেশ থাকার পরও একজন রোমান সৈন্য তাঁকে হত্যা করে ফেলেছিল।

1.1 বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান (Science and Physics)

বিজ্ঞান বলতেই হয়তো তোমাদের চোখে বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতি, আবিষ্কার, গবেষণা, ল্যাবরেটরি এসবের দৃশ্য ফুটে উঠে কিন্তু বিজ্ঞানের আসল বিষয় কিন্তু যন্ত্রপাতি, গবেষণা বা ল্যাবরেটরি নয়, বিজ্ঞানের আসল বিষয় হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গী। এই সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে বিজ্ঞান আর সেটি এসেছে পৃথিবীর মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

আমাদের চারপাশে প্রকৃতির যে রহস্য রয়েছে বিজ্ঞান তার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে– কারো কারো মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে কেন এই অকারণ কৌতূহল? না জানলে কী হয়? মানুষ যেদিন তার মস্তিষ্কে বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তার দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই দিন থেকে তার কিন্তু আর পিছনে ফিরে যাবার উপায় নেই, বেঁচে থাকার জন্য তাকে জানতেই হবে। জানার এই আগ্রহ, এই তাড়না মানুষকে সৃষ্টি জগতের অন্য সব কিছু থেকে আলাদা করে রেখেছে।

বিজ্ঞানকে জানার তিনটি সুনির্দিষ্ট পথ রয়েছে, প্রথমটি হচ্ছে যুক্তি তর্ক। একটা উদাহরণ দেয়া যাক: একটা ভারী জিনিস আরেকটা হালকা জিনিস উপর থেকে ছেড়ে দিলে দুটো কি একসাথে পড়বে নাকি ভারীটা আগে পড়বে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্রেরও প্রয়োজন নেই কোনো জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষারও দরকার নেই, আমরা শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে এর উত্তরটা খুঁজে বের করে ফেলতে পারব। ধরা যাক আমার কাছে একটা ভারী আর একটা হালকা জিনিস রয়েছে। এবারে প্রথমে ধরে নিই উপর থেকে ছেড়ে দিলে ভারী জিনিসটা হালকা জিনিস থেকে আগে নিচে এসে পড়ে। এখন ভারী জিনিসটার সাথে হালকা জিনিসটা বেঁধে দুটো একসাথে ছেড়ে দেয়া হলে, হালকা জিনিসটা যেহেতু ধীরে ধীরে পড়বে তাই ভারী জিনিসটাকে সেটা এত তাড়াতাড়ি পড়তে দেবে না– কাজেই বেঁধে রাখা দুটো জিনিস একটু দেরি করে পড়বে। বিষয়টা আবার অন্যভাবে দেখতে পারি, ভারী জিনিসটার সাথে আরো একটা জিনিস বেঁধে দেয়া হয়েছে তাই সেটা নিশ্চয়ই আরো ভারী হয়েছে– কাজেই আরো ভারী হিসেবে আরো তাড়াতাড়ি পড়বে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আমরা একই সাথে আরো ধীরে কিংবা আরো তাড়াতাড়ি দুটো উত্তরই পেতে পারি– কিন্তু এক প্রশ্নের তো দুই উত্তর হওয়া সম্ভব না। এই জটিলতার সমাধান করা সম্ভব শুধু একটি উপায়ে– আমরা যদি ধরে নিই, ভারী হোক হালকা হোক সবকিছু একসাথে নিচে পড়ে। তার মানে শুধু মাত্র যুক্তি তর্ক দিয়ে আমরা বিজ্ঞানের একটা সমস্যার সমাধানটা খুঁজে পেয়ে গেলাম।

ছবি 1.1: ধ্রুবতারাকে ঘিরে সব নক্ষত্রগুলো ঘুরতে থাকে

বিজ্ঞানকে জানার দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। আমরা যদি আকাশের দিকে তাকাই আর আকাশের নক্ষত্রগুলোকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব সব নক্ষত্র পূব আকাশে উঠে পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছে। আমাদের ধারণা হতে পারে আসলেই বুঝি তাই ঘটছে, অর্থাৎ স্থির একটা পৃথিবীর চারপাশে নক্ষত্রগুলো ঘুরছে। কিন্তু যদি আরো ভালো করে নক্ষত্রগুলোকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে অবাক হয়ে দেখব উত্তর দিকে দিগন্ত থেকে উপরে একটা নক্ষত্র (ধ্রুবতারা) কখনো ঘুরে না, সেটা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে, আর অন্য সব নক্ষত্র আসলে এটাকে কেন্দ্র করে ঘুরে (ছবি 1.1)। আমরা তখন হঠাৎ করে বুঝতে পারি যে আসলে পৃথিবীর অক্ষটা ঠিক এই ধ্রুবতারা বরাবর এবং পৃথিবীটাই নিশ্চয়ই এই অক্ষে ঘুরছে তাই মনে হচ্ছে সব কিছু বুঝি ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে! শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করে আমরা বিজ্ঞানের একটা তথ্য বের করে ফেলতে পারি।

বিজ্ঞানকে জানার তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। নিউটন সবচেয়ে সুন্দর করে এটা করে দেখিয়ে বিজ্ঞান গবেষণার নূতন একটা ধারা তৈরি করেছিলেন। সূর্যের বর্ণহীন আলো প্রিজমের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে সেটাকে অনেকগুলো রংয়ে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন যে বর্ণহীন রং আসলে নানা রং

দিয়ে তৈরি। তারপরও যদি সেটা নিয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকে সেটা দূর করার জন্য তিনি সেই নানা রংয়ের আলোকে দ্বিতীয় একটা প্রিজমের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে আবার বর্ণহীন আলো তৈরি করে ফেলেছিলেন! (ছবি 1.2)

এই তিনটি পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানটা খুব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। অসংখ্য গবেষক বিজ্ঞানী মিলে খুব ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের বিশাল একটা সুরম্য অট্টালিকা গড়ে তুলেছেন। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারের ফলাফল নানা প্রযুক্তিতে ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনকে সহজ করে তুলছি, অর্থপূর্ণ করে তুলছি। আবার কখনো কখনো ভয়ংকর কিছু প্রযুক্তি বের করে শুধুমাত্র নিজেদের জীবন নয় পৃথিবীর অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তুলছি! মনে রেখো প্রযুক্তির মাঝে ভালো প্রযুক্তি যেমন আছে, ঠিক সে রকম খারাপ প্রযুক্তিও আছে, বিজ্ঞানের বেলায় কিন্তু কেউ সেই কথা বলতে পারবে না– বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞান, এর মাঝে কোনো খারাপ নেই এর মাঝে কোনো অশুভ নেই!

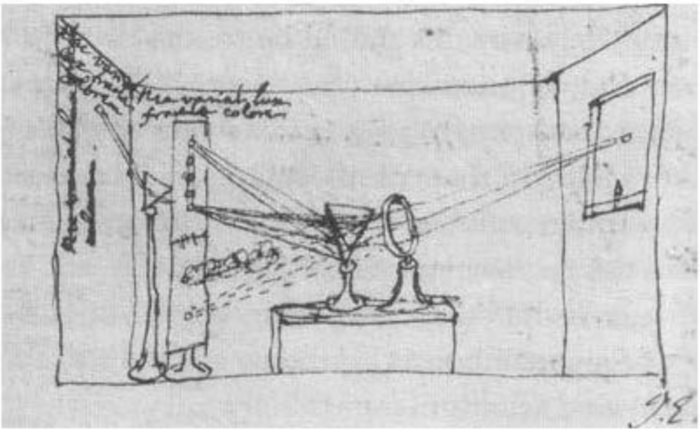

ছবি **1.2:** প্রিজমের ভেতর দিয়ে যাবার সময় আলোর নানা রংয়ে ভাগ হয়ে যাওয়ার নিউটনের নিজের হাতে আঁকা ছবি

1.1.1 পদার্থবিজ্ঞান (Physics)

আমরা এতক্ষন বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলেছি এবং তোমরা সবাই জান বিজ্ঞানের অনেক শাখা রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী অনেক বিষয়– যেগুলোকে এতদিন বিজ্ঞানের বাইরে রেখে এসেছি সেগুলোকেও আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চর্চা করা হয় বলে আমরা তাদের বিজ্ঞান বলে ভাবতে শুরু করেছি। মনোবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান তার উদাহরণ।

পদার্থবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটা শাখা এবং বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে প্রাচীনতম শাখা, তার কারণ অন্য বিজ্ঞানগুলো দানা বাধার অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটা শাখা, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতে শুরু করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান এটি একদিকে যেমন প্রাচীনতম শাখা ঠিক সেভাবে বলা যেতে পারে এটা সবচেয়ে মৌলিক (fundamental) শাখা। এর ওপর ভিত্তি করে রসায়ন দাঁড়িয়েছে, আবার রসায়নের ওপর ভিত্তি করে জীববিজ্ঞান দাঁড়িয়েছে– আবার জীববিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে অন্য অনেক বিষয় দাঁড়িয়েছে।

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি বিজ্ঞানের যে শাখা পদার্থ আর শক্তি এবং এ দুইয়ের মাঝে যে সম্পর্ক (interation) তাকে বোঝার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ এখানে পদার্থ বলতে শুধু আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান পদার্থ নয়, পদার্থের গঠন– অণু পরমাণু থেকে শুরু করে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বা কোয়ার্ক স্ট্রিং পর্যন্ত যেতে পারে। আবার শক্তি বলতে আমাদের পরিচিত মাধ্যাকর্ষণ বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তি ছাড়াও সবল কিংবা দুর্বল নিউক্লিয়ার শক্তিও হতে পারে!

পদার্থবিজ্ঞান একদিনে গড়ে ওঠেনি, শত শত বৎসরে গড়ে উঠেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা তাদের চারপাশের রহস্যময় জগৎকে দেখে প্রথমে কোনো একটা সূত্র দিয়ে সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই সূত্রকে কখনো গ্রহণ করা হয়েছে, কখনো পরিবর্তন করা হয়েছে আবার কখনো পরিত্যাগ করা হয়েছে। এভাবে আমরা পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের বৃহত্তম আকার পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে শিখেছি। এই শেখাটা হয়তো এখনো পূর্ণাঙ্গ নয়– বিজ্ঞানীরা সেটাকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যেন কোনো একদিন অত্যন্ত অল্প কিছু সূত্র দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সব কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে যাবে।

2.1 ভৌত রাশি আর তার পরিমাপ (Physical Quantities and their Measurement)

পানি ঠাণ্ডা হলে সেটা বরফ হয়ে যায়, গরম করলে সেটা বাষ্প হয়ে যায়– এটা আমরা সবাই জানি। মানুষ অনেক প্রাচীন কাল থেকেই এটা দেখে আসছে। এই জ্ঞানটুকু কিন্তু পুরোপুরি বিজ্ঞান হতে পারবে না যতক্ষণ পযন্ত না আমরা বলতে পারব কোন অবস্থায় ঠিক কত তাপমাত্রায় পানি জমে বরফ হয় কিংবা সেটা বাড়িয়ে কোন অবস্থায় কত তাপমাত্রায় নিয়ে গেলে সেটা ফুটতে থাকে, বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে। তার অর্থ প্রকৃত বিজ্ঞান করতে হলে সব কিছুর পরিমাপ করতে হয়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই পরিমাপ করে সব কিছুকে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা।

টেবিল 1.1: SI ইউনিটে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ভৌত রাশি

দৈর্ঘ্য	meter	মিটার	m
ভর	kilogram	কিলোগ্রাম	kg
সময়	second	সেকেন্ড	s
বৈদ্যুতিক প্রবাহ	ampere	এম্পিয়ার	A
তাপমাত্রা	kelvin	কেলভিন	K
পদার্থের পরিমাণ	mole	মোল	mol
দীপন তীব্রতা	candela	ক্যান্ডেলা	cd

এই জগতে যা কিছু আমরা পরিমাপ করতে পারি তাকে আমরা রাশি বলি। এই ভৌত জগতে অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা পরিমাপ করা সম্ভব। উদাহরণ দেয়ার জন্য বলা যেতে পারি কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন, ওজন, তাপমাত্রা, রং, কাঠিন্য, তার অবস্থান, বেগ, তার ভেতরকার উপাদান, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, অপরিবাহিতা, স্থিতিস্থাপকতা, তাপ পরিবাহিতা অপরিবাহিতা, ঘনত্ব, আপেক্ষিক তাপ, চাপ গলনাংক, স্ফুটনাংক ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ আমরা বলে শেষ করতে পারব না। এক কথায় ভৌত জগতে রাশিমালার কোনো শেষ নেই। তোমাদের তাই মনে হতে পারে এই অসংখ্য রাশিমালা পরিমাপ করার জন্য আমাদের বুঝি অসংখ্য রাশির সংজ্ঞা আর অসংখ্য একক তৈরি করে রাখতে হবে! আসলে সেটি সত্যি নয়– তোমরা শুনে খুবই অবাক হবে (এবং নিশ্চয়ই খুশি হবে) যে মাত্র সাতটি রাশির সাতটি একক ঠিক করে নিলে সেই সাতটি একক ব্যবহার করে আমরা সব কিছু বের করে ফেলতে পারব। এই সাতটি রাশিকে বলে মৌলিক রাশি, যেগুলো হচ্ছে দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, বৈদ্যুতিক

প্রবাহ, তাপমাত্রা, পদার্থের পরিমাণ এবং দীপন তীব্রতা। এই সাতটি মৌলিক রাশির আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সাতটি একককে বলে SI একক. (SI এসেছে ফ্রেঞ্চ ভাষার Le Systeme International d'Unites থেকে) এবং সেগুলো 5.1 টেবিলে দেখানো হয়েছে।

এই একক গুলোর পরিমাপ কত সেটি সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করা আছে। যেমন শূন্য স্থানে এক সেকেন্ডের 299,792,458 ভাগের এক ভাগ সময়ে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে এক মিটার। এক কিলোগ্রামের এককটি এখনো ধরা হয় ফ্রান্সের একটা নির্দিষ্ট ভবনে রাখা প্লাটিনিয়াম ইরিডিয়াম দিয়ে তৈরি 3.9 cm উচ্চতা আর ব্যাসের নির্দিষ্ট একটা ভর। (বিজ্ঞানীরা এই ভরটিকে কিছুদিনের মধ্যেই অন্যভাবে ব্যাখ্যা করবেন যেন নির্দিষ্ট দেশে রাখা নির্দিষ্ট ভরের ওপর আর কারো নির্ভর করতে না হয়।) সিজিয়াম 133 (Cs^{133}) পরমাণুর 9,192,631,770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ সময় নেয় সেটা হচ্ছে এক সেকেন্ড। পানির ত্রৈধ বিন্দু বা ট্রিপল পয়েন্ট তাপমাত্রাকে 273.16 দিয়ে ভাগ দিলে যে তাপমাত্রা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এক কেলভিন। অ্যাম্পিয়ারের এককটি মোটামুটি জটিল– পাশাপাশি দুটো তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করলে তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করে। যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে 1m দূরত্বে রাখা দুটি তার প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 2×10^{-7} নিউটন বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে 1 এম্পিয়ার। ধরে নেয়া হচ্ছে তারটির দৈর্ঘ্য অসীম, প্রস্থচ্ছেদ বৃত্তাকার এবং এত ছোট যে সেটা আমরা ধর্তব্যের মাঝে আনব না! (তোমরা শুনে খুশি হবে যে এই একককটাকেও আরো সহজভাবে ব্যাখ্যা করার পরিকল্পনা হচ্ছে।)

টেবিল **1.2:** অনেক বড় থেকে অনেক ছোট দূরত্ব

দূরত্ব	m
নিকটতম গ্যালাক্সি	6×10^{19}
নিকটতম নক্ষত্র	4×10^{16}
সৌর জগতের ব্যাসার্ধ	6×10^{12}
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ	6×10^{6}
এভারেস্টের উচ্চতা	9×10^{3}
ভাইরাসের দৈর্ঘ্য	1×10^{-8}
হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ	5×10^{-11}
প্রোটনের ব্যাসার্ধ	1×10^{-15}

টেবিল **1.3:** অনেক বড় থেকে অনেক ছোট ভর

ভর	kg
আমাদের গ্যালাক্সি	2×10^{41}
সূর্য	2×10^{30}
পৃথিবী	6×10^{24}
জাহাজ	7×10^{7}
হাতি	5×10^{3}
মানুষ	6×10^{1}
ধূলিকণা	7×10^{-7}
ইলেকট্রন	9×10^{-31}

0.012 কিলোগ্রামে যে কয়টি কার্বন 12 পরমাণু থাকে সেই সংখ্যক মৌলিক কণা (অণু, পরমাণু বা আয়ন)– এর সমান পদার্থ হচ্ছে এক মোল। এক ক্যান্ডেলার এককটি সম্ভবত বোঝার জন্য সবচেয়ে জটিল: কোনো আলোর উৎস থেকে যদি এক স্টেরেডিয়ান (Steradian) ঘন কোণে এক ওয়াটের 633 ভাগের এক ভাগ বিকিরণ তীব্রতা পৌঁছায় তাহলে সেই আলোর তীব্রতা হচ্ছে এক ক্যান্ডেলা। তবে যে কোনো আলোর উৎস ব্যবহার করা যাবে না– সেটি হতে হবে সেকেন্ডে 540×10^{12} বার কম্পনরত কোনো আলো। (যারা ঘনকোণ কী জানো না তারা পরিশিষ্ট-1 দেখো)। দূরত্ব ভর বা সময়ের বেলায় সেগুলোর অনেক ছোট থেকে শুরু করে অনেক বড়

হতে পারে। তোমাদের একটা ধারণা দেয়ার জন্য অনেক বড় থেকে শুরু করে অনেক ছোট কিছু দূরত্ব ভর এবং সময়ের কিছু উদাহরণ (টেবিল 1.2, 1.3 এবং 1.4) দেয়া হলো। তোমরা টেবিলগুলো দেখো– অনুভব করার চেষ্টা কর!

সাতটি এককে আনুষ্ঠানিকভাবে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো– কেউ আশা করে না এটা তোমাদের মনে থাকবে! মনে রাখার প্রয়োজনও নেই যদি কখনো জানার প্রয়োজন হয় বই খুঁজে, ইন্টারনেট ঘেঁটে আবার তুমি এটা বের করে ফেলতে পারবে। তবে এক মিটার বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝায় বা এক কেজি ভর কতটুকু, এক সেকেন্ড কত সময়, এক ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রা কতটুকু উত্তপ্ত, এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট কতখানি, এক মোল পদার্থ বলতে কী বোঝাই বা এক ক্যান্ডেলা কতখানি আলো সেটা সম্পর্কে তোমাদের একটা বাস্তব ধারণা থাকা উচিত! এই বেলা তোমাদের সেই বাস্তব ধারণাটা দেওয়ার চেষ্টা করে দেখা যাক। তোমাদের শুধু জানলে হবে না, খানিকটা কিন্তু অনুভবও করতে হবে। সাধারণভাবে বলা যায়:

- স্বাভাবিক উচ্চতার একজন মানুষের মাটি থেকে পেট পর্যন্ত দূরত্বটা মোটামুটি এক মিটার।
- এক লিটার পানির বোতলে কিংবা চার গ্লাসে যে ওজনের পানি থাকে তার ভর হচ্ছে এক কেজির কাছাকাছি।
- 'এক হাজার এক' বলতে যেটুকু সময় লাগে সেটা মোটামুটি এক সেকেন্ড!
- বলা যেতে পারে তিনটা মোবাইল ফোন একসাথে চার্জ করা হলে এক এম্পিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। (মোবাইল ফোন 5 ভোল্টের কাছাকাছিতে চার্জ করা হয়। তাই এখানে খরচ হবে 5 ওয়াট। যদি বাসার লাইট, ফ্যান, ফ্রিজে 220 ভোল্টের কিছুতে এক এম্পিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তখন কিন্তু খরচ হবে 220 ওয়াট!)
- হাত দিয়ে আমরা যদি কারো জ্বর অনুভব করতে পারি বলা যেতে পারে তার তাপমাত্র এক কেলভিন বেড়েছে।
- মোলটা অনুভব করা একটু কঠিন, বলা যেতে পারে একটা বড় চামচের এক চামচ পানিতে মোটামুটি এক মোল পানির অণু থাকে। এক কাপ পানিতে দশ মোল পানি থাকে।
- একটা মোমবাতির আলোকে মোটামুটি ভাবে এক ক্যান্ডেলা বলা যায়।

টেবিল **1.4:** অনেক বড় থেকে অনেক ছোট সময়

সময়	s
বিগব্যাংয়ের সময়	4×10^{17}
ডাইনোসরের ধ্বংস	2×10^{14}
মানুষের জন্ম	8×10^{12}
এক দিন	9×10^{4}
মানুষের হৃদস্পন্দন	1
মিউওনের আয়ু	2×10^{-6}
স্পন্দন কাল: সবুজ আলো	2×10^{-15}
স্পন্দন কাল: এক MeV গামা রে	4×10^{-21}

দেখতেই পাচ্ছ এর কোনোটাই নিখুঁত পরিমাপ নয় কিন্তু অনুভব করার জন্য সহজ। যদি এই পরিমাপ নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাও তাহলে ভবিষ্যতে যখন কোনো একটা হিসাব করবে, তখন সেটা নিয়ে তোমাদের একটা মাত্রাজ্ঞান থাকবে!

টেবিল 1.5: SI ইউনিটে ব্যবহৃত উপসর্গ

deca	da	10^{1}	deci	d	10^{-1}
hecto	h	10^{2}	centi	c	10^{-2}
kilo	k	10^{3}	milli	m	10^{-3}
mega	M	10^{6}	micro	μ	10^{-6}
giga	G	10^{9}	nano	n	10^{-9}
tera	T	10^{12}	pico	p	10^{-12}
peta	P	10^{15}	femto	f	10^{-15}
exa	E	10^{18}	atto	a	10^{-18}

বিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞান চর্চা করার জন্য আমাদের নানা কিছু পরিমাপ করতে হয়। কখনো আমাদের হয়তো গ্যালাক্সির দৈর্ঘ্য মাপতে হয় $(6 \times 10^{24} m)$ আবার কখনো একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ মাপতে হয় $(1 \times 10^{-15} m)$ দূরত্বের মাঝে এই বিশাল পার্থক্য মাপার জন্য সব সময়েই একই ধরনের সংখ্যা ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় তাই আন্তর্জাতিকভাবে কিছু SI উপসর্গ (prefix) তৈরি করে নেয়া হয়েছে। এই উপসর্গ থাকার কারণে একটা ছোট উপসর্গ লিখে অনেক বড় কিংবা অনেক ছোট সংখ্যা বোঝাতে পারব। উপসর্গগুলো টেবিল 1.5 এ দেখানো হয়েছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এগুলো সব সময় ব্যবহার করি। দূরত্ব বোঝানোর জন্য এক হাজার মিটার না বলে এক কিলোমিটার বলি। ক্যামেরার ছবির সাইজ বোঝানোর জন্য দশ লক্ষ বাইট না বলে এক মেগাবাইট বলি!

1.2.1 মাত্রা (Dimensions)

আমরা জেনে গেছি যে আমাদের চারপাশে অসংখ্য রাশি থাকলেও মাত্র সাতটি একক দিয়ে এই রাশিগুলোকে পরিমাপ করা যায়। একটা রাশি কোন একক দিয়ে প্রকাশ করা যায় সেটি আমাদের জানতেই হয়, প্রায় সময়েই রাশিটি কোন কোন মৌলিক রাশি (দৈর্ঘ্য L, সময় T, ভর M ইত্যাদি) দিয়ে কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটাও জানা থাকতে হয়। একটা রাশিতে বিভিন্ন মৌলিক রাশি কোন সূচকে বা কোন পাওয়ারে আছে সেটাকে তার মাত্রা বলে। যেমন আমরা পরে দেখব বল হচ্ছে ভর এবং ত্বরণের গুণফল। ত্বরণ আবার সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার। বেগ আবার সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তনের হার।

কাজেই বেগ এর মাত্রা: $$\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{L}{T} = LT^{-1}$$

ত্বরণের মাত্রা: $$\frac{\text{দূরত্ব}}{(\text{সময়})^2} = \frac{L}{T^2} = LT^{-2}$$ ইত্যাদি

আমরা এই বইয়ে যখনই নূতন একটি রাশিমালার কথা বলব সাথে সাথেই তার মাত্রাটির কথা বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখবে সেটা সব সময়েই রাশিটিকে বুঝতে অন্যভাবে সাহায্য করবে।

1.3 পরিমাপের যন্ত্রপাতি

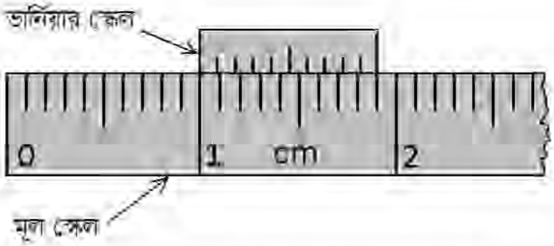

ছবি 1.3: মূল এবং নাড়ানো সম্ভব ভার্নিয়ার স্কেল

এক সময় পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন রাশিমালা সূক্ষ্মভাবে মাপা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স নির্ভর যন্ত্রপাতির কারণে এখন কাজটি খুব সোজা হয়ে গেছে। আমরা এই বইয়ে যে পরিমাণ পদার্থবিজ্ঞান শেখার চেষ্টা করব তার জন্য দূরত্ব, ভর, সময়, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং ভোল্টেজ মাপালেই মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতে পারব। এগুলো মাপার জন্য আমরা কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক :

1.3.1 স্কেল

ছোটখাটো দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মিটার স্কেল ব্যবহার করা হয় এবং তোমরা সবাই নিশ্চয়ই মিটার স্কেল দেখেছ। 100 cm (সেন্টিমিটার) বা 1 m লম্বা বলে এটাকে মিটার স্কেল বলে। যেহেতু এখনো অনেক জায়গায় ইঞ্চি ফুট প্রচলিত আছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি উদাহরণ দেশ!) তাই মিটার স্কেলের অন্যপাশে প্রায় সব সময়ে ইঞ্চি দাগ কাটা থাকে। এক ইঞ্চি সমান 2.54 cm.

একটা স্কেলে সবচেয়ে যে সূক্ষ্ম দাগ থাকে আমরা সে পর্যন্ত মাপতে পারি। মিটার স্কেল সাধারণত মিলিমিটার পর্যন্ত ভাগ করা থাকে তাই মিটার স্কেল ব্যবহার করে আমরা কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মিলিমিটার পর্যন্ত মাপতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি বলি কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য 0.364 m তার অর্থ দৈর্ঘ্যটি হচ্ছে 36 সেন্টিমিটার এবং 4 মিলিমিটার। একটা মিটার স্কেল ব্যবহার করে এর চাইতে সূক্ষ্ম ভাবে দৈর্ঘ্য মাপা সম্ভব নয়– অর্থাৎ সাধারণ স্কেলে আমরা কখনোই বলতে পারব না একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য 0.3643 m কিন্তু মাঝে মাঝেই কোনো একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে আমাদের এ রকম সূক্ষ্ম ভাবে মাপা প্রয়োজন হয়, তখন ভার্নিয়ার (Vernier) স্কেল নামে একটা মজার স্কেল ব্যবহার করে সেটা করা যায়।

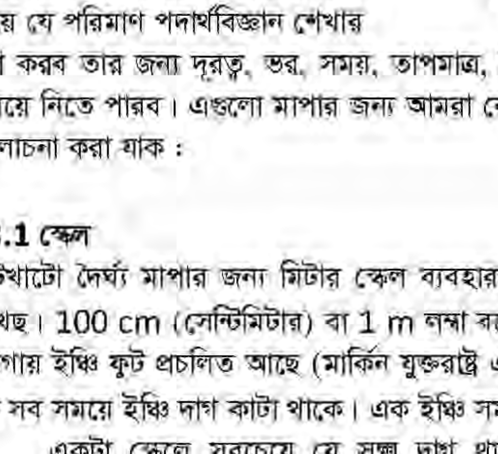

ছবি 1.4: এক, দুই এবং তিন ঘর সরে যাওয়া ভার্নিয়ার স্কেল

ধরা যাক কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য মিলিমিটারের 4 এবং 5 দুটি দাগের মাঝামাঝি কোথাও এসেছে অর্থাৎ বস্তুটির দৈর্ঘ্য 4 মিলিমিটার থেকে বেশি কিন্তু 5 মিলিমিটার থেকে কম। 4 মিলিমিটার থেকে কত ভগ্নাংশ বেশি সেটা বের করতে হলে ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা যায়, এই স্কেলটা মূল স্কেলের পাশে

লাগানো থাকে এবং সামনে পেছনে সরানো যায় (ছবি 1.3)। ছবির উদাহরণে দেখানো হয়েছে মূল স্কেলের 9 মিলিমিটার দৈর্ঘ্যকে ভার্নিয়ার স্কেলে দশ ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের প্রত্যেকটা ভাগ হচ্ছে $\frac{9}{10}$ mm, আসল মিলিমিটার থেকে $\frac{1}{10}$ মিলিমিটার কম। যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শুরুটা

ছবি 1.5: ছবিতে ভার্নিয়ার স্কেল যুক্ত স্লাইড ক্যালিপার্স এবং একটি স্ক্রুগজ দেখানো হল

কোনো একটা মিলিমিটার দাগের সাথে মিলিয়ে রাখা হয় তাহলে তার পরের দাগটি সত্যিকার মিলিমিটার থেকে $\frac{1}{10}$ মিলিমিটার সরে থাকবে, এর পরেরটি $\frac{2}{10}$ মিলিমিটার সরে থাকবে– পরেরটি $\frac{3}{10}$ মিলিমিটার সরে থাকবে– অর্থাৎ কোনোটাই মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে মিলবে না, একেবারে দশ নম্বর দাগটি আবার আসল মূল স্কেলের নয় নম্বর মিলিমিটার দাগের সাথে মিলবে।

ছবি 1.6: ডায়াল এবং ডিজিটাল রিডআউট লাগানো স্লাইড় ক্যালিপার্স

বুঝতেই পারছ ভার্নিয়ার স্কেলটা যদি আমরা এমনভাবে রাখি যে শুরুটা একটা মিলিমিটার দাগ থেকে শুরু না হয়ে একটু সরে (যেমন $\frac{3}{10}$ mm) শুরু হয়েছে (ছবি 1.4) তাহলে ঠিক যত সংখ্যক $\frac{1}{10}$ mm সরে শুরু হয়েছে ভার্নিয়ার স্কেলের তত নম্বর দাগটি মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে মিলে যাবে। কাজেই ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য মাপা খুব সহজ, প্রথমে জেনে নিতে হয় ভার্নিয়ার স্কেলের একটি ভাগ এবং মূল স্কেলের একটি ভাগের মাঝে পার্থক্য কতটুকু– এটাকে বলে ভার্নিয়ার ধ্রুবক (Vernier Constant সংক্ষেপে VC)। মূল স্কেলের সবচেয়ে ছোটভাগের (1 mm) দূরত্বকে ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগের (10) সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলেই এটা বের হয়ে যাবে। আমরা যে উদাহরণ নিয়েছি সেখানে এটার মান:

$$VC = \frac{1}{10}\text{mm} = 0.0001\ \text{m}$$

কোনো দৈর্ঘ্য মাপার সময় মিলিমিটারের সর্বশেষ দাগ পর্যন্ত মেপে ভার্নিয়ার স্কেলের দিকে তাকাতে হয় তার কোন দাগটি মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে মিলে গেছে সেটি বের করে তাকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক গুণ দিতে হয়। মূল স্কেলে মাপা দৈর্ঘ্যের সাথে সেটি যোগ দিলেই আমরা প্রকৃত দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব। ছবি 1.4 এর শেষ স্কেলে যে দৈর্ঘ্য দেখানো হয়েছে আমাদের এই নিয়মে সেটি হবে 1.03cm বা 0.0103m

ছবি 1.7: ডিজিটাল ওজন মাপার যন্ত্র

ভার্নিয়ার স্কেলের পরিবর্তে একটা স্ক্রুকে ঘুরিয়ে (ছবি 1.5) স্কেলকে সামনে পিছনে নিয়েও স্ক্রুগজ (screw gauge) নামে বিশেষ এক ধরনের স্কেলে দৈর্ঘ্য মাপা হয়। এখানে স্ক্রুর ঘাট (thread) অত্যন্ত সূক্ষ্ম রাখা হয় এবং পুরো একবার ঘোরানোর পর স্কেল লাগানো স্ক্রুটি হয়তো 1 mm অগ্রসর হয়। স্ক্রুয়ের এই সরণকে স্ক্রুয়ের পিচ (pitch) বলে। যে বৃত্তাকার অংশটি ঘুরিয়ে স্কেলটিকে সামনে পিছনে নেয়া হয় সেটিকে সমান 100 ভাগে ভাগ করা হলে প্রতি এক ঘর ঘূর্ণনের জন্য স্কেলটি পিচের $\frac{1}{100}$ ভাগের এক ভাগ অগ্রসর হয়। অর্থাৎ এই স্কেলে $\frac{1}{100} = 0.01\text{mm}$ পর্যন্ত মাপা সম্ভব হতে পারে।

আজকাল ভার্নিয়ার স্কেলের পরিবর্তে ডায়াল লাগানো কিংবা ডিজিটাল (ছবি 1.6) স্লাইড ক্যালিপার্স বের হয়েছে যেটা দিয়ে সরাসরি নিখুঁতভাবে দৈর্ঘ্য মাপা যায়।

1.3.2 ভর মাপার যন্ত্র

ভর সরাসরি মাপা যায় না তাই সাধারণত ওজন মেপে সেখান থেকে ভরটি বের করা হয়। আমরা যখন বলি কোনো একটা বস্তুর ওজন 1 gm বা 1 kg তখন আসলে বোঝাই বস্তুটির ভর 1 gm কিংবা 1 kg এক সময় বস্তুর ভর মাপার জন্য নিক্তি ব্যবহার করা হতো যেখানে বাটখারার নির্দিষ্ট ভরের সাথে বস্তুর ভরকে তুলনা করা হতো। আজকাল ইলেকট্রনিক ব্যালেন্সের (ছবি 1.7) ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। ব্যালেন্সের ওপর নির্দিষ্ট বস্তু রাখা হলেই ব্যালেন্সের সেন্সর সেখান থেকে নিখুঁতভাবে ওজনটি বের করে দিতে পারে।

ছবি 1.8: সাধারণ এবং ইলেক্ট্রনিক থার্মোমিটার

1.3.3 থার্মোমিটার

তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। এলকোহল বা পারদের থার্মোমিটারের পাশাপাশি আজকাল ইলেকট্রনিক থার্মোমিটারেরও (ছবি 1.8) প্রচলন শুরু হয়েছে। জ্বর মাপার জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তার ব্যপ্তি খুব কম– কারণ মানুষের শরীরের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না বা কমে না। কাজেই জ্বর মাপার থার্মোমিটার দিয়ে আসলে প্রকৃত তাপমাত্রা মাপা যায় না।

ছবি 1.9: স্টপ ওয়াচ

1.3.4 স্টপ ওয়াচ

সময় মাপার জন্য স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করা হয় (ছবি 1.9)। এক সময় নিখুঁত স্টপ ওয়াচ অনেক মূল্যবান সামগ্রী হলেও, ইকেট্রনিক্সের অগ্রগতির কারণে খুব অল্প দামের মোবাইল টেলিফোনেও আজকাল অনেক সূক্ষ্ম স্টপ ওয়াচ পাওয়া যায়। স্টপ ওয়াচে যে কোনো একটি মুহূর্ত থেকে সময় মাপা শুরু করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর সময় মাপা বন্ধ করে কতখানি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে সেটি বের করে ফেলা যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে স্টপ ওয়াচ যত নিখুঁত ভাবে সময় মাপতে পারে আমরা হাত দিয়ে কখনোই তত নিখুঁত ভাবে এটা শুরু করতে পারি না বা থামাতে পারি না।

1.3.5 ভোল্ট মিটার ও অ্যামিটার

বিদ্যুতের প্রবাহ মাপার জন্য অ্যামিটার এবং ভোল্টেজ মাপার জন্য ভোল্ট মিটার ব্যবহার করা হয়। এই দুটো পরিমাপ যন্ত্রই সাধারণত এক জায়গায় থাকে এবং দুটোকে মিলিয়ে অনেক সময় মাল্টি মিটার (ছবি 1.10) বলা হয়। মাল্টি মিটারে সাধারণত একটি ডায়াল থাকে এবং এই ডায়ালটি ঘুরিয়ে বিভিন্ন মাত্রার ভোল্টেজ কিংবা বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট মাপা যায়। আমাদের গৃহস্থালি ভোল্টেজ এসি হওয়ার কারণে সব মাল্টি মিটারেই এসি কিংবা ডিসি ভোল্টেজ এবং কারেন্ট মাপা যায়। (যারা এসি কিংবা ডিসি বলতে কী বুঝায় জানো না তারা পরিশিষ্ট-1 দেখো।) আজকালকার মাল্টি মিটার শুধু ভোল্টেজ এবং কারেন্ট নয় আরো অনেক কিছু মাপতে পারে।

ছবি 1.10: মাল্টি মিটার

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

1. যুক্তিতর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ এই তিনটি পদ্ধতির কোনটিকে তুমি বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে কর? কেন?
2. তুমি কী যুক্তি-তর্ক দিয়ে দেখাতে পারবে প্রাইম সংখ্যা অসীম সংখ্যক?
3. সাতটি SI এককের একটি অন্যগুলো থেকে একটু অন্য রকম। কোনটি এবং কেন বলতে পারবে?
4. যদি হঠাৎ করে তোমার এবং তোমার চারপাশের সব কিছুর সাইজ অর্ধেক হয়ে যায় তুমি কী বুঝাতে পারবে?
5. তুমি কি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ মাপতে পারবে?

গাণিতিক সমস্যা:

1. টেবিল 1.5 এর উপসর্গ ব্যবহার করে নিচের সংখ্যাগুলো প্রকাশ কর: (a) $10^{14} Flops$ (b) $10^{9} bytes$ (c) $10^{-3} gm$ (d) $10^{-9} s$ (e) $10^{-18} m$
2. এক বছরে কত সেকেন্ড? (মজা করার জন্য π দিয়ে প্রকাশ কর)
3. এক আলোকবর্ষে কত মিটার?
4. একটি ভার্নিয়ার স্কেলে একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য মাপার সময় 1.11 ছবির মতো দেখা গেছে। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত?
5. শক্তির মাত্রা ML^2T^{-2}, SI ইউনিটে এর একক কত?

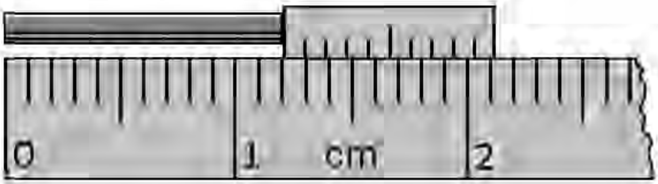

ছবি 1.11: ভার্নিয়ার স্কেলের রিডিং

দ্বিতীয় অধ্যায়

গতি

(Motion)

Nicolaus Copernicus (1473-1543)

নিকোলাস কোপার্নিকাস

নিকোলাস কোপার্নিকাস ছিলেন রেনেসাঁ যুগের একজন গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদ। একই সাথে তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, চিকিৎসক, অনুবাদক, কূটনীতিবিদ এবং অর্থনীতিবিদ। তবে পৃথিবীর ইতিহাসে কোপার্নিকাস স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সূর্যকে সৌর জগতের কেন্দ্রে বসিয়ে গ্রহদের কক্ষপথ ব্যাখ্যা করার জন্য। পৃথিবীকে সব কিছুর কেন্দ্র না ধরার বিষয়টি সেই সময়ের ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিল বলে তিনি তার সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বটি প্রকাশ করতে দেরি করেছিলেন। মৃত্যুর দিন আগে আগে তার সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব দেয়া বইটি প্রকাশিত হয় এবং ধর্মীয় মানুষের ভয়ে তার অনুমতি না নিয়েই বইয়ের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল এই ব্যাপারটি বাস্তব ব্যাপার নয়— শুধুমাত্র গাণিতিক হিসাব সহজ করার একটি পদ্ধতি মাত্র।

2.1 অবস্থান (Position)

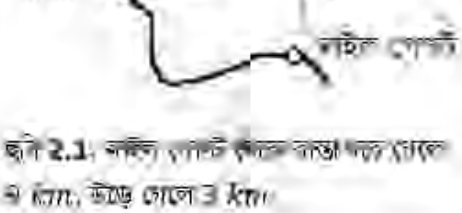

চিত্র 2.1: মাইল পোস্ট থেকে রাস্তা ধরে গেলে 9 km, উড়ে গেলে 3 km

তোমরা যারা পথেঘাটে চলাফেরা করেছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ রাস্তার পাশে মাইলপোস্টে সেখান থেকে নানা জায়গার দূরত্ব লেখা থাকে। যদি কোথাও কোনো মাইলপোস্টে লেখা থাকে "ঢাকা: 9 কিলোমিটার" তার অর্থ সেই জায়গা থেকে ঢাকা শহরের দূরত্ব 9 কিলোমিটার। কিন্তু ঢাকা শহর তো বিশাল একটা শহর। কাজেই মাইলপোস্টের সেই অবস্থান থেকে ঢাকা শহরের কোন জায়গাটি 9 কিলোমিটার দূরে? এক সাথে পুরো শহরের সব জায়গা নিশ্চয়ই 9 কিলোমিটার দূরে হতে পারে না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে ঢাকা শহরের কোনো একটি জায়গাকে আরও নির্দিষ্টভাবে বলা উচিত।

কোনো একটা বিন্দুকে) নির্দিষ্ট করে দিতে হবে যেখান থেকে সব জায়গার দূরত্ব মাপা হবে। আমরা জানি ঢাকা শহরে সচিবালয় আর জিপিও এর মাঝামাঝি নূর হোসেন চত্বরটি হচ্ছে সেই জায়গা- সে জায়গাটিকে বলা হয় জিরো পয়েন্ট- বা শূন্য দূরত্ব।

এখন ধরা যাক কেউ একজন ৯ km দূরের মাইলপোস্ট থেকে ঢাকা শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল, তাকে জিরো পয়েন্টে পৌঁছাতে হলে পুরো নয় কিলোমিটার হাঁটতে হবে (ছবি 2.1)। ধরা যাক ঠিক সেই মাইলপোস্ট থেকে একটা কাক ঠিক করল সেও উড়ে উড়ে জিরো পয়েন্ট যাবে। রাস্তা যদি আঁকাবাঁকা ঘোরানো-প্যাচানো হয় তাহলে কাকের তো আর রাস্তা ধরে ধরে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে উড়ার প্রয়োজন নেই, সে সোজাসুজি উড়ে জিরো পয়েন্ট পৌঁছে যাবে। কাজেই দেখা যাবে কাককে পুরো ৯ কিলোমিটার উড়তে হচ্ছে না, অনেক কম দূরত্ব, ধরা যাক মাত্র 3 কিলোমিটার উড়েই সে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে মাইলপোস্টের সেই অবস্থান থেকে জিরো পয়েন্টের দূরত্ব কি আমরা ৯ কিলোমিটার ধরব নাকি 3 কিলোমিটার ধরব?

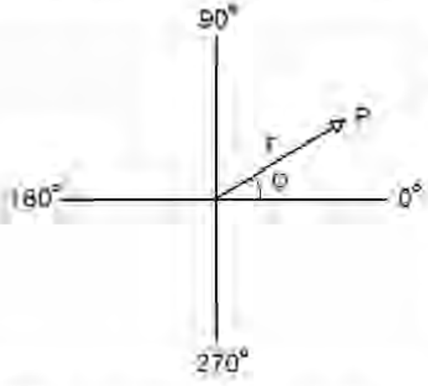

ছবি 2.2: মূল বা প্রসঙ্গ বিন্দু থেকে যে কোনো বিন্দুকে দূরত্ব r এবং কোণ φ দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

বিষয়টিকে আমরা আরো একটু জটিল করে দিতে পারি! ধরা যাক সেই কাক জিরো পয়েন্টে পৌঁছে অন্য একটি কাককে জানাল এই জিরো পয়েন্ট থেকে ঠিক 3 কিলোমিটার দূরে একটা মাইলপোস্ট আছে। কৌতূহলী সেই কাক 3 কিলোমিটার উড়ে গেলে কি সেই মাইলপোস্টটি পাবে? তার উত্তর একই সাথে "হ্যাঁ" এবং "না"। প্রথম কাকটি যে পথে উড়ে এসেছে ঠিক সেই পথে উড়ে গেলে উত্তর "হ্যাঁ" অন্য যে কোনো পথে উড়ে গেলে উত্তর হচ্ছে "না"! তার মানে হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে চাই তাহলে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সেটা কত দূরে জানাটাই যথেষ্ট নয়, কোন দিকে সেই দূরত্ব যেতে হবে সেটাও স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। দূরত্বের সাথে সাথে দিকটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম- এই চারটি দিক মোটেও যথেষ্ট নয়। (কেউ যদি কোনোভাবে উত্তর মেরুতে হাজির হয় তখন আবিষ্কার করবে সেখানে পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর বলে কোনো দিক নেই চারিদিকই দক্ষিণ- সেটি আরেক ঝামেলা!) বোঝাই যাচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ হবে (দূরত্বের সাথে সাথে) একটা নির্দিষ্ট দিকের সাপেক্ষে কত ডিগ্রি কোণে কত দূরত্ব যেতে হবে সেটা বলে দেয়া (অর্থাৎ বলতে হবে অমুক বিন্দু থেকে অমুক দিকের সাথে এত ডিগ্রী কোণে এত দূরত্ব হচ্ছে অবস্থান) 2.2 ছবিতে ব্যাপারটা দেখানো হয়েছে, দুটো রেখা 90 ডিগ্রিতে একটা আরেকটাকে ছেদ করেছে, ছেদ বিন্দুটি হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু বা প্রসঙ্গ বিন্দু (Reference Point), একটা অক্ষকে ধরে নিয়েছি শূন্য ডিগ্রি, সাথে সাথে দেখার সুবিধার জন্য আমরা 90 ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি আর 270 ডিগ্রিটাও পেয়ে গেছি। এখন যে কোনো অবস্থানকে মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব আর মূল অক্ষের সাথে তৈরি করা কোণ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। 2.2 ছবিতে P অবস্থানের দূরত্ব হচ্ছে r, কোণ হচ্ছে φ, যার অর্থ অন্য যে কোনো অবস্থানকেও আমরা মূল বিন্দু থেকে একটা দূরত্ব আর একটা কোণ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি।

আমরা দেখছি সমতলে একটি অবস্থানকে প্রকাশ করার জন্য দূরত্ব আর কোণ এই দুটি রাশির দরকার হয়। এই দুটো রাশি দিয়েই যে অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, আমরা ইচ্ছে করলে অন্য দুটো রাশি দিয়েও অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে পারি। 2.3 ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি P বিন্দুতে অবস্থানটি আমরা x এবং y এই দুটো রাশিমালা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। যারা একটুখানি ত্রিকোণোমিতিও জানে তারাই বুঝতে পারবে যে আসলে এটা মোটেও নূতন কিছু নয়– আগে দেখানো r এবং φ আর 2.3 ছবিতে দেখানো x আর y আসলে একই ব্যাপার। তার কারণ x আর y হচ্ছে

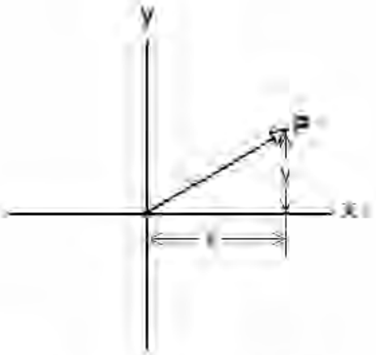

ছবি 2.3: x, y অক্ষ ব্যবহার করে মূল বা প্রসঙ্গ বিন্দু থেকে যে কোনো বিন্দুকে r ও φ এর পরিবর্তে x ও y দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

$$x = r\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$

অর্থাৎ r আর φ জানলে আমরা সাথে সাথে x এবং y বের করে ফেলতে পারব। উল্টোটাও সত্যি x এবং y জানলে সাথে সাথে আমরা r আর φ বের করে ফেলতে পারব।

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\varphi = \tan^{-1}\frac{y}{x}$$

তোমরা অবস্থানকে x, y দিয়ে প্রকাশ করতে চাও নাকি r, φ দিয়ে প্রকাশ করতে চাও সেটা পুরোপুরি তোমার ইচ্ছে। অবশ্যি তোমরা নিজেরাই দেখবে কোনো কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য r, φ ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ– আবার কোনো কোনো সমস্যা সমাধান করতে x, y ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ।

উদাহরণ 2.1: একটা গাড়ি তোমার স্কুল থেকে পূর্বদিকে 20 km গিয়ে উত্তর দিকে 30 km গিয়েছে, তারপর আবার পূর্বদিকে 30 km তারপর দক্ষিণ দিকে 20 km, পশ্চিম দিকে 10 km তারপর আবার উত্তর দিকে 10 km গিয়েছে।

(a) গাড়িটি কত km দূরত্ব অতিক্রম করেছে?

উত্তর: এটা বের করা খুবই সোজা, সবগুলো অতিক্রান্ত দূরত্ব যোগ করলেই সেটা পেয়ে যাব।

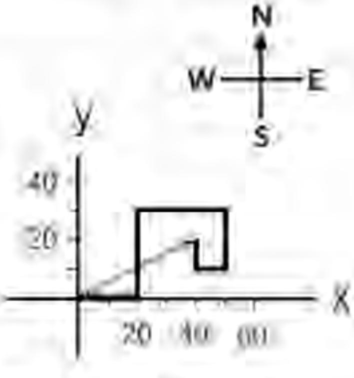

ছবি 2.4: গাড়িটি যে পথে গিয়েছে

$20\,km + 30\,km + 30\,km + 20\,km + 10\,km + 10\,km = 120\,km$

(b) তোমার স্কুলের সাপেক্ষে গাড়িটির বর্তমান অবস্থান কোথায়?

উত্তর : তোমার স্কুলের সাপেক্ষে গাড়িটির অবস্থান বের করার আগে আমরা একটা গ্রাফে (ছবি 2.4) গাড়িটি কখন কোন দিকে গিয়েছে সেটা এঁকে নিই তাহলে বিষয়টা বোঝা সহজ হবে। ছবির উপরে উত্তর দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিম কোন দিক দেখানো হয়েছে– গ্রাফ আঁকার সময় ইচ্ছে করে আমরা দিক বোঝানোর জন্য x-y বসিয়েছি। যেখানে বাড়ে উত্তর দিক হচ্ছে y (কাজেই দক্ষিণ দিক হবে $-y$) পূর্ব দিক হচ্ছে x (কাজেই পশ্চিম দিক হচ্ছে $-x$)

ছবি 2.4 এর গ্রাফ থেকে আমরা সরাসরি দেখছি এটির বর্তমান অবস্থানে x এর মান হচ্ছে $40\,km$ এবং y এর মান হচ্ছে $20\,km$

আমরা গ্রাফ না এঁকেও এটা বের করতে পারতাম। গাড়িটি যখন পূর্বে কিংবা পশ্চিমে গেছে তখন x এর মানের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু y এর মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আবার গাড়িটি যখন উত্তর কিংবা দক্ষিণে গিয়েছে তখন y এর মানের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু x এর মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই আমরা লিখতে পারি :

$x = 20 + 30 - 10 = 40\,km$ (পূর্ব দিকে গেলে ধনাত্মক বা পজিটিভ পশ্চিম দিকে গেলে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ব্যবহার করেছি।)

$y = 30 - 20 + 10 = 20\,km$ (উত্তর দিকে গেলে ধনাত্মক বা পজিটিভ দক্ষিণ দিকে গেলে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ধরে নিয়েছি।)

কাজেই তোমার স্কুলের সাপেক্ষে গাড়ির বর্তমান অবস্থান (x, y) হচ্ছে $(40\,km, 20\,km)$ কিংবা পূর্ব দিকে 40 ও উত্তর দিকে 20 km.

উদাহরণ 2.2: ছবি 2.5 এ দেখানো P এর অবস্থান r এবং φ দিয়ে প্রকাশ কর।

উত্তর: ছবি 2.5 থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি P এর অবস্থান হচ্ছে (2, 2)। আমরা মূল বিন্দু থেকে P পর্যন্ত একটা রেখা টেনেছি, এই রেখাটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে r এবং এই রেখাটি x এর সাপেক্ষে যে কোণ করেছে সেটি হচ্ছে φ

তাহলে $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2.83$

$\tan\varphi = \frac{y}{x} = \frac{2}{2} = 1$

কাজেই $\varphi = 45°$

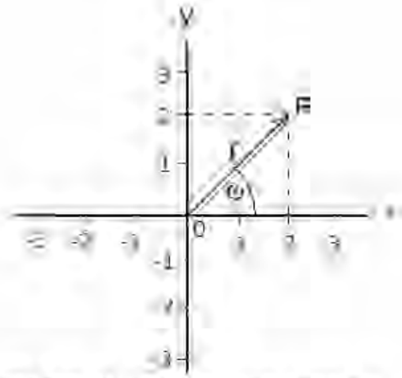

ছবি 2.5: P এর অবস্থান একই সাথে x, y এবং r, φ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

এবারে আমরা একটি ছোট জটিলতা তৈরি করি। ধরা যাক P এর অবস্থান হচ্ছে (-2, -2) (ছবি 2.6) এবারে r এবং φ কত হবে?

তাহলে $r = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2.83$

এবং $\tan\varphi = \frac{y}{x} = \frac{-2}{-2} = 1$
কাজেই $\varphi = 45^\circ$

আমরা হুবহু একই উত্তর পাচ্ছি যদিও P এর অবস্থানটা সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়! এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ আসল উত্তর $\varphi = 225^\circ$ কিন্তু যেহেতু $\tan 45^\circ = \tan 225^\circ = 1$ কাজেই $\varphi = 45^\circ$ না 225° সেটি বুঝতে পারছিলাম না। চোখে দেখলে আমরা সেটি চট করে ধরে ফেলতে পারি এবং বলতে পারি $\varphi = 45^\circ$ নয়, $\varphi = 225^\circ$, এটি জেনে রাখা ভালো এই জন্য অন্ধের মতো ফর্মুলা বসিয়ে হিসাব করতে হয় না সব সময়েই মাথার মাঝে আসল ছবিটি রাখতে হয়।

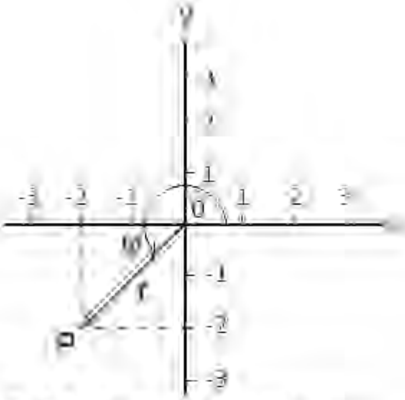

ছবি 2.6: P এর অবস্থান যেখানে φ এর মান 225°

ঠিক ভাবে সমস্যাটি সমাধান করতে এভাবে করতে হবে।

$x = r\cos\varphi$ কিংবা $-2 = 2.83\cos\varphi$
$\cos\varphi = \frac{-2}{2.83} = -0.707$

$\varphi = 135^\circ$ কিংবা 225° কাজেই আমরা এখনো জানি না সঠিক উত্তর কোনটা।
আবার $y = r\sin\varphi$ কিংবা $-2 = 2.83\sin\varphi$
$\sin\varphi = \frac{-2}{2.83} = -0.707$

$\varphi = 225^\circ$ কিংবা 315° এখন আমরা জানি কোনটা সঠিক উত্তর। আমরা যদি $\varphi = 225^\circ$ ধরে নিই তাহলেই x এবং y দুটোর জন্য সঠিক উত্তর পাব।

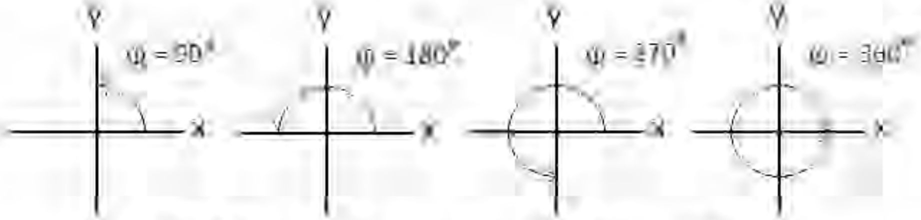

ছবি 2.7: x, y অক্ষে $y, -x, -y$ এবং x অক্ষে φ এর মান

যারা ত্রিকোণোমিতি করেছ তাদেরকে আমরা মনে করিয়ে দিই φ আমরা x অক্ষ থেকে মাপছি এবং সেটা সব সময় ধনাত্মক বা পজিটিভ (ছবি 2.7) ধরে নিচ্ছি y অক্ষে এর মান 90°, $-x$ অক্ষে 180°

−y অক্ষে 270° এবং পুরোটা ঘুরে যখন আবার x অক্ষে ফিরে আসে তখন এটা 360° এবং সেটিকে আবার শূন্য ধরে নিচ্ছি।

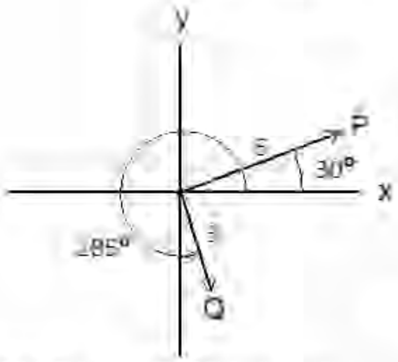

ছবি 2.8: x y অক্ষে P ও Q বিন্দুর অবস্থান r ও φ এর মান দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

উদাহরণ 2.3: ছবি 2.8 এ দেখানো P এবং Q এর অবস্থান x এবং y দিয়ে প্রকাশ কর।

উত্তর: P এর জন্য $r = 5$ এবং $\varphi = 30°$

কাজেই: $x = 5\cos 30° = 5 \times 0.866 = 4.3$
$y = 5\sin 30° = 5 \times 0.5 = 2.5$

Q এর জন্য $r = 3$ এবং $\varphi = 285°$

$x = 3\cos 285° = 3 \times 0.259 = 0.777$
$y = 3\sin 285° = 3 \times (-0.966) = -2.898$

আমরা যে রকম ভেবেছিলাম x পজিটিভ কিন্তু y এর মান নেগেটিভ।

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছ একটি সমতলে কোনো একটি অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে আমাদের দুটি রাশি দরকার। যদি সেটি এক সমতলে না হয়? যেমন একটা গাছের ডালে বসে থাকা একটা কাক, কিংবা আকাশে উড়তে থাকা একটা প্লেন? (ছবি 2.9)

বুঝতেই পারছ তখন দুটি রাশি দিয়ে আর সেটি প্রকাশ করা যাবে না, উচ্চতাটাকে দেখানোর জন্য আমাদের আরো একটি রাশি দরকার। x, y এর বেলায় বিষয়টা পানির মতো সোজা, আমরা ত্রিমাত্রিক একটা স্থানাংক কাঠামো (coordinate system) তৈরি করে নেব, তখন x, y এর সাথে সাথে তৃতীয় রাশি z এর যোগ হবে, 2.9 ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। যদি r, φ দিয়ে করতে চাই? সেটাও সম্ভব কিন্তু সেটা কেমন করে করা যায় তা তোমাদের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো। (বুঝতেই পারছ নূতন আরেকটা কোণ θ যোগ করতে হবে– ত্রিমাত্রিক জগতে তাই ঘুরে-ফিরে তিনটি রাশিমালাই দরকার। তার বেশিও নয়, কমও নয়।)

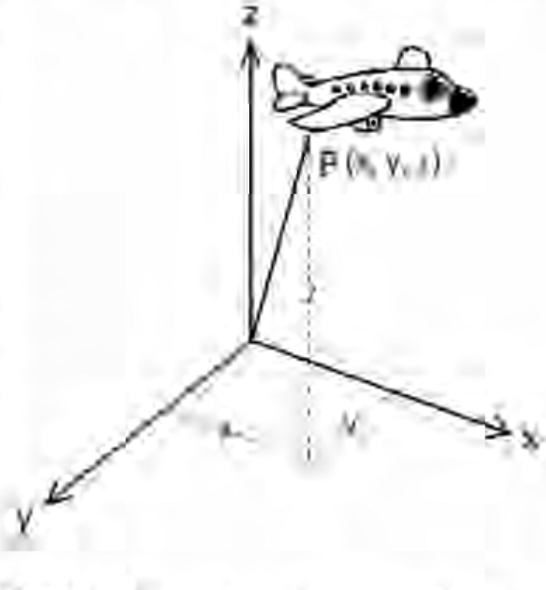

ছবি 2.9: একটি প্লেনের অবস্থান বোঝানোর জন্য অক্ষে x, y ও z এর মান দরকার হয়।

2.2 স্থিতি ও গতি (Rest and Motion)

আমরা যেহেতু অবস্থানের বিষয়টা বুঝেছি এখন স্থির বা স্থিতি আর চলমান বা গতি বুঝতে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। সময়ের সাথে অবস্থানের কোনো পরিবর্তন না হলেই সেটা স্থির, আর যদি অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাহলেই সেটা গতিশীল অর্থাৎ সেটার গতি আছে বুঝতে হবে।

এখানে অবশ্যি ছোট একটা জটিলতা আছে– অবস্থান প্রকাশ করতে হলে একটা মূল বিন্দু দরকার, আর সেই মূল বিন্দুটাই যদি স্থির না হয় তখন কী হবে? এখন যেটাকে আমরা স্থির ভাবছি সেটাই যদি গতিশীল হয়? সত্যিকারের স্থির মূল বিন্দু পাওয়া সোজা কথা না। পৃথিবীর পৃষ্ঠে একটা মূল বিন্দু ধরে নিলে কেউ আপত্তি করতেই পারে, পৃথিবীটা তো স্থির না সেটা তো নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে কাজেই পৃথিবীর পৃষ্ঠে সব কিছু ঘুরছে! আমরা বুদ্ধি করে তখন বলতে পারি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুটি হচ্ছে মূল বিন্দু কিন্তু তখন কেউ একজন আপত্তি করে বলতে পারে সেটিও তো স্থির নয়, সেটি সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। আমরা তখন আরো বুদ্ধিমানের মত বলতে পারি তাহলে সূর্যের কেন্দ্রবিন্দুটিই হোক আমাদের মূল বিন্দু কিন্তু তখন অন্য কেউ আপত্তি করে বলতেই পারে, সূর্যও তো স্থির নয়, সেটাও তো আমাদের গ্যালাক্সির (বাংলায় নামটি ছায়াপথ, ইংরেজিতে Milky Way) কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে। বুঝতেই পারছ এখন সাহস করে কেউ আর গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে মূল বিন্দু ধরবে না– কারণ গ্যালাক্সি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থির কে বলেছে?

আসলে এত জটিলতার কোনো প্রয়োজনও নেই, আমাদের কাজ চালানোর জন্য আমাদের কাছে স্থির মনে হয় এ রকম যেকোনো বিন্দুকে মূল বিন্দু ধরে সব কাজ করে ফেলতে পারব, শুধু বলে দেব সেই মাপজোক কোন মূল বিন্দু এর সাপেক্ষে করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা পরমাণুর ভেতরে ইলেকট্রনের অবস্থান থেকে শুরু করে মহাকাশে পাঠানো উপগ্রহ পর্যন্ত সব কিছুর মাপজোক করে ফেলেছেন, কোনো সমস্যা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কী যদি আমাদের মূল বিন্দুটি সমবেগে চলতে থাকে তাহলে আমরা কোনোদিন জোর করে বলতেও পারব না যে এটা সমবেগে চলছে, নাকী এটা আসলে স্থির এবং অন্য সব কিছু উল্টোদিকে সমবেগে চলছে! থেমে থাকা ট্রেনে বসে পাশের লাইনের চলন্ত ট্রেনকে দেখে কি আমাদের মনে হয় না যে ওটা ট্রেনটাই স্থির, আমরাই চলছি? কাজেই আমরা বলতে পারি একটা মূল বিন্দুর সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তুর অবস্থান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় তাহলে সেই বস্তুটি গতিশীল। যেহেতু মূল বিন্দুটি আসলেই স্থির কিনা সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ আসলে সব গতিই আপেক্ষিক।

আমাদের চারপাশে আমরা অনেক ধরনের গতি দেখতে পাই, সবচেয়ে সোজাটি হচ্ছে সরল রেখার গতি। একটা মার্বেল গড়িয়ে দিলে সেটা সামনের দিকে যায়– গতিটা সরল রেখার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে কাজেই এটাকে রৈখিক গতি (linear motion) বলে। একটা বল উপর থেকে ছেড়ে দিলে সেটা সোজা নিচের দিকে পড়ে, সেটাও রৈখিক গতি।

কোনো কিছু যদি একটা বিন্দুকে ঘিরে ঘুরতে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ঘূর্ণন গতি (Rotation)। বৈদ্যুতিক পাখা ঘড়ির কাটা এসবকে ঘূর্ণন গতির উদাহরণ হিসাবে বলা গেলেও এর মাঝে ঘূর্ণন গতির চমকপ্রদ বিষয়টা নেই, ঘূর্ণন গতির সুন্দর উদাহরন হচ্ছে চাঁদ। চাঁদকে কোনো কিছু দিয়ে পৃথিবীর সাথে বেঁধে রাখা নেই তবু এটা পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে– শুধু তাই নয় এটা আকাশ থেকে টুপ করে পৃথিবীতে পড়েও যায় না!

যত রকম গতি আছে তার মাঝে সবচেয়ে চমকপ্রদ গতি হচ্ছে স্পন্দন গতি (Simple Harmonic Motion)। প্রকৃতিতে আমরা এই গতিটাই মনে হয় সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই। যখন

একটা পেন্ডুলামকে দুলিয়ে দেয়া হয় তখন আমরা এই গতি দেখতে পাই, যখন আমরা কথা বলি তখন বাতাসের অনু এই গতি দিয়ে শব্দকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যখন গিটারের তারে আমরা ঠোকা দিই তখন গিটারের তারে এই স্পন্দন গতি দেখা যায়।

রৈখিক, ঘূর্ণন আর স্পন্দন ছাড়াও গতির ধরন দেখে আমরা আরো নানাভাবে গতিকে বিভিন্ন নামে ডাকতে পারি– কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যা করতে চাইছি তার জন্য ঘুরে ফিরে এই তিনটি দিয়েই আসলে মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় গতিগুলো ব্যাখ্যা কর সম্ভব।

2.3 স্কেলার ও ভেক্টর রাশি (Scalar and Vector)

আমাদের পরিচিত জগতে আমরা যা কিছু পরিমাপ করতে পারি সেটাই রাশি, আনন্দ কিংবা দুঃখ রাশি নয় কিন্তু তাপমাত্রা রাশি। তার কারণ আনন্দ কিংবা দুঃখকে মেপে একটা মান দেয়া যায় না কিন্তু তাপমাত্রা মেপে মান দেয়া সম্ভব। তোমার শরীরের তাপমাত্রা 37° C কিংবা 98.4° F তাপমাত্রা বোঝানোর জন্য একটি সংখ্যা বললেই চলে কিন্তু অনেক রাশি আছে যেগুলোকে একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, হয় তার মানের সাথে একটা দিক বলে দিতে হয়, কিংবা একাধিক মান বলে দিতে হয় যেন সেগুলো মিলিয়ে তার মান এবং দিক দুটোই নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়। অবস্থান ছিল সে রকম একটি রাশি, সেটা বোঝানোর জন্য আমাদের শুধু দূরত্ব দিয়ে কাজ হয়নি, তার দিকটিও নির্দেশ করতে হয়েছিল! আমরা দিকটি একটা কোণ দিয়ে প্রকাশ করে দেখিয়েছিলাম, x এবং y দিকে দুটো অংশ দিয়েও দেখানো হয়েছিল। কাজেই যে রাশি শুধু একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় সেটা হচ্ছে স্কেলার আর যেটা প্রকাশ করার জন্য একটা দিকও (ছবি 2.10) বলে দিতে হয় সেটা হচ্ছে ভেক্টর।

তাপমাত্রা ছাড়াও স্কেলারের উদাহরণ হচ্ছে সময়, দৈর্ঘ্য কিংবা ভর। কারণ এগুলো শুধু একটা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে ফেলা যায়। তোমরা দেখবে অবস্থান ছাড়াও ভেক্টরের উদাহরণ হচ্ছে বেগ কিংবা বল। কারণ এগুলো প্রকাশ করতে হলে মানের সাথে সাথে দিকটাও বলে দিতে হয়।

ভেক্টর রাশিকে স্কেলার রাশি থেকে আলাদা করে লেখার জন্য সেটাকে মোটা (Bold) করে লেখা হয় (**x, y** কিংবা **A, B**)। বইয়ে কিংবা কম্পিউটারে প্রিন্ট করার সময় যে কোনো কিছু মোটা করে লেখা সহজ। কিন্তু যখন কেউ হাতে কাগজে লিখে তখন কোনো কিছুকে ভেক্টর বোঝানোর জন্য তার উপরে ছোট করে একটা তীর চিহ্ন দেয়া হয় ($\vec{x}, \vec{y}$ কিংবা $\vec{A}, \vec{B}$)।

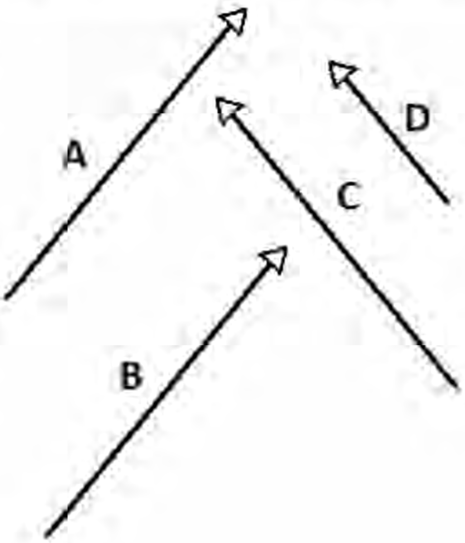

ছবি **2.10:** $\boldsymbol{A}$ ও $\boldsymbol{B}$ ভেক্টর হুবহু এক যদিও ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে, $\boldsymbol{C}$ ভেক্টর $\boldsymbol{A}$ ও $\boldsymbol{B}$ থেকে ভিন্ন কারণ মান সমান হলেও দিক ভিন্ন। $\boldsymbol{D}$ ভেক্টর $\boldsymbol{C}$ ভেক্টর থেকে ভিন্ন, কারণ দিক একই হলেও মান সমান নয়

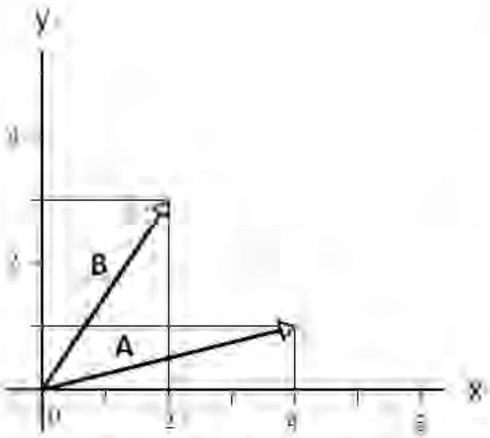

ছবি 2.11: ***A*** **ও *B*** দুটি ভেক্টর মূল বিন্দু থেকে আঁকা হয়েছে

তোমাদের এখানে যেটুকু পদার্থবিজ্ঞান শেখানো হবে সেখানে আসলে সত্যিকার অর্থে ভেক্টরের ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না, বড় জোর কোনটা স্কেলার কোনটা ভেক্টর মাঝে মাঝে সেটি মনে করিয়ে দেয়া হবে।

উদাহরণ 2.4: ছবি 2.11 এ দেখানো **A** এবং **B** দুটি ভেক্টর। তাদের যোগফল কত?

উত্তর: ভেক্টরগুলোর মান এবং দিক দুটোই আছে। এটি যেভাবে দেখানো আছে তাতে প্রত্যেকটা ভেক্টরকেই আমরা দুটো রাশি দিয়েই প্রকাশ করতে পারি। ছবিতে দেখানো ভেক্টরের জন্য x এবং y দিয়ে প্রকাশ করা সহজ।

A ভেক্টরের x এবং y অংশের মান যথাক্রমে 4 এবং 1
B ভেক্টরের x এবং y অংশের মান যথাক্রমে 2 এবং 3

A এবং **B** যোগ করতে হলে দুটি ভেক্টরের x অংশ এবং y অংশ আলাদাভাবে যোগ করতে হবে।

$A + B = C$ হলে **C** এর x অংশ হচ্ছে $4 + 2 = 6$
এবং **C** এর y অংশ হচ্ছে $1 + 3 = 4$

কাজেই আমরা **C** ভেক্টর আঁকতে পারি।

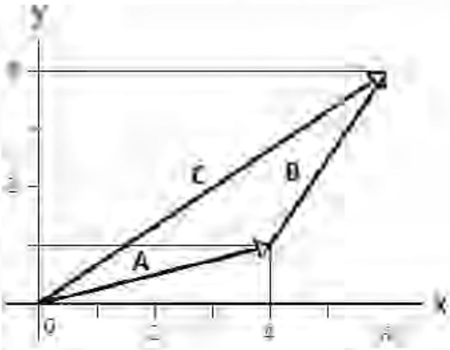

ছবি 2.12: ***A*** **ও *B*** ভেক্টর যোগ করে **C** ভেক্টর পাওয়া গেছে

তোমরা ইচ্ছে করলেই দেখাতে পার যেখানে **A** ভেক্টর শেষ হয়েছে সেখান থেকে **B** ভেক্টরটি শুরু করলে **A** ভেক্টরের গোড়া থেকে **B** ভেক্টরের শেষ মাথা হবে **C** ভেক্টর। (ছবি 2.12)

এখানে একটা জিনিস লক্ষ কর, আমরা ভেক্টর লেখার জন্য $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ লিখিনি **A**, **B**, **C** লিখেছি, এটাই প্রচলিত নিয়ম। খাতায় কলম দিয়ে যেহেতু **A** এবং A এর পার্থক্য বোঝানো সহজ নয় তাই হাত দিয়ে লেখার সময় ভেক্টরকে $\vec{A}$, লিখলে বোঝানো সহজ হয়।

উদাহরণ 2.5: 2.11 ছবিতে দেখানো $A - B$ সমান কত?

উত্তর: আগের বার $A + B$ অংশগুলো যোগ করতে হয়েছিল, এবারে বিয়োগ করতে হবে।
$A - B = D$ হলে **D** এর x অংশ $4 - 2 = 2$
D এর y অংশ হচ্ছে $1 - 3 = -2$

কাজেই আমরা **D** ভেক্টর আঁকতে পারি: ছবি 2.13

আবার লক্ষ কর $A - B = D$ কে লেখা যায় $A = D + B$

কাজেই আগের বারের মতো আমরা বলতে পারি **D** ভেক্টর যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে **B** ভেক্টর শুরু করলে আমরা **A** ভেক্টর পেয়ে যাব।

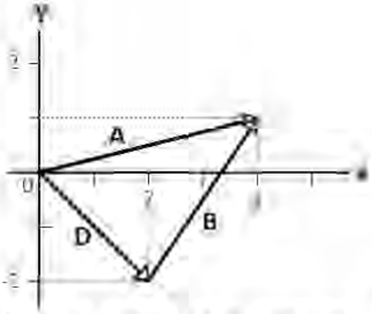

ছবি 2.13: A থেকে B ভেক্টর বিয়োগ করে D ভেক্টর পাওয়া গেছে, যার অর্থ $A + D = B$

উদাহরণ 2.6: উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে চারটি সমমান ভেক্টরের যোগফল কত?

উত্তর: 2.14 ছবিতে চারটি ভেক্টর দেখানো হয়েছে। আমরা ইচ্ছে করলে তাদের x অংশ গুলো এবং y অংশগুলো আলাদাভাবে যোগ করে চূড়ান্ত ভেক্টরটা বের করতে পারি। আমরা আরো সহজ উপায়ে অন্যভাবেও সেটা করতে পারি। ভেক্টরের যোগ বের করার সময় আমরা দেখিয়েছি একটা ভেক্টর যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরেকটা ভেক্টর শুরু করা হলে প্রথমটার শুরু এবং দ্বিতীয়টার শেষ হচ্ছে যোগ করা ভেক্টর। কাজেই চারটা ভেক্টর একটার পর আরেকটা বসিয়ে যেতে পারি। আমরা সেভাবে করে গেলে দেখব যোগফল শূন্য!!

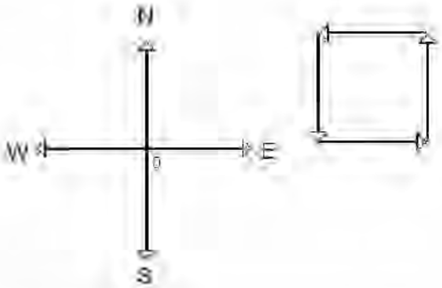

ছবি 2.14: চারদিকে সমান মানের চারটি ভেক্টর যোগ করা হলে তার যোগফল হবে শূন্য।

2.4 বেগ, দ্রুতি ও সরণ (Velocity, Speed and Displacement)

বেগ বলতে কী বোঝানো হয় আমরা সবাই সেটা মোটামুটি জানি, কোনো কিছু কত দ্রুত যাচ্ছে তার পরিমাপটা হচ্ছে বেগ। বেগ হচ্ছে ভেক্টর তাই কত দ্রুত যাচ্ছে শুধু সেটা বললেই হবে না, সেটা কোন দিকে যাচ্ছে সেটাও বলে দিতে হবে। পদার্থবিজ্ঞানে বেগের পাশাপাশি আরো একটা রাশি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে দ্রুতি (Speed)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলতে গিয়ে বেগ এবং দ্রুতি দুটোই একটার পরিবর্তে আরেকটা ব্যবহার করে ফেলি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের বেলায় সেটা একেবারেই করা যাবে না। যেহেতু বেগের মান হচ্ছে দ্রুতি তাই কেউ কেউ মনে করতে পারে দ্রুতি রাশিটি আলাদা ভাবে তৈরী না করলেও চলত, যখন প্রয়োজন হতো তখন বলে দিতাম "বেগের মান"। কিন্তু সেটি সত্যি নয় দ্রুতি রাশিটি তৈরি না করে শুধু বেগ দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করলে কী সমস্যা হতো তার একটা উদাহরণ দেয়া যাক।

বিজ্ঞান কিংবা পদার্থবিজ্ঞানে "গড়" একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, নিখুঁতভাবে কিছু পরিমাপ করতে হলে অনেকবার একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হয় তারপর ফলাফলের গড় নিতে হয়। অনেক

জায়গায় প্রকৃত মানটি জানা সম্ভব হয় না তখন গড় মান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাই বোঝাই যাচ্ছে বেগের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা রাশিমালারও নিশ্চয়ই অসংখ্যবার গড় নিতে হতে পারে।

বেগ হচ্ছে অবস্থানের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ একক সময়ে অবস্থানের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে তার মান। অবস্থানের পরিবর্তনের আরেকটা নাম আছে, সেটা হচ্ছে সরণ (Displacement), অবস্থান যেহেতু ভেক্টর তাই সরণও ভেক্টর। তাই যদি আমাদের বেগ বের করতে হয় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে যেটুকু সরণ হয়েছে সেটাকে অতিক্রান্ত সময় দিয়ে ভাগ দিতে হবে। ঐ সময়টুকুতে বেগ যে সব সময় সমান থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই, কখনো বেশি বা কম হতে পারে তাই আমরা যদি খানিকটা সময়ে যেটুকু সরণ হয়েছে সেটা থেকে বেগ বের করি তাহলে আসলে বের হবে সেই সময়ের গড় বেগ। এবারে আমরা প্রথম উদাহরণটাতে ফিরে যাই: একটা মাইলপোস্টে লেখা আছে ঢাকা শহরের দূরত্ব 9 কিলোমিটার এবং তুমি তিন ঘন্টায় হেঁটে ঢাকা শহরে পৌঁছ। তোমার বেগ কত?

হয়তো হাঁটতে হাঁটতে তুমি কখনো বিশ্রাম নিয়েছ, কখনো জোরে হেঁটেছ, কখন আস্তে হেঁটেছ তাই প্রতি মুহূর্তের বেগ আমরা জানি না। আমরা শুধুমাত্র এই তিন ঘণ্টায় তোমার গড় বেগ কতোটুকু সেটা বের করতে পারি। গড় বেগ বের করার জন্য প্রথমে দেখতে হবে কতটুকু সরণ হয়েছে। সেটা খুবই সোজা, কাকটা যে পথ দিয়ে উড়ে এসেছে সেটাই সরণ অর্থাৎ শেষে যে অবস্থানে পৌঁছেছ সেটা থেকে প্রথম অবস্থানের পার্থক্যটুকুই সরন! কাজেই আমরা বলতে পারি তোমার সরণ s হচ্ছে উত্তর দিকে $3\ km$.

$s = 3\ km$ (উত্তর দিকে)

সরণের মাত্রা L

সময় লেগেছে 3 ঘন্টা কাজেই গড় বেগ (উত্তর দিকে)

$$V = \frac{s}{t} = \frac{3}{3} = 1\ km/hour$$

বেগের মাত্রা LT^{-1}

কাজেই তোমার গড় বেগের মান হচ্ছে $1\ km/hour$! তুমি নিশ্চয়ই এখন মাথা চুলকে ভাবছ আমি তিন ঘণ্টায় 9 কিলোমিটার হেঁটেছি, একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় প্রতি ঘণ্টায় মোটামুটি 3 km করে হেঁটেছি কিন্তু আমার বেগ মাত্র $1\ km/hour$ কেমন করে হয়?

ব্যাপারটা আরো জটিল করে দিতে পারি! ধরা যাক তুমি গাড়ি করে স্কুল থেকে রওনা দিয়েছ। ড্রাইভার সারা শহর ঘুরে চার ঘণ্টা পরে স্কুলে ফিরে এসেছে। গাড়ির মাইল মিটারে দেখা গেল এই চার ঘণ্টায় গাড়িটা 100 কিলোমিটার গিয়েছে। গাড়িটার গড় বেগ কত? বুঝতে পারছ প্রথমে চার ঘণ্টায় কতটুকু সরণ হয়েছে সেটা বের করতে হবে। যেখান থেকে রওনা দিয়েছ যেহেতু সেখানেই ফিরে এসেছ তাই সরণ হচ্ছে শূন্য! কাজেই চার ঘণ্টার গড় বেগ হচ্ছে শূন্য! মনে রেখো গড় বেগ শূন্য, তার মানে এই না যে তাৎক্ষণিক বেগ শূন্য! গাড়িটা যখন যাচ্ছিল তখন প্রতি মুহূর্তেই কিন্তু তার একটা বেগ ছিল যেটি মোটেও শূন্য নয়– কিন্তু চার ঘণ্টা গড় করার পর সেটা শূন্য হয়েছে কারণ বেগ হচ্ছে ভেক্টর। ভেক্টরের দিক থাকে, কাজেই গাড়িটার বেগ কখনো ছিল উত্তর দিকে, ঠিক সে রকম কখনো ছিল দক্ষিণে, একটা আরেকটাকে কাটাকাটি করে দিয়েছে।

তোমাদের হতাশ হবার কোনো কারণ নেই, বেগের গড় নিয়ে জটিলতা দূর করার জন্য "দ্রুতি" রাশিটি তৈরি হয়েছে। দ্রুতি ভেক্টর নয়, তাই যখন গড় নেয়া হয় তখন এক অংশ অন্য অংশকে কাটাকাটি করতে পারে না! কাজেই তিন ঘণ্টায় 9 km হেঁটে তুমি যখন ঢাকা পৌঁছেছ তখন তোমার গড় দ্রুতি

$$V = \frac{d}{t} = \frac{9}{3} = 3\ km/hour$$

দ্রুতির মাত্রা LT^{-1}

ঠিক তুমি যে রকম ভেবেছিলে। স্কুলের গাড়ির বেলাতেও সেটা সত্যি, তার গড় দ্রুতি

$$V = \frac{100}{4} = 25\ km/hour$$

যেটা মোটেও শূন্য নয়। (নিশ্চয়ই এটাও লক্ষ করেছ দ্রুতির বেলায় কোনো দিকের কথা বলতে হল না!)

উদাহরণ 2.7: বেগ আর দ্রুতির মাঝে সম্পর্কটা আরো ভালো করে বোঝার জন্য আমরা আরেকটা উদাহরণ নেই। ধরা যাক একটা সুতা দিয়ে ছোট একটা পাথরকে বেঁধে তুমি সেটাকে মাথার উপরে ঘোরাচ্ছ। পাথরটা কি সমবেগে যাচ্ছে নাকি সমদ্রুতিতে যাচ্ছে? নাকি সমদ্রুতি এবং সমবেগে যাচ্ছে? (ছবি 2.15)

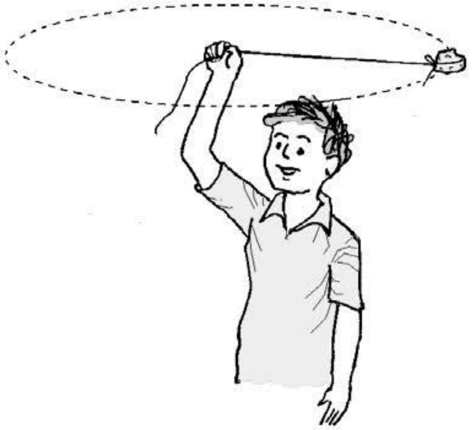

ছবি 2.15: সূতায় বেধে একটি পাথর ঘোরানো হলে দ্রুতি এক থাকলেও বেগের পরিবর্তন হয়।

উত্তর: একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে পাথরটার দ্রুতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে! কারণ প্রতি মুহূর্তে পাথরটার গতির দিক পাল্টে যাচ্ছে। এটি যদি সোজা যেত তাহলে গতির দিকের পরিবর্তন হতো না কিন্তু যেহেতু ঘুরছে তাই দিকটা পাল্টে যাচ্ছে। কাজেই এটি হচ্ছে সমদ্রুতির উদাহরণ– সমবেগের নয়! সমবেগ হলে সমদ্রুতি হতেই হবে কিন্তু সমদ্রুতি হলেই যে সমবেগ হতে হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

উদাহরণ 2.8: পাথরটিকে হঠাৎ ছেড়ে দিলে তখন কি সেটা সমবেগ এবং সমদ্রুতিতে যাবে?

উত্তর: পাথরটি হঠাৎ ছেড়ে দিলে এটা সোজা সমবেগ এবং সমদ্রুতিতে ছুটে যাবে– বাতাসের ঘর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ বল এসব যদি না থাকত তাহলে সমবেগ এবং সমদ্রুতিতে যেতেই থাকত!

উদাহরণ 2.9: ছবি 2.16 এর গ্রাফে কোনো একটা বস্তুর সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তনটুকু দেখানো হয়েছে। কোনটি সমবেগ এবং কোনটি সমবেগ নয় বল। গ্রাফে সময়ের সাথে বেগের মান দেখাও।

উত্তর: A ক্ষেত্রে বস্তুটি স্থির, সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না। তাই তার বেগ শূন্য।

B ক্ষেত্রে বস্তুটি সমবেগে যাচ্ছে।

C ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বস্তুটির বেগ বেড়ে যাচ্ছে।

প্রথম গ্রাফে সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য যে বেগ হবে দ্বিতীয় গ্রাফে সেটি দেখানো হয়েছে। একটু খুঁটিয়ে দেখ।

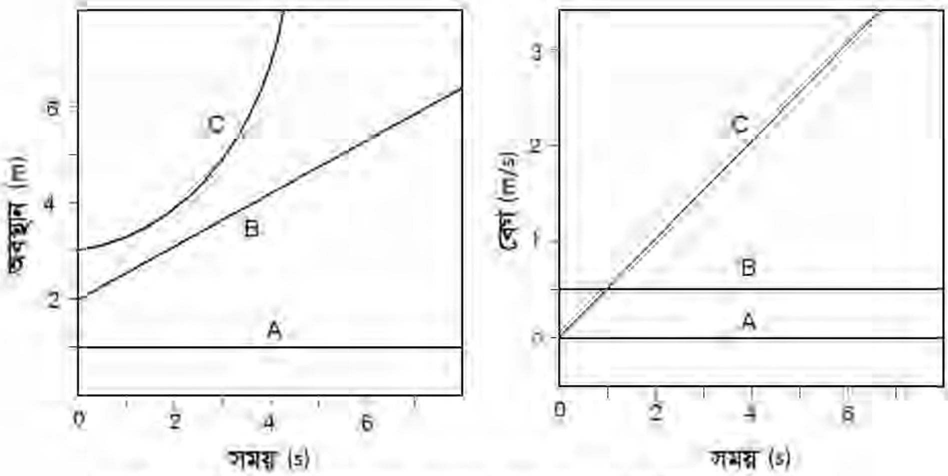

ছবি 2.16: কোনো একটি বস্তুর সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তন।

2.5 ত্বরণ (Acceleration)

বেগ দ্রুতির ব্যাপারটা আমরা অনেকটাই সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারি। বাংলা দ্রুতি শব্দটি সেভাবে না হলেও ইংরেজি Speed শব্দটি দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক ব্যবহারও করি। ত্বরণের বিষয়টা খানিকটা ভিন্ন; আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক জায়গাতেই সেটা আমরা দেখি, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে এটা বুঝতে পারি না। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় ত্বরণ শব্দটি ব্যবহার হয় না। তারচেয়ে বড় কথা পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে চমকপ্রদ যে বিষয়গুলো আছে তার মাঝে ত্বরণ একটি, কাজেই এটা আমাদের সবারই সত্যিকার ভাবে অনুভব করা দরকার।

যখন কোনো কিছু সমবেগে যায় তার মাঝে কোনো ত্বরণ নেই। বেগের পরিবর্তন করতে হলে ত্বরণের প্রয়োজন। 2.16 ছবিতে c এর ক্ষেত্রে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ এখানে ত্বরণ রয়েছে। কাজেই ত্বরণ বলতে বোঝানো হয় বেগের পরিবর্তনের হার। বেগ যেহেতু ভেক্টর তার মান আর দিক দুটোই আছে কাজেই দিক ঠিক রেখে মান পরিবর্তন হলে যে রকম বুঝতে হবে ত্বরণ হচ্ছে ঠিক সে রকম বেগের মান অপরিবর্তিত থেকে দিকের পরিবর্তন হলেও বুঝতে হবে ত্বরণ হচ্ছে। গাড়ির গতি বেড়ে যাওয়ার অর্থ ত্বরণ হওয়া গাড়ি ঘুরে যাওয়া মানেও ত্বরণ হওয়া।

উদাহরণ 2.10: ছবি 2.17 এর গ্রাফে কোনো একটা বস্তুর সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। কোথায় ত্বরণ আছে কোথায় নেই বল।

উত্তর: A তে ত্বরণ আছে, B তে ত্বরণ নেই, C তে ত্বরণ আছে, D তে মন্দন বা নেগেটিভ ত্বরণ আছে।

প্রথমে দিক অপরিবর্তিত রেখে শুধু মানের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা যাক, অন্যভাবে বলা যেতে পারে রৈখিক গতিতে ত্বরণ বলতে কী বোঝাই সেটার আলোচনা।

ত্বরণ হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের হার, যদি সমত্বরণ হয়, অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে ত্বরণের পরিবর্তন না হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি

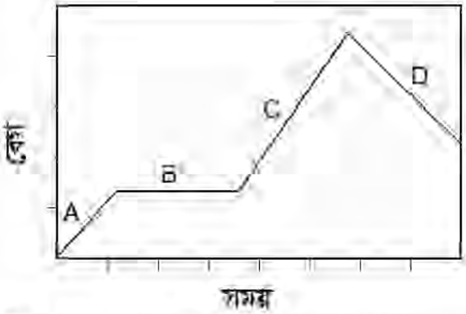

ছবি 2.17: কোনো একটি বস্তুর সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তন।

$$\text{ত্বরণ} = \frac{\text{শেষ বেগ} - \text{আদি বেগ}}{\text{অতিক্রান্ত সময়}}$$

অর্থাৎ যদি প্রথমে কোনো কিছুর বেগ হয় u এবং t সময় পর তার বেগ হয় v তাহলে ত্বরণ a হচ্ছে

$$a = \frac{v-u}{t}$$

ত্বরণের মাত্রা LT^{-2}

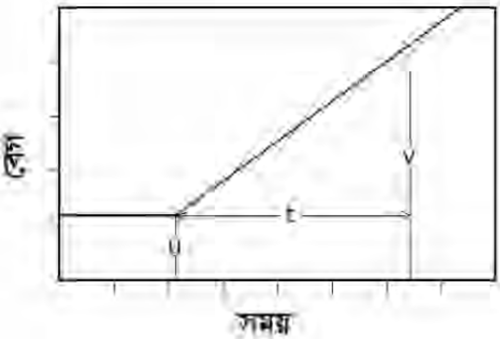

ছবি 2.18: স্থির অবস্থায় শুরু করে সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর বেগ বেড়ে যাওয়া

কাজেই যদি ত্বরণ a জানা থাকে তাহলে কোনো বস্তুর আদি বেগ u হলে t সময় পর তার বেগ v বের করা খুব সোজা। (ছবি 2.18)

$$v = u + at$$

বস্তুটি যদি স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে তাহলে

$$v = at$$

আমরা ইতোমধ্যে বলেছি এখন পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সব কিছু সত্যি সমত্বরণের জন্য। যদি সমত্বরণ না হয় তাহলে কিন্তু এত সহজে শুধুমাত্র আদিবেগ আর শেষ বেগ থেকে ত্বরণ বের করে ফেলা যাবে না।

উদাহরণ 2.11: একটা গাড়ির বেগ 1 মিনিটে স্থির অবস্থা থেকে বেড়ে 60 km/hour হয়েছে, গাড়িটির ত্বরণ কত?

উত্তর: আমরা সময়ের জন্য মিনিট বা ঘণ্টা ব্যবহার না করে এখন থেকে সেকেন্ড (s) এবং দূরত্বের জন্য মাইল বা km ব্যবহার না করে m ব্যবহার করব।

গাড়ির চূড়ান্ত বেগ

$$v = 60\frac{km}{hour} = \frac{60 \times 1000\ m}{60 \times 60\ s} = 16.67\ m/s$$

কাজেই সমস্যাটি হচ্ছে এ রকম 60 s এ একটা গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে 16.67 m/s গতিতে পৌঁছে গেছে গাড়িটির ত্বরণ কত?

$$v = at$$

$$a = \frac{v}{t} = \frac{16.67\ m/s}{60\ s} = 0.278\ m/s^2$$

উদাহরণ 2.12: একটা গাড়ি 60 mile/hour বেগে চলতে হঠাৎ তার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। গাড়িটি থামতে 5 minute সময় নেয়। গাড়িটির মন্দন কত?

উত্তর: ত্বরণ থাকলে বেগ বাড়তে থাকে, আর বেগ কমতে থাকার অর্থ ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ত্বরণ বা মন্দন রয়েছে।
আবার আমরা সময়ের জন্য s এবং দূরত্বের জন্য m ব্যবহার করব।

1 mile = 1.6 km=1600 m

গাড়িটির আদি বেগ

$$u = 60\frac{mile}{hour} = \frac{60 \times 1.6 \times 1000\ m}{60 \times 60\ s} = 26.8\ m/s$$

গাড়িটির শেষ বেগ $v = 0$

ত্বরণ

$$a = \frac{v-u}{t} = \frac{0 - 26.8\ m/s}{60\ s} = -0.089\ m/s^2$$

অর্থাৎ গাড়িটির ত্বরণ $-0.089\ m/s^2$ কিংবা মন্দন $0.089\ m/s^2$

আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি তার মাঝে সমত্বরণের একটা খুব চমকপ্রদ একটা উদাহরণ আছে- সেটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ যেটাকে লেখা হয় g দিয়ে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি তার মান হচ্ছে 9.8 m/s^2. আমরা যদি কিছু একটা স্থির অবস্থা থেকে ছেড়ে দিই তাহলে দেখতে পাই তার

গতিবেগ $v = gt$ হিসাবে বেড়ে যাচ্ছে। গতি সম্পর্কে আমরা যা কিছু শিখব তার বেশির ভাগ আমরা এই ত্বরণটি ব্যবহার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারি।

উদাহরণ 2.13: ত্বরণ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য কোনো একটা বস্তুর ওপর নির্দিষ্ট সময় $1 m/s^2$ ত্বরণ প্রয়োগ করতে চাই। কীভাবে করব?

উত্তর: আমরা যখন কোনো কিছু ওপর থেকে স্থির অবস্থায় ছেড়ে দিই সেটা বেশ বেগে নিচে এসে আঘাত করে– যার অর্থ ছেড়ে দেয়া বস্তুটার ত্বরণ হয়। আমরা যদি এই ত্বরণটা মাপি তাহলে দেখতে পাব তার মান হচ্ছে $9.8 m/s^2$. এটাকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ, এটাকে লেখা হয় g দিয়ে। (পরের অধ্যায়ে আমরা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ কেন হয় কীভাবে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব, এখানে ধরে নিই এটা আছে, এর মান $9.8 m/s^2$ এবং এটা খাড়া নিচের দিকে।)

এই মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g কে ব্যবহার করে আমরা যে কোনো মানের ত্বরণ তৈরি করতে পারি। আমরা সবাই দেখেছি কাত হয়ে থাকা একটা নমতলের ওপর কিছু একটা রাখলে সেটা নিচে গড়িয়ে পড়ে। যত বেশি কাত করে রাখা যায় জিনিসটা তত দ্রুত নিচে পড়ে। এটুকু জানলেই আমরা আমাদের যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু ত্বরণ তৈরি করে ফেলতে পারব। আমরা দেখেছি যে কোনো ভেক্টরকে আসলে একাধিক ভেক্টরের যোগফল হিসাবে লেখা যায় শুধু আমাদের লক্ষ রাখতে হয় যেন একটি ভেক্টর যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে যেন অন্য ভেক্টরটা শুরু হয়। এই ছবিতেও g ভেক্টরটাকে আমরা দুটো ভেক্টরের যোগফল হিসাবে লিখেছি– শুধু এমন ভাবে দুটো ভেক্টর বেছে নিয়েছি যেন তাদের মাঝে $90°$ একটা কোণ থাকে (ছবি 2.19) এটা করার কারণে একটা মজার বিষয় ঘটেছে, আমরা বলতে পারছি জিনিসটার ওপর আসলে "দুটি" ত্বরণ কাজ করছে একটি নমতলের দিকে g_1 অন্যটি নমতলের সাথে খাড়াভাবে g_2 – তোমরা বুঝতেই পারছ g_2 যেহেতু নমতলের ওপর খাড়া নিচের দিকে তাই জিনিসটার গতিতে সেটার

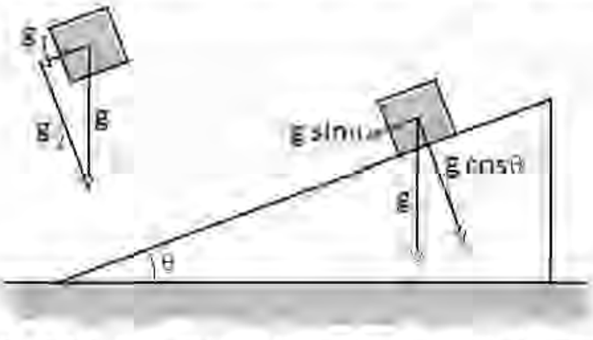

ছবি 2.19: একটি বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণকে θ কোণের সমতলের সাথে সমান্তরাল $g\,sin\theta$ এবং লম্ব $g\,cos\theta$ এই দুই অংশে ভাগ করা যায়।

প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই (জিনিসটা নমতলে একটু চাপ প্রয়োগ করবে– আর বেশি কিছু না), কিন্তু g_1 যেহেতু নমতলের সাথে সমান্তরাল এবং জিনিসটা এদিকে যেতে পারে তাই g_1 ত্বরণটা গতিবেগ বাড়াতে পারবে।

কাজেই আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। নমতলটির কোণ θ এমন ভাবে ঠিক করতে হবে যেন আমরা g_1 এর একটা নির্দিষ্ট মান পাই। ছবিতে দেখানো জ্যামিতি থেকে আমরা বলতে পারি:

$g_1 = g \sin \theta$
$g_2 = g \cos \theta$

আমরা $1 m/s^2$ ত্বরণ চাই, অর্থাৎ $g_1 = 1\ m/s^2$

$$\sin \theta = \frac{g_1}{g} = \frac{1}{9.8} = 0.102$$

$$\theta = 5.86^\circ$$

অর্থাৎ আমরা যদি এক টুকরা সমতল কাঠ 5.86° ডিগ্রি কোণে রাখি তাহলে সেই কাঠের ওপর যেটাই রাখব সেটার ত্বরণ হবে $1\ m/s^2$। এভাবে আমরা যে কোনো কিছুর ওপর 0 থেকে $9.8\ m/s^2$ পর্যন্ত যে কোনো ত্বরণ প্রয়োগ করতে পারব।

শুধু একটা বাস্তব বিষয় মনে রাখতে হবে, একটা জিনিসের উপর আরেকটা জিনিস রাখা হলে দুটোর ভেতরে ঘর্ষণের কারণে আমরা ত্বরণ প্রয়োগের ফলটা পুরোপুরি নাও দেখতে পারি। এজন্য এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য যা একটা কিছু না রেখে একটা মার্বেল কিংবা একটা খেলনা গাড়ি রাখতে পারি তাহলে ঘর্ষণটা আর বড় সমস্যা হবে না।

উদাহরণ 2.14: একটা সমতল কাঠের টুকরা 45° কোণে রাখা হয়েছে। ওপর থেকে একটা মার্বেল ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দুই সেকেন্ড পর মার্বেলের গতিবেগ কত হবে?

উত্তর: 45° কোণে রাখা কাঠের ওপর ত্বরণের মান হবে
$a = g \sin 45^\circ = 9.8 \times 0.707 = 6.93\ m/s^2$
যেহেতু মার্বেলের আদিবেগ $u = 0$, কাজেই $2\ s$ পর মার্বেলের গতিবেগ
$v = u + at = 0 + 6.93 \times 2\ m/s = 13.86\ m/s$

2.6 ঘূর্ণন গতি (Circular motion)

এতক্ষণ আমরা রৈখিক গতিতে ত্বরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রেখেছি সমত্বরণের মাঝে। এবারে আমরা দিক পরিবর্তনের জন্য যে ত্বরণ হয় সেটা নিয়েও একটু খানি আলোচনা করি। সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে যখন কোনো কিছু বৃত্তাকারে ঘুরে। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর ঘূর্ণন বা তুমি যদি ছোট একটা পাথরকে সুতো দিয়ে বেঁধে ঘোরাও সেটা তার উদাহরণ হতে পারে। রৈখিক গতির বেলায় ব্যাপারটা সহজ ছিল, পরিবর্তনটা ছিল গতিবেগ বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার মাঝে। ঘূর্ণনের মাঝে সে রকম কিছু নেই বেগের মান (বা দ্রুতি) অপরিবর্তিত, শুধু দিকটার পরিবর্তন হচ্ছে–

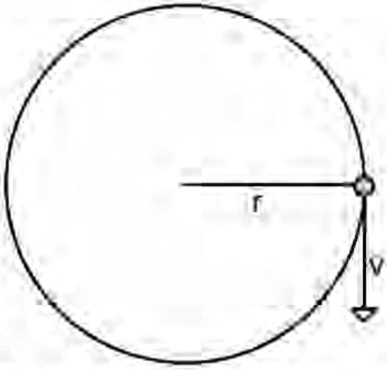

ছবি 2.20: কোনো বস্তুর ঘূর্ণন গতি ব্যাখ্যা করতে শুধু মাত্র v এবং r প্রয়োজন

এর মাঝে যে ত্বরণ হচ্ছে সেটাও সাধারণভাবে চট করে বোঝা যায় না। (ছবি 2.20)

চুলচেরা বিশ্লেষন করে ঘূর্ণনজনিত ত্বরণ বের করা যায় কিন্তু আমরা সেটা না করে একটা শর্টকাট পদ্ধতি ব্যবহার করি। আমরা জানি ত্বরণের মাত্রা হচ্ছে LT^{-2} কাজেই ঘূর্ণনের বেলায় যে ত্বরণটি হবে তারও মাত্রা হতে হবে LT^{-2} ঘূর্ণনের সময় যা ঘটছে সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য মাত্র দুটি রাশির প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে দ্রুতি v এবং বৃত্তাকার ঘূর্ণনের ব্যাসার্ধ r, এর বাইরে কিছু নেই। এখানে যেহেতু আর কিছুই নেই তাই বৃত্তাকার ঘূর্ণনের ত্বরণটি শুধুমাত্র v এবং r ব্যবহার করে তৈরি করতে হবে। এখন আমরা ইচ্ছে মতো v এবং r ব্যবহার করা শুরু করি যতক্ষণ পর্যন্ত তার মাত্রা LT^{-2} না হচ্ছে। যেমন

v/r হয়নি, কারণ মাত্রা: T^{-1}

vr হয়নি, কারণ মাত্রা: L^2T^{-1}

r/v হয়নি, কারণ মাত্রা: T

v^2/r হয়েছে! মাত্রা: LT^{-2} আমরা যেটা চেয়েছি!

কাজেই আমরা বলতে পারি সম্ভবত v^2/r হচ্ছে ঘূর্ণনজনিত ত্বরণ! আসলেই তাই– ঘূর্ণনজনিত ত্বরণ a হচ্ছে

$$a = v^2/r$$

ঘূর্ণনজনিত ত্বরণের মাত্রা	LT^{-2}

আমি জানি তোমাদের অনেকের ভ্রু কুচকে উঠছে অনেকের চোখ বড়বড় হয়ে উঠেছে– কিন্তু এটা সত্যি! দেখবে আমরা এই ছোট নিরীহ সংজ্ঞাটি দিয়ে বিস্ময়কর সব কা– করে ফেলব!

উদাহরণ 2.15: চাঁদের ত্বরণ কত? (পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব 384,400 km)

উত্তর: চাঁদ যেহেতু পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে তাই প্রতি মুহূর্তে এবং দিক পরিবর্তন হচ্ছে তাই এর নিশ্চয়ই একটা ত্বরণ রয়েছে। আমরা জানি ঘূর্ণনের জন্য ত্বরণ হচ্ছে:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

যেখানে v হচ্ছে বেগের তাৎক্ষণিক মান বা দ্রুতি এবং r হচ্ছে বৃত্তাকার কক্ষপথের ব্যাসার্ধ– বলে দেয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে $384{,}400\ km$. ত্বরণ বের করার জন্য প্রথমে v বের করতে হবে।

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$2\pi r$ হচ্ছে কক্ষপথের পরিধি এবং T হচ্ছে এই পুরো পরিধিটি একবার ঘুরে আসার সময়। আমরা যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদ দেখি, পূর্ণিমা অমাবশ্যা লক্ষ করি তারা জানি এক পূর্ণিমা থেকে অন্য পূর্ণিমা আসতে সময় নেয় 29.5 দিন। চাঁদ আসলে 27 দিনে পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসে কিন্তু পৃথিবী যেহেতু নিজে থেমে নেই– তাই পৃথিবী থেকে চাঁদকে ঠিক একই জায়গায় একইভাবে দেখতে

একটু বেশি সময় (29.5 দিন) নেয়। কাজেই 29.5 দিন না ধরে সত্যিকারের সময় 27 দিন ধরে নিলে:

$$v = \frac{2\pi \times 384{,}400 \times 1000}{27 \times 24 \times 60 \times 60}\, m/s = 1035\, m/s$$

আনুমানিক 1km/s! কাজেই ত্বরণ :

$$a = \frac{(1035)^2}{384{,}400 \times 1000} = 2.78 \times 10^{-3}\, m/s^2$$

এই ত্বরণের মানটি আমরা পরে আরো একবার ব্যবহার করব।

2.7 গতির সমীকরণ (Equation of Motions)

গতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত যে যে রাশিগুলোর কথা বলেছি সেগুলো হচ্ছে :

u: আদি বেগ, সময়ের শুরুতে যে বেগ

a: ত্বরণ

t: যে সময়টুকু অতিক্রান্ত হয়েছে

v: অতিক্রান্ত সময়ের পর বেগ

s: অতিক্রান্ত সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

এই রাশিগুলোর মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে তার প্রায় সবগুলো এর মাঝে আমরা বের করে ফেলেছি, শুধু একটি বাকি রয়ে গেছে সেটি হচ্ছে s বা অতিক্রান্ত দূরত্ব। যদি কোনো ত্বরণ না থাকে তাহলে বেগের পরিবর্তন হয় না তাই আদি বেগ আর শেষ বেগ সমান ($v = u$) আর অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে

$$s = v\,t$$

যদি সম ত্বরণ থাকে তাহলে

$$v = u + at$$

যার অর্থ সময়ের সাথে সাথে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে। কাজেই অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে হলে প্রতি মুহূর্তের বেগের সাথে সেই মুহূর্তের সময় গুণ করে করে পুরো সময়ের জন্য হিসাব করতে হবে। এই ধরনের হিসাব-নিকাশ করার জন্য বিশেষ গণিত (ক্যালকুলাস) জানতে হয়– আমরা সেগুলো ছাড়াই কাজটা করে ফেলব। সেটা সম্ভব হবে কারণ আমরা শুধুমাত্র সমত্বরণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।

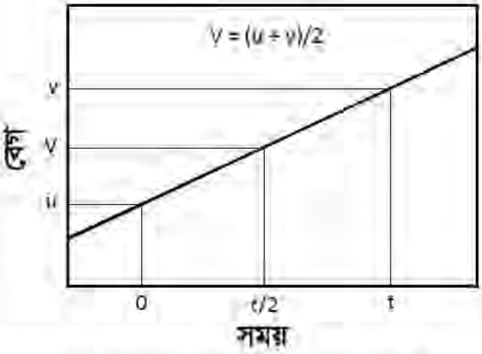

ছবি **2.21**: সমত্বরণের গতিতে গড় বেগ হচ্ছে আদি বেগ ও শেষ বেগের মাঝামাঝি বেগ

প্রতি মুহূর্তে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে তাই আমরা $s = vt$ লিখতে পারছি না কিন্তু আমরা যদি একটা

গড় বেগ V ধরে নিই তাহলে কিন্তু লিখতে পারি

$$s = V\,t$$

এখন শুধু আমাদের গড় বেগ ঠিক করে বের করে নিতে হবে। সমত্বরণের জন্য বিষয়টি সহজ। কোনো কিছু যদি সম হারে বাড়তে থাকে তাহলে তার গড় মান হচ্ছে ঠিক মাঝামাঝি সময়ের মান। অন্যভাবে বলা যায় যদি কোনো কিছু সম হারে বাড়তে থাকে তাহলে শুরু এবং শেষ মানের গড় হচ্ছে গড় মান। অর্থাৎ

$$V = \frac{u+v}{2} = \frac{u+(u+at)}{2}$$

$$V = u + \frac{1}{2}at$$

কাজেই অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$s = Vt$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

এটি মনে রাখা ভালো– অসংখ্যবার এটা ব্যবহার করা হবে! গতি-সংক্রান্ত সমীকরণ সবগুলোই বের হয়ে গেছে। এবারে ছোট একটু খানি এলজেবরা করে রাখি যেটা আপাততঃ হিসাব-নিকাশ করার কাজে লাগবে, পরে ভেতরকার মজার পদার্থবিজ্ঞান বের করে দেখানো যাবে।

$$v = (u + at)$$

$$v^2 = u^2 + 2uat + a^2t^2 = u^2 + 2a\left(ut + \frac{1}{2}at^2\right)$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

উদাহরণ 2.16: সমত্বরণে চলমান কোনো একটি বস্তুর বেগের মান প্রতি 2 সেকেন্ড পর পর মেপে নিচে টেবিলের মাঝে দেখানো হয়েছে। গড় বেগ কত?

সময় (s)	0	2	4	6	8
বেগ (m/s)	2	4	6	8	10

উত্তর: গড় নেয়া খুব সোজা, সবগুলো রাশি সব যোগ করে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হয়। এখানে পাঁচটি বেগ আছে কাজেই গড় বেগ:

$$V = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6\,m/s$$

যদি আমাদের কাছে প্রতি সেকেন্ডে মাপা বেগ থাকত তাহলে গড় বেগ কত হবে?

সময় (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
বেগ(m/s)	2	3	4	5	6	7	8	9	10

এখানে 9 টি ভিন্ন সময়ের বেগ দেয়া আছে; কাজেই গড় বেগ V

$$V = \frac{2+3+4+5+6+7+8+9+10}{9} = 6\ m/s$$

আমরা একই উত্তর পেয়েছি!
যদি শুধু প্রথমে আর শেষে মাপা বেগ থাকত তাহলে গড় বেগ কত?

সময় (s)	0	8
বেগ (m/s)	2	10

তাহলে গড় বেগ হতো :

$$V = \frac{2+10}{2} = 6\ m/s$$

আবার একই উত্তর পেয়েছি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যদি সমত্বরণ থাকে তাহলে গড় বেগ বের করা সোজা– শুধু প্রথম ও শেষ বেগ যোগ করে তার গড় নিলেই হয়।
তোমরা একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে এই সমস্যাটাতে বেগটা ছিল এ রকম

$$v = 2 + 2t$$
অর্থাৎ $u = 2, a = 2.$

এবারে অন্য এক ধরনের বেগ দেখা যাক।

উদাহরণ 2.17: যদি সমত্বরণ না হয় তাহলে বেগের গড় নিলে কী হবে?

উত্তর : ধরা যাক $a = 2t$ অর্থাৎ সময়ের সাথে ত্বরণটির পরিবর্তন হচ্ছে। $u = 2$ হলে
$$v = 2 + 2t^2$$
এবারে আগের মতো 2 s পর পর বেগ মাপা হোক হলে আমরা পাব :

সময় (s)	0	2	4	6	8
বেগ (m/s)	2	10	34	74	130

গড় বের করার নিয়ম দিয়ে যদি গড় বেগ বের করি তাহলে আমরা পাব :

$$V = \frac{2+10+34+74+130}{5} = \frac{250}{5} = 50\ m/s$$

এবারে একই চলমান বস্তুটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে মাপা হলে আমরা পাব :

সময় (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
বেগ (m/s)	2	4	10	20	34	52	74	100	130

এবারে যদি গড় নিই তাহলে গড় বেগ

$$V = \frac{2+4+10+20+34+52+74+100+130}{9} = \frac{426}{9} = 47.33m/s$$

দেখাই যাচ্ছে এটা আগের থেকে ভিন্ন মান দিয়েছে!
যদি সমত্বরণের মতো প্রথম আর শেষ বেগ যোগ করে গড় নিতাম তাহলে কী হতো? আমরা পেতাম :

সময়(s)	0	8
বেগ (m/s)	2	130

$$V = \frac{2+130}{2} = 66\, m/s$$

প্রত্যেকবার আমরা আলাদা উত্তর পেয়েছি।
কোনটা সত্যি? উত্তর হচ্ছে কোনোটাই না! শুধু মাত্র বলতে পারি যত বেশি বার বেগ মেপে গড় করব উত্তরটা তত বেশি সঠিক উত্তরের কাছাকছি যাবে।

2 বার মেপে পেয়েছি : $66\ m/s$
5 বার মেপে পেয়েছি : $50\ m/s$
9 বার মেপে পেয়েছি : $47.33\ m/s$

যদি সঠিকভাবে গড় নিতাম (সেটি কীভাবে করতে হয় তোমরা জানতে পারবে যখন ক্যালকুলাস শিখবে তখন) তাহলে পেতাম : $44.667\ m/s$

কাজেই জেনে রাখো আমরা গতির যে সমীকরণগুলো বের করেছি সেগুলো শুধু সমত্বরণের জন্য সত্যি! এতে তোমাদের হতাশ হবার কোনো কারণ নেই– সমত্বরণ দিয়েই চমৎকার পদার্থবিজ্ঞান করা সম্ভব।

উদাহরণ 2.18: একটি বুলেট $1.5\ km/s$ বেগে ছুটে একটি দেওয়ালের মাঝে $10\ cm$ ঢুকতে পেরেছে। বুলেটের মন্দন কত?

উত্তর: এটা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে $v^2 = u^2 - 2as$ সূত্রটি ব্যবহার করা:
শেষ বেগ $v = 0$

$$0 = (1.5 \times 1000)^2 - 2a\left(\frac{10}{100}\right)$$

$$a = \frac{(1.5 \times 1000)^2}{0.2} = 1.69 m/s^2$$

মন্দন : $a = 1.69\ m/s^2$ (কিংবা ত্বরণ $-1.69\ m/s^2$)

উদাহরণ 2.19: একটা $2m$ লম্বা সমতল কাঠের টুকরা দেয়ালের সাথে $30°$ কোণে হেলান দিয়ে রাখা আছে (ছবি 2.22)। কাঠের টুকরার ওপর থেকে একটা খেলনা গাড়ি ছেড়ে দিলে কত বেগে নিচে নেমে আসবে।

উত্তর: খেলনা গাড়ির ত্বরণ $a = g \sin 30° = 9.8 \times 0.5 = 4.9\, m/s^2$

আমরা জানি : $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

এখানে $s = 2m, u = 0$ এবং
$a = 4.9\, m/s^2$

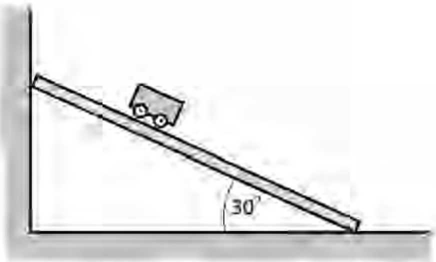

ছবি 2.22: $30°$ কোণে রাখা একটা কাঠের টুকরো বেয়ে একটা খেলনা গাড়ী নেমে আসছে

$$s = \frac{1}{2}at^2$$

$$t^2 = \frac{2s}{a} = \frac{4m}{4.9\, m/s^2}$$

$$t = \sqrt{\frac{4}{4.9}} = 0.904\, s$$

কাজেই $v = u + at = 0 + 4.9\, x\, 0.904s = 4.43\, m/s$

আমরা অন্যভাবেও এটা করতে পারি। আমরা জানি

$$v^2 = u^2 + 2as = 0 + 2 \times 4.9 \times 2 = 19.6\, m^2/s^2$$
$$v = 4.43\, m/s$$

আমরা একই উত্তর পেয়েছি এবং খেলনা গাড়িটি কতক্ষণে নিচে নেমে এসেছে সেটা না জেনেই বেগ বের করে ফেলেছি।

খেলনা গাড়িটি কতক্ষনে নিচে নিমে এসেছে সেটা ইচ্ছে করলে আমরা এখান থেকে অন্য ভাবেও বের করতে পারি।

অতিক্রান্ত দূরত্ব s = গড় বেগ × সময় = Vt

গড় বেগ V = (আদি বেগ+শেষ বেগ)/2

$$V = \frac{u + v}{2} = \frac{0 + 4.43}{2} = 2.215 m/s$$
সময়
$$t = \frac{s}{V} = \frac{2}{2.215} = 0.903s$$

উদাহরণ 2.20: (ছবি 2.23) ছবিতে দেখানো দুটি সমতল কাঠের টুকরো 30° এবং 45° কোণে রাখা আছে। 30° কোণে রাখা কাঠের উপরে 1 ফুট উচ্চতা থেকে একটি মার্বেল গড়িয়ে দেয়া হলো। ঠিক যখন নিচে পৌঁছাবে তখন গতিবেগ কত? 45° কোণে রাখা কাঠের টুকরোতে সেটি কত উচ্চতায় পৌঁছাবে?

উত্তর: যখন আমরা শক্তি, শক্তির নিত্যতার সূত্রগুলো শিখব তখন এই সমস্যাটি খুব সহজে সমাধান করা যাবে, আপাতত আমরা আমাদের শেখা ত্বরণ বেগ আদিবেগ, চূড়ান্ত বেগ অতিক্রান্ত দূরত্ব, অতিক্রান্ত সময় এসব ব্যবহার করে সমস্যাটি সমাধান করি।

সমস্যাটি এভাবে সমাধান করা হবে : মার্বেলটি স্থির অবস্থা থেকে ছাড়া হবে। 30° তে রাখা কাঠের টুকরো বেয়ে নিচে নামার সময় তার বেগ বাড়তে থাকবে– কারণ এখানে একটা ত্বরণ রয়েছে।

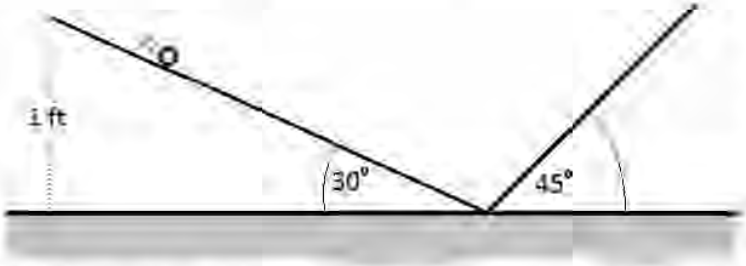

ছবি 2.23: 30°এবং 45°তে রাখা দুটো সমতল কাঠের টুকরোর একটা মার্বেল গড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

একেবারে নিচে পৌঁছানোর পর তার একটা বেগ সৃষ্টি হবে সেই বেগে মার্বেলটি 45° তে রাখা কাঠের টুকরো বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করবে। এখানেও একটা ত্বরণ আছে কিন্তু এবারে এটা যেহেতু গতির উল্টো দিকে কাজ করছে তাই এটা গতি কমাতে থাকবে এবং মার্বেলের গতি কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় থেমে যাবে।

30° কাঠের টুকরোর শেষ বেগ বের করার জন্য আমাদের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে হবে। 1ft উচ্চতা এবং 30° কোণ থেকে এটা বের করা যায়। দূরত্বটি s_1 হলে ত্রিকোনোমিতি বা জ্যামিতি থেকে

$$s_1 \sin 30^\circ = 1\,ft$$

$$s_1 = \frac{1\,ft}{\sin 30^\circ} = \frac{1\,ft}{0.5} = 2\,ft$$

কিন্তু আমরা ft দিয়ে সমস্যা সমাধান করতে চাই না – SI পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাই,

$$2ft = 2 \times 12 \times 2.54 = 0.61m$$

30° কাঠের টুকরোয় ত্বরণ হচ্ছে

$$a_1 = g \sin 30^\circ = 4.9\, m/s^2$$

মার্বেল যখন নিচে পৌঁছাবে তখনকার গতিবেগ v_1 হলে আমরা লিখতে পারি।

$$v_1^2 = u_1^2 + 2a_1s_1$$

আদি বেগ $u_1 = 0$, কাজেই

$$v_1 = \sqrt{2a_1s_1} = \sqrt{2 \times 4.9 \times 0.61} = 2.44m/s$$

এবারে 45° তে রাখা কাঠের টুকরোর সমস্যাটি সমাধান করতে পারি। এটার জন্য মন্দন

$$a_2 = g\, sin45° = 6.93m/s^2$$

আমরা যেহেতু মন্দন বলেছি তাই নেগেটিভ চিহ্ন নেই। কাজেই এটার জন্য আদিবেগ u_2, শেষ বেগ v_2 অতিক্রান্ত দূরত s_2 হলে

$$v_2^2 = u_2^2 - 2a_2s_2$$

যেহেতু মন্দনটি বেগের বিপরীত দিকে কাজ করছে তাই এবারে একটি নেগেটিভ চিহ্ন। আমরা জানি $v_2 = 0$ এবং $v_1 = u_2$

$$s_2 = \frac{u_2^2}{2a_2} = 0.429m$$

আবার একটু খানি ত্রিকোনমিতি দিয়ে উচ্চতাটুকু বের করতে পারি :

$$h_2 = s_2 sin\, 45° = 0.303m$$

যদি এটাকে ft এ লিখি?

$$0.303m = \frac{0.303 \times 100}{2.54 \times 12} = 1ft$$

তোমরা কি অবাক হয়েছ যে এটা 45° কাঠের টুকরোতে ঠিক 1ft উপরেই উঠেছে?

অবাক হবার কিছু নেই– এটাই হওয়ার কথা! কাঠের টুকরোগুলি 30° কিংবা 45° না হয়ে যে কোনো কোণ হোক না কেন এবং যে কোনো উচ্চতা থেকেই তুমি মার্বেলটা ছাড় না কেন– এটা ঠিক সেই একই উচ্চতাতে উঠবে! বিশ্বাস না হলে অন্য কোনো কোণ এবং অন্য কোনো উচ্চতা দিয়ে হিসাবে করে দেখ। এর একটা কারণও আছে সেটাও তোমরা জানবে।

(এখানে একটা জিনিস বলে রাখি মার্বেলটা যখন 30° তে রাখা কাঠের টুকরো বেয়ে নেমে এসেছে তখন বেগের দিকটি যেদিকে ছিল, 45° তে রাখা কাঠের টুকরো বেয়ে ওঠার সময় দিকটি কিন্তু অন্য দিকে হয়েছে অর্থাৎ বেগের পরিবর্তন হয়েছে– সেই মুহূর্তটির জন্য ভিন্ন একটা ত্বরণ কাজ করছে, কাঠ দুটোর অবস্থান সেই ত্বরণটা তৈরি করে দিয়েছে– এই সমস্যার জন্য আমাদের সেটা নিয়ে মাথা না

ঘামালেও ক্ষতি নেই। মার্বেলটি যদি ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে আসে তখন ঘোরার জন্যে সেটি একটু শক্তি নিয়ে নেয়। আমরা সেটাও বিবেচনা করছি না।)

2.8 পড়ন্ত বস্তুর সূত্র (Laws of Falling Bodies)

আমরা সমত্বরণের উদাহরণ হিসাবে g বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের কথা বলেছিলাম। গতি সম্পর্কে আমরা যে সমীকরণগুলো বের করেছি সেগুলোকে খুব সহজেই আমরা পড়ন্ত বস্তুর গতি বের করার জন্য বের করতে পারি! অতিক্রান্ত দূরত্বের বেলায় s ব্যবহার করা হয়েছিল, এবারে উচ্চতা বোঝানোর জন্য h ব্যবহার করব ত্বরণের জন্য a না লিখে g লিখব– শুধুমাত্র এ দুটোই হবে পার্থক্য!

$$v = u + gt$$
$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2$$
$$v^2 = u^2 + 2gh$$

গ্যালিলিওর পড়ন্ত বস্তুর যে তিনটি সূত্র আছে সেগুলো আসলে এই সূত্রগুলো ছাড়া আর কিছু নয়!

উদাহরণ 2.21: ক্রিকেটের একজন ভালো পেস বোলার ঘণ্টায় $150\ km/hour$ বেগে বল ছুড়তে পারে। সে যদি খাড়া উপরের দিকে বলটা ছুড়ে বলটা কত উপরে উঠবে?

উত্তর:

$$150\ km/hour = \frac{150 \times 1000\ m}{60 \times 60\ s} = 41.67\ m/s$$

বল উপরে ছুড়লে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ এই বলটার ওপর মন্দন হিসাবে কাজ করবে। শেষ পর্যন্ত বলটি থেমে যাবে। সেই উচ্চতাটাকে h হিসাবে লিখলে

$$v^2 = u^2 - 2gh$$
$$v = 0, \quad u = 41.67\ m/s, \quad g = 9.8m$$

কাজেই

$$h = \frac{u^2}{2g} = \frac{(41.67)^2}{2 \times 9.8} m = 88.59m$$

(প্রায় 30 তলা দালানের ছাদ পর্যন্ত!)

উদাহরণ 2.22: পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশযান যখন ঘুরতে থাকে তাদের দ্রুতি অনেক বেশি, প্রায় 10 km/s! এ রকম গতিতে যদি আকাশের দিকে একটা কামানের গোলা ছুড়ে দিই সেটা কত উপরে উঠবে?

উত্তর: ক্রিকেট বলের মতো বের করার চেষ্টা করি, শুধু আদিবেগ $41.67\ m/s$ এর বদলে হবে $10{,}000\ m/s$

কাজেই

$$h = \frac{(10{,}000)^2}{2 \times 9.8} m = 5{,}102{,}000\ m = 5{,}102\ km$$

যদিও দেখে মনে হচ্ছে কোথাও কোনো ভুল হয়নি কিন্তু আসলে উত্তরটা সঠিক নয়! তার কারণ হচ্ছে আমরা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের মান ধরেছি $9.8 m/s^2$, পৃথিবীর কাছাকাছি দূরত্বের জন্য এটা সঠিক – কিন্তু যদি পৃথিবী থেকে অনেক উপরে উঠে যাওয়া যায় এর মান কমতে থাকবে! আমরা যখন

$$v^2 = u^2 - 2gh$$

সমীকরণটি বের করেছি সেখানে ধরে নিয়েছি g এর মানের পরিবর্তন হচ্ছে না। এই সমস্যার বেলায় সেটা সত্যি না। তাই আমরা এখন পর্যন্ত যেটুকু শিখেছি সেই বিদ্যে দিয়ে এটা সমাধান করতে পারব না! কাজেই আমরা চালাকি করে অন্যভাবে প্রশ্নের উত্তর দিই :

এত তীব্র গতিতে কোনো কিছু ছুড়ে দিলে বাতাসের সাথে ঘর্ষণে যে তাপ সৃষ্টি হবে সেই তাপে এটা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে!

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

1. গতি শূন্য কিন্তু ত্বরণ শূন্য নয় এটি কি সম্ভব? সম্ভব হলে দেখাও।
2. বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু দ্রুতির পরিবর্তন হচ্ছে না। এটা কি সম্ভব? সম্ভব হলে দেখাও।
3. চাঁদে মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ থেকে 6 গুণ কম। পৃথিবীতে একটা পাথর একটা উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে এটি যে বেগে নিচে আঘাত করবে, চাঁদে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে কি ছয় গুণ কম বেগে আঘাত করবে? (ধরা যাক পৃথিবী কিংবা চাদ কোথাও বাতাসের বাধা সমস্যা নয়।)
4. পৃথিবীতে কি এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে থেকে তুমি দক্ষিণ দিকে $1\,km$ গিয়ে যদি পূর্ব দিকে $1\,km$ যাও এবং তখন উত্তর দিকে $1\,km$ গেলে আগের জায়াগায় পৌঁছে যাবে?
5. সমত্বরণের বেলায় দ্বিগুণ সময়ে কি দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করি?

গাণিতিক সমস্যা:

1. একটি গাড়ি তোমার স্কুল থেকে $40\,km$ পূর্ব দিকে গিয়েছে, তারপর $40\,km$ উত্তর দিকে গিয়েছে তারপর $30\,km$ পশ্চিম দিকে গিয়েছে, তারপর $30\,km$ দক্ষিণ দিকে গিয়েছে, তারপর $20\,km$ পূর্ব দিকে গিয়েছে, তারপর $20\,km$ উত্তর দিকে গিয়েছে, তারপর $10\,km$ পশ্চিম দিকে গিয়েছে, তাপরপর $10\,km$ দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। গাড়িটি তোমার থেকে কোন দিকে কত দূরে আছে?
2. ছবি 2.24 এ OA, AB, BC এবং CD তে কখন বেগ এবং ত্বরণ পজিটিভ নেগেটিভ এবং শূন্য সেটি দেখাও।
3. ছবি 2.24 এ y অক্ষ যদি বেগ না হয়ে অবস্থান হতো তাহলে বেগ এবং ত্বরণের মান DA, AB, BC এবং CD তে কী হতো বল।
4. একটি গাড়ির বেগ $30\,km/hour$. $1\,minute$ পর গাড়িটির গতিবেগ সমত্বরণে বেড়ে হলো $50\,km/hour$ এই সময়ে গাড়িটি কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে?

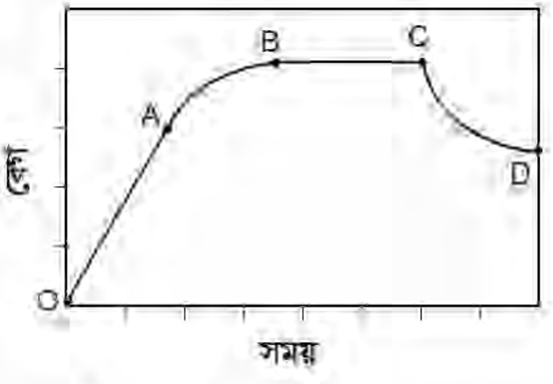

ছবি 2.24: বেগ ও সময়ের লেখচিত্র

5. তুমি $10m/s$ বেগে একটা বল আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়েছ। সেটা কতক্ষণে কত উঁচুতে উঠবে?

তৃতীয় অধ্যায়

বল

(Force)

Galileo Galilei (1564-1642)

গ্যালিলিও গ্যালিলি

গ্যালিলিও ছিলেন একজন ইতালিও পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিক। তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি প্রথম টেলিস্কোপ ব্যবহার করে ব্যবহারিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা করেছিলেন। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌর জগতের ব্যাখ্যাটি তিনি প্রথম সত্যিকার অর্থে বৈজ্ঞানিক জগতে পরিচিত করেন। এ কারণে তিনি ক্যাথলিক চার্চের রোষানলে পড়েন, তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাঁকে বাকি জীবন গৃহবন্দি হয়ে কাটাতে হয়। তাঁর মৃত্যুর 366 বছর পর 2008 সালে রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে ক্ষমা করে!

3.1 জড়তা, বল ও ভর (Inertia, Force and Mass)

এর আগের অধ্যায়ে আমরা বেগ, দ্রুতি, ত্বরণ (এবং মন্দন), অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং তাদের ভেতরকার সম্পর্কগুলো শিখেছি, সমীকরণগুলো বের করেছি এবং ব্যবহার করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমবার সত্যিকারের কিছু পদার্থবিজ্ঞান শিখব। শুরু করা যাক নিউটনের প্রথম সূত্র দিয়ে:

> **নিউটনের প্রথম সূত্র :** বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং সমবেগে চলতে থাকা বস্তু সমবেগে চলতে থাকবে। (বুঝতেই পারছ বেগ যেহেতু ভেক্টর তাই সমবেগে চলতে হলে দিক পরিবর্তন করতে পারবে না– সোজা সরল রেখায় সমান দ্রুতিতে যেতে হবে।)

নিউটনের প্রথম সূত্রের প্রথম অংশ নিয়ে কারো সমস্যা হয় না কারণ আমরা সব সময়েই দেখি স্থির বস্তুকে ধাক্কাধাক্কি না করা পর্যন্ত সেটা নড়ে না স্থির থেকে যায়। দ্বিতীয় অংশটা নিয়ে সমস্যা, কারণ আমরা কখনোই কোনো চলন্ত বস্তুকে অনন্তকাল চলতে দেখি না, ধাক্কা দিয়ে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলেও দেখা যায় কোনো বল প্রয়োগ না করলেও শেষ পর্যন্ত বস্তুটা থেমে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের

অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে কোনো কিছুকে সমবেগে চালিয়ে নিতে হলে ক্রমাগত বুঝি সেটাতে বল প্রয়োগ করে যেতে হয়। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি সেটা সত্যি নয়– সমবেগে চলতে থাকা কোনো বস্তু যদি থেমে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে কোনো না কোনোভাবে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। ঘর্ষণ, বাতাসের বাধা এ রকম অনেক কিছু আসলে উল্টোদিক থেকে বল প্রয়োগ করে চলমান একটা বস্তুকে থামিয়ে দেয়– যদি সত্যি সত্যি সব বল বন্ধ করে দেয়া যেত তাহলে আমরা সত্যিই দেখতে পেতাম সমবেগে চলতে থাকা একটা বস্তু অনন্তকাল ধরে চলছে।

নিউটনের প্রথম সূত্রে প্রথমবার "বল" শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বল বলতে আমরা কী বোঝাই সেটা এখনো বলা হয়নি– এটা যদি পদার্থ বিজ্ঞানের বই না হয়ে অন্য কোনো বই হতো তাহলে "বল প্রয়োগ" -এর জায়গায় "শক্তি প্রয়োগ" কথাটা ব্যবহার করলেও বাক্যটায় অর্থের কোনো উনিশ-বিশ হতো না। কিন্তু যেহেতু এটা পদার্থবিজ্ঞানের বই তাই আমরা এখানে শক্তি কথাটা ব্যবহার করতে পারব না– পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা রাশি! এখানে আমাদের বল কথাটাই ব্যবহার করতে হবে! কিন্তু বল মানে কী? আমরা তো এখন পর্যন্ত বলের কোনো সংজ্ঞা দিইনি!

আসলে নিউটনের প্রথম সূত্রটাই বলের সংজ্ঞা হতে পারে! যে কারণে স্থির বস্তু চলতে শুরু করে আর সমবেগে চলতে থাকা বস্তুর বেগের পরিবর্তন হয় সেটাই হচ্ছে বল। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বলটা কী, সেটা বুঝতে পারি কিন্তু পরিমাপ করতে পারি না। দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বল পরিমাপ করা শিখব।

বল প্রয়োগ না করা পর্যন্ত স্থির বস্তু যে স্থির থাকতে চায় কিংবা গতিশীল বস্তু যে গতিশীল থাকতে চায় সেটাই হচ্ছে জড়তা। হঠাৎ গাড়ি চলতে শুরু করলে আমরা যেভাবে পেছনের দিকে একটা ঝাঁকুনি খাই সেটা হচ্ছে জড়তার উদাহরণ। শরীরের নিচের অংশ গাড়ির সাথে লেগে আছে– গাড়ির সাথে সাথে সেটা চলতে শুরু করেছে কিন্তু শরীরের উপরের অংশ এখনো স্থির এবং স্থির থাকতে চাইছে! তাই শরীরের উপরের অংশ পেছনের দিকে ঝাঁকুনি খাচ্ছে। যেহেতু এটা স্থির থাকায় জড়তা তাই এটাকে বলে স্থিতি জড়তা।

গতি জড়তার কারণে আমরা মানুষজনকে চলন্ত বাস ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে আছাড় খেতে দেখি। চলন্ত বাস ট্রেনের মানুষটির পুরো শরীরটাই গতিশীল, সে যখন মাটিতে পা দিয়েছে তখন নিচের অংশ থেমে গিয়েছে, উপরের অংশ গতি জড়তার কারণে তখনো ছুটছে– তাই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে!

জড়তার বিষয়টি যদি শুধুমাত্র একটা সংজ্ঞা হতো তাহলে এটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হতো না– আসলে এটা পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আমরা এখন পর্যন্ত ভর নিয়ে একটি কথাও বলিনি কিন্তু কোনো কিছুর গতি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাদের সেটির ভর সম্পর্কে জানতে হয়। একই গতিতে ছুটে আসা একটা হালকা সাইকেল আর একটা ভারী ট্রাককে আমরা একদৃষ্টিতে দেখি না, তার কারণটা হচ্ছে ভরের পার্থক্য। কিন্তু ভরটা আসলে কী? আমরা অনেক সময়েই বলি ভর হচ্ছে কতটা বস্তু আছে তার একটা পরিমাপ! এর চাইতে অনেক বিজ্ঞানসম্মত উত্তর হচ্ছে ভর হচ্ছে জড়তার পরিমাপ। (তোমরা বিষয়টা ভালো করে লক্ষ করো– খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলা হয়েছে!) কোনো কিছুর জড়তা যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে তার ভরও নিশ্চয়ই বেশি! জড়তা যদি কম হয় তাহলে ভরও কম। তোমরা নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছ সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হলে যার ভর বেশি সেটাকে বেশি বিচ্যুত করা যায় না। কিন্তু যার ভর কম সেটাকে বেশি বিচ্যুৎ করা যায়। কিংবা অন্যভাবে বলা যায় ভর কম হলে জড়তার প্রভাবটা তুলনামূলকভাবে কম হয়।

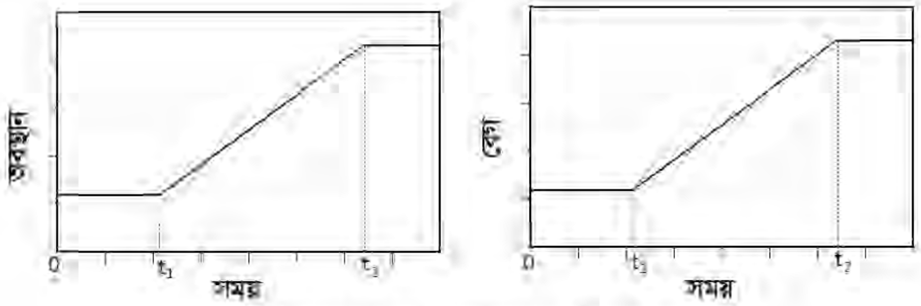

ছবি 3.1 অবস্থান সময় ও বেগ সময়ের দুটি লেখচিত্র।

উদাহরণ 3.1: ছবি 3.1 এর গ্রাফ দুটিতে সময়ের সাথে সরণ এবং বেগের মান দেখানো হয়েছে, কোথায় কতক্ষণ বল প্রয়োগ করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: দুটি গ্রাফই দেখতে একই রকম কিন্তু এদের মাঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য রয়েছে।

(i) প্রথম গ্রাফে 0 থেকে t_1 কিংবা t_2 থেকে শেষ পর্যন্ত সময় দুটিতে অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না, যার অর্থ কোন বেগ নেই, কাজেই বেগের পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না যার অর্থ এ দুটো সময়ে নিশ্চয়ই কোনো বল প্রয়োগ করা হচ্ছে না। t_1 থেকে t_2 সময়ে অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু যেহেতু সম হারে পরিবর্তন (রেখাটি যেহেতু সরল রেখা) হচ্ছে তার অর্থ সমবেগ– অর্থাৎ বেগের কোনো পরিবর্তন নেই কাজেই t_1 থেকে t_2 সময়েও কোনো বল প্রয়োগ করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র t_1 মুহূর্তে কোনোভাবে বল প্রয়োগ করে স্থির বস্তুটিকে সমবেগে গতিশীল করা হয়েছে। আবার ঠিক t_2 মুহূর্তে বল প্রয়োগ করে গতিশীল বস্তুটিকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে, অন্য কোথাও কোনো বল প্রয়োগ করা হয়নি।

অর্থাৎ $0 < t < t_1$, $t_1 < t < t_2$ এবং $t_2 < t$ তে কোনো বল নেই।
শুধুমাত্র $t = t_1$ এবং $t = t_2$ তে মুহূর্তের জন্য বল প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ii) দ্বিতীয় গ্রাফে 0 থেকে t_1 এবং t_2 থেকে শেষ পর্যন্ত বস্তুটি সমবেগে যাচ্ছে, কাজেই কোনো বল প্রয়োগ করা হয়নি। t_1 থেকে t_2 সময়ে বেগটি সমহারে পরিবর্তিত হচ্ছে কাজেই এখানে নিশ্চয়ই বল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

অর্থাৎ $0 < t < t_1$ এবং $t_2 < t$ কোনো বল নেই।
$t_1 < t < t_2$ তে বল প্রয়োগ করা হয়েছে।

3.2 বলের প্রকার ভেদ (Different kinds of Forces)

পৃথিবীতে কত ধরনের বল আছে জিজ্ঞেস করা হলে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে অনেক ধরনের! কোনো কিছুকে যদি ধাক্কা দিই সেটা একটা বল, ট্রাক যখন বোঝা টেনে নিয়ে যায় সেটা একটা বল, ঝড়ে যখন গাছ উপড়ে পড়ে সেটা একটা বল, চুম্বক যখন লোহাকে আকর্ষণ করে সেটা একটা বল, বোমা বিস্ফোরণে যখন ঘর বাড়ি উড়িয়ে দেয় সেটা একটা বল, ক্রেন যখন কোনো কিছুকে টেনে তুলে সেটা একটা বল– একটুখানি সময় দিলেই এ রকম নানা ধরনের বলের তোমরা একটা বিশাল তালিকা তৈরি করতে পারবে।

কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপারটি কী জান? প্রকৃতিতে মাত্র চার রকমের বল রয়েছে, উপরে যে তালিকা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে এগুলো ঘুরে-ফিরে এই চার রকমের বাইরে কোনোটা নয়! আসলে মৌলিক বল মাত্র চারটি! সেগুলো হচ্ছে :

3.2.1 মহাকর্ষ বল (Gravitation)

এই সৃষ্টিজগতের সকল বস্তু তাদের ভরের কারণে একে অপরকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে সেটাই হচ্ছে মহাকর্ষ বল। এই মহাকর্ষ বলের কারণে গ্যালাক্সির ভেতরে নক্ষত্ররা ঘুরপাক খায় কিংবা সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘুরে, পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ ঘুরে! পৃথিবীর মহাকর্ষ বল যখন আমাদের ওপর কাজ করে আমরা সেটাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ। এই মাধ্যাকর্ষণ বল আমাদেরকে নিচের দিকে টেনে রেখেছে এবং এর কারণেই আমরা নিজেদের ওজনের অনুভূতি পাই।

3.2.2 তড়িৎ চৌম্বক বল বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল (Electro Magnetic Force)

চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ে সেটা দিয়ে কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করা বা চুম্বক দিয়ে অন্য চুম্বককে আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের অনেকেই কখনো না কখনো করেছি। যদিও তড়িৎ বা বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের বলকে আলাদা ধরনের বল মনে হয় আসলে দুটি একই বল– শুধুমাত্র দুইভাবে দেখা যায়। শুধু মাত্র এই বলটা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুটোই করতে পারে অন্যগুলো শুধু আকর্ষণ করতে পারে বিকর্ষণ করতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় এটা অনেক শক্তিশালী (10^{36} গুণ বা ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন গুণ শক্তিশালী!) কথাটা যে সত্যি সেটা নিশ্চয়ই তোমরা অনুমান করতে পারবে কারণ যখন একটা চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ে একটা কাগজকে আকর্ষণ করে তুলে নাও তখন কিন্তু সেই কাগজটাকে পুরো পৃথিবী তার সমস্ত ভর দিয়ে তৈরি মাধ্যাকর্ষণ বল দিয়ে টেনে রাখার চেষ্টা করে তবুও তোমার চিরুনির অল্প একটু বিদ্যুৎ সেই বিশাল পৃথিবীর পুরো মাধ্যাকর্ষণকে হারিয়ে দেয়।

3.2.3 দুর্বল নিউক্লীয় বল (Weak Force)

এটাকে দুর্বল বলা হয় কারণ এটা তড়িৎ চৌম্বক বল থেকে দুর্বল (প্রায় ট্রিলিওন গুণ) কিন্তু মোটেও মহাকর্ষ বলের মতো এতো দুর্বল নয়। মহাকর্ষ এবং তড়িৎ চৌম্বক বল যে কোনো দূরত্ব থেকে কাজ করতে পারে কিন্তু এই বলটা খুবই অল্প দূরত্বে ($10^{-18}\ m$) কাজ করে! তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে যে বেটা (β) রশ্মি বা ইলেকট্রন বের হয় সেটার কারণ এই দুর্বল নিউক্লীয় বল।

3.2.4 সবল নিউক্লীয় বল (Strong Nuclear Force)

এটি হচ্ছে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী বল, তড়িৎ চৌম্বক বল থেকেও একশগুণ বেশি শক্তিশালী কিন্তু এটাও খুবই অল্প দূরত্বে $(10^{-15}\,m)$ কাজ করে। পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে তার ভেতরকার প্রোটন এবং নিউট্রনের নিজেদের মাঝে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী বল কাজ করে নিজেদের আটকে রাখে। প্রচণ্ড বলে আটকে থাকার কারণে এর মাঝে অনেক শক্তি জমা থাকে তাই বড় নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে কিংবা ছোট নিউক্লিয়াসকে জোড়া দিয়ে অনেক শক্তি তৈরি করা সম্ভব। নিউক্লিয়ার বোমা সে জন্য এত শক্তিশালী। সূর্য থেকে আলো তাপও এই বল থেকে তৈরি হয়।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন এই চার ধরনের বলের মূল এক জায়গায় এবং তারা সবগুলোকে এক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। তড়িৎ চৌম্বক (বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়) এবং দুর্বল নিউক্লিয়ার বলকে এর মাঝে একই সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এবং সেটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি আকাশছোঁয়া সাফল্য! (কাজেই তুমি ইচ্ছে করলে বলতে পার বল তিন ধরনের: মহাকর্ষ, ইলেকট্রো উইক (Electro-weak) এবং নিউক্লিয়ার কেউ এটাকে ভুল বলতে পারবে ন!) অন্যগুলোকেও এক সূত্রে গাঁথার জন্য বিজ্ঞানীরা কাজ করে যাচ্ছেন।

তোমরা যখন তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে বল ব্যবহার করো তখন তোমাদের মনে হতে পারে কোনো কোনো বল প্রয়োগ করতে হলে স্পর্শ করতে হয় (ক্রেন দিয়ে ভারী জিনিস তোলা, কোনো কিছুকে ধাক্কা দেওয়া, কিংবা চলতে চলতে ঘর্ষণের জন্য চলন্ত বস্তুর থেমে যাওযা) আবার তোমরা লক্ষ করেছ কোনো কোনো বল প্রয়োগের জন্য স্পর্শ করতে হয় না কোনো কিছু ছেড়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য নিচে পড়া, চুম্বকের আকর্ষণ!) কাজেই আমরা বলকে স্পর্শ এবং অস্পর্শ দুই ধরনের বলে ভাগ করতে পারি। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা যেখানে স্পর্শ করছি বলে ধারণা করছি, সেখানে কিন্তু পরস্পরের অণু-পরমাণু, তাদের ঘিরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন সরাসরি স্পর্শ দিয়ে নয় তাদের তড়িৎ চৌম্বক বল দিয়ে একে অন্যের সাথে কাজ করছে! অন্য কথায় বলা যায় আমরা যদি পারমাণবিক পর্যায়ে চলে যাই তাহলে সব বলই অস্পর্শক! এক পরমাণু অন্য পরমাণুকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে দূর থেকে, তাদেরকে আক্ষরিক অর্থে স্পর্শ করতে হয় না!

3.3 নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র (Newton's Second Law)

আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি সেটি গ্রহ-নক্ষত্র হোক আর গাড়ি ট্রেন-বিমান হোক কিংবা ক্যারমের গুটি হোক তার সব কিছুই নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র পদার্থবিজ্ঞানের জগতে যে অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তার কোনো তুলনা নেই। আলোর বেগের কাছাকাছি যাওয়ার সময় কিংবা অণু-পরমাণুর ক্ষুদ্র জগতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের বাইরে কিছু প্রয়োজন হয় না। এই অসাধারণ সূত্রটি খুবই সহজ, এটা এ রকম :

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র: বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলের সামানুপাতিক এবং যে দিকে বল প্রয়োগ করা হয় ভরবেগের পরিবর্তনটাও ঘটে সেদিকে।

সূত্রটাতে বেগের পরিবর্তনের হার না বলে ভরবেগের পরিবর্তনের হার কথাটা বলা হয়েছে। ভর বেগ সহজ ভাবে ভর এবং বেগের গুণফলকে বলা হয়। অর্থাৎ ভর যদি হয় m, বেগ যদি হয় v তাহলে ভরবেগ p হচ্ছে

$$p = mv$$

বোঝাই যাচ্ছে যেহেতু v হচ্ছে ভেক্টর তাই p ও একটি ভেক্টর। তোমরা ধারণা করতে পার যে সাধারণভাবে যখন কোনো কিছু গতিশীল হয় তখন তার ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই ভরবেগের পরিবর্তনটুকু আসবে বেগের পরিবর্তন থেকে। খুবই বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আমরা দেখব বেগের পরিবর্তন হয়নি কিন্তু ভরের পরিবর্তন হয়েছে বলে ভর বেগের পরিবর্তন হয়ে গেছে! ভরবেগ নামে একটা নূতন রাশি আবিষ্কার না করে ভর এবং বেগের গুণফল কথাটা বললে কী সমস্যা ছিল? বড় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তোমরা জেনে রাখো আলোকে যখন কণা হিসেবে দেখা হয় তখন তার কিন্তু ভর থাকে না কিন্তু ভরবেগ থাকে! কাজেই ভর এবং বেগের থেকে ভরবেগ বেশি মৌলিক একটি রাশি!

উদাহরণ 3.2: তুমি একটি টেনিস বল $10\, m/s$ বেগে একটা দেয়ালে ছুড়ে দেয়ার পর এটা একই দ্রুতিতে ঠিক তোমার দিকে ফিরে এসেছে। বলটার ভর $100gm$ হলে ভরবেগের পরিবর্তন কত?

উত্তর: বলটি ছুড়ে দেয়ার সময় ভরবেগ $p = mv$, দেয়ালে আঘাত করে ঠিক উল্টো দিকে ফিরে আসার সময় ভরবেগ হচ্ছে $p' = -mv$ কাজেই ভরবেগের পরিবর্তন:

$$p - (p') = mv - (-mv) = 2mv$$

এই পরিবর্তনের জন্য টেনিস বলটার উপর দেয়ালটা খুব অল্প সময়ের জন্য বল প্রয়োগ করেছে। ক্রিকেট খেলার সময় ব্যাটসম্যানেরা এভাবে ব্যাট দিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য ক্রিকেট বলকে আঘাত করে সেটার ভরবেগের পরিবর্তন করে ফেলে। আমরা যেগুলোকে বাউন্ডারি কিংবা ছক্কা বলি!

এবারে আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে ফিরে যাই। ধরা যাক কোনো একটা বস্তুর আদিবেগ ছিল u এবং t সময় পর সেই বেগ পরিবর্তিত হয়ে (বেড়ে কিংবা কমে) হয়েছে v, কাজেই ভর বেগের পরিবর্তন হচ্ছে :

$$mv - mu$$

কাজেই ভরবেগের পরিবর্তনের হার :

$$\frac{mv - mu}{t} = m\frac{(v - u)}{t} = ma$$

যেহেতু এখানে ধরে নিয়েছি ভরের কোনো পরিবর্তন হয়নি তাই এভাবে লিখতে পারি আর আমরা জানি ত্বরণ হচ্ছে

$$a = \frac{v - u}{t}$$

সুতরাং প্রয়োগ করা বল যদি F হয় তাহলে আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রকে লিখতে পারি:

$$F \propto ma$$

কিন্তু আমরা সূত্রটাকে সমানুপাতিকভাবে লিখতে চাই না, সমীকরণ হিসেবে লিখতে চাই!

তোমরা সবাই জান সমান এবং সমানুপাতিক কথা দুটির অর্থ কী। একটি রাশি যে হারে বাড়ে বা কমে অন্যটিও যদি সেই হারে বাড়ে বা কমে তাহলে আমরা বলি রাশি দুটি সমানুপাতিক। যে কোনো একটি রাশিকে সঠিক একটা সামানুপাতিক ধ্রুবক দিয়ে গুণ করে দুটি সমানুপাতিক রাশিকে সমান করে ফেলা যায়।

অর্থাৎ যদি x, y এর সমানুপাতিক হয়, অর্থাৎ $x \propto y$ হয় তাহলে একটা সমানুপাতিক ধ্রুব k খুঁজে বের করা সম্ভব যখন আমরা লিখতে পারব

$$x = ky$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটির বেলায় এবারে একটা চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটানো সম্ভব। যেহেতু বল বিষয়টাই এর আগে কোথাও ব্যাখ্যা করা হয়নি, (নিউটনের প্রথম সূত্র দিয়ে শুধু সেটার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে) দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে সেটাকে প্রথমবার পরিমাপ করা হবে তাই আমরা বলতে পারি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করার সময় সমানুপাতিক ধ্রুবককে 1 ধরা হলে যেটা পাব সেটাই হচ্ছে বলের পরিমাপ! কী সহজে সমানুপাতিক সম্পর্ককে সমীকরণ বানিয়ে ফেলা যায়।

সুতরাং *আমরা নিউটনের* দ্বিতীয় সূত্রটাকে একটা সমীকরণ হিসেবে লিখতে পারি। বল যদি F হয় এবং সমানুপাতিক ধ্রুবককে যদি 1 ধরে নেই তা হলে

$$F = ma$$

বলের মাত্রা: MLT^{-2}

এই ছোট এবং সহজ সমীকরণটি যে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে কী বিপ্লব করে দিতে পারে সেটি বিশ্বাস করা কঠিন।

উদাহরণ **3.3:** 3.2 ছবিতে দেখানো উপায়ে একটি m ভরের দুই পাশে দুটি কপিকল ব্যবহার করে $10\ kg$ এবং $5\ kg$ ভরের দুটি ওজন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। m ভরটির উপর কত বল কাজ করছে?

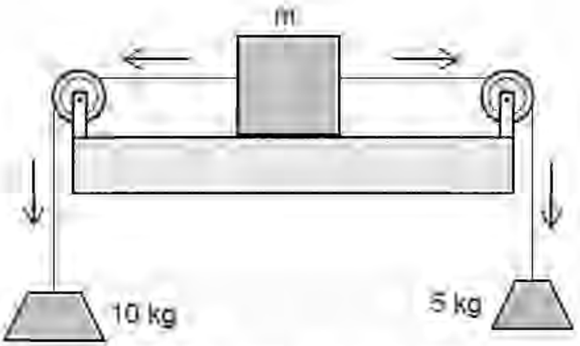

ছবি 3.2: কপিকল দিয়ে একটি ভরকে দুপাশ থেকে দুটি ওজনের মাধ্যমে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে

উত্তর: $10\ kg$ এবং $5\ kg$ ভর কোনো বল নয়, এগুলো ভর কাজেই এগুলোকে প্রথমে g দিয়ে গুণ দিয়ে বলে পরিণত করে নিতে হবে।

$$10\ kg \times 9.8 m/s^2 = 98\ N$$
$$5\ kg \times 9.8 m/s^2 = 49\ N$$

কাজেই m ভরটির উপর বাম দিকে $98\ N$ দিয়ে এবং ডান দিকে $49\ N$ দিয়ে টানা হচ্ছে।

দুটি যোগ হয়ে বলা যায় বাম দিকে $49\ N$ কাজ করছে। m ভরটির উপর আরেকটি বল mg সোজা নিচের দিকে কাজ করছে, কিন্তু সেটি টেবিলের প্রতিক্রিয়া বল দিয়ে কাটাকাটি হয়ে আছে।

উদাহরণ 3.4: $1 kg$ ভরের একটা বস্তুকে ছবি 3.3 এ দেখানো উপায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। F_1 এবং F_2 বলের মান কত?

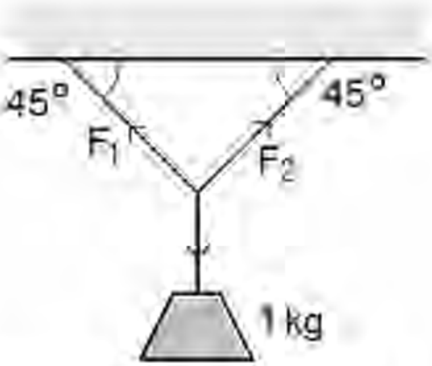

ছবি 3.3: দুটো সুতো দিয়ে ঝোলানো একটি ভর

উত্তর: যেহেতু এখানে সব কিছু স্থির অবস্থায় আছে তাই বোঝা যাচ্ছে O বিন্দুতে মোট বলের পরিমাণ শূন্য। $1kg$ ভরকে প্রথমে g দিয়ে গুণ দিয়ে বলে পরিণত করে নিতে হবে:

$$1\ kg \times 9.8 m/s^2 = 9.8\ N$$

নিচের দিকের এই $9.8\ N$ বলটি উপর দিকের দুটি বল F_1 এবং F_2 দিয়ে সাম্য অবস্থায় রাখা করা আছে। অর্থাৎ উপরে নিচে কোনো বল নেই, ডানে বামেও কোনো বল নেই। ডানে বামে বলের জন্য লিখতে পারি:

$$F_1 \sin 45° = F_2 \sin 45° \text{ কাজেই } F_1 = F_2$$

উপরে নিচে বলের জন্য লিখতে পারি $9.8\ N = F_1 \cos 45° + F_2 \cos 45°$

প্রথম সমীকরণ থেকে $9.8\ N = 2F_1 \cos 45° = 2F_1/\sqrt{2}$

$$F_1 = \frac{9.8}{\sqrt{2}} = 6.93N$$

$F1 = F2$ কাজেই $F2 = 6.93N$

উদাহরণ 3.5: $5kg$ ভরের একটি স্থির বস্তুর ওপর $100N$ বল $10s$ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হলো। (a) বল প্রয়োগ করার কারণে ত্বরণ কত? (b) $10s$ পরে বেগ কত? (c) $20s$ পরে বেগ কত? (d) $20s$ সময়ে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে? (e) বেগ এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব গ্রাফ এঁকে দেখাও।

উত্তর: (a) ত্বরণ

$$a = \frac{F}{m} = \frac{100\ N}{5\ kg} = 20\ m/s^2$$

(b) $10s$ পরে বেগ

$$v = u + at = 0 + 20 \times 10 m/s = 200\ m/s$$

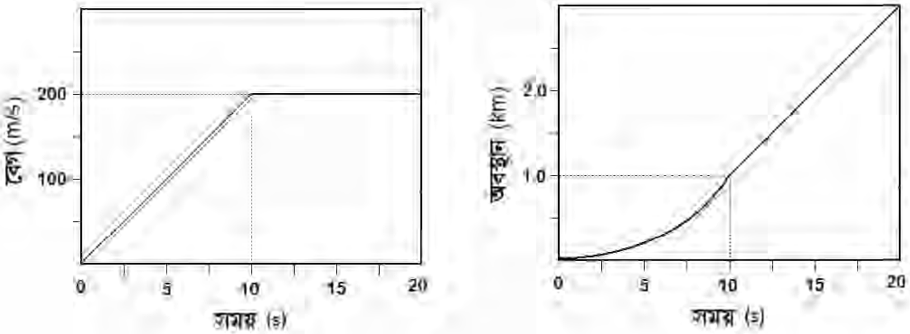

ছবি 3.4: বেগ সময় এবং অবস্থান সময়ের দুটি গ্রাফ বা লেখচিত্র

(c) $10s$ পর্যন্ত বল প্রয়োগ করা হয়েছে এরপর যেহেতু আর বল প্রয়োগ করা হয়নি কাজেই $200\ m/s$ বেগ পৌঁছানো পর বেগ অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ $20s$ পরে বেগ $200\ m/s$

(d) $20s$ এ অতিক্রান্ত দূরত্ব দুইবারে বের করতে হবে। প্রথম $10s$ এ অতিক্রান্ত দূরত্ব:

$$s_1 = ut + \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^2 m = 1000m$$

দ্বিতীয় $10\ s$ এ অতিক্রান্ত দূরত্ব (ছবি 3.4)

$$s_2 = vt = 200 \times 10\ m = 2000m$$

মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = s_1 + s_2 = 1000\ m + 2000\ m = 3000\ m$

(e) 3.4 ছবিতে দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ 3.6: স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে $10s$ একটা বস্তু $100m$ দূরত্ব অতিক্রম করাতে $20N$ বল দিতে হয়েছে। বস্তুটির ভর কত?

উত্তর: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$u = 0$

$$a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \times 100}{10^2} m/s^2 \quad = 2m/s^2$$

$F = ma$

$$m = \frac{F}{a} = \frac{20}{2}\ kg = 10\ kg$$

উদাহরণ 3.7: তোমরা সবাই আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সূত্রটির কথা জান $E = mc^2$ এখানে E হচ্ছে শক্তি (আমরা পরের অধ্যায়ে পড়ব) m হচ্ছে ভর এবং c হচ্ছে আলোর বেগ। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক সূত্র থেকে আমরা জানি

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

যেখানে m হচ্ছে গতিশীল অবস্থার ভর আর m_0 হচ্ছে স্থির অবস্থার ভর, অর্থাৎ আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী স্থির অবস্থার ভর থেকে গতিশীল অবস্থার ভর বেশি! দেখাও যে আলোকে কণা হিসেবে বিবেচনা করলে এর ভর শূন্য হলেও এর ভর বেগ শূন্য নয়!

উত্তর: ভরবেগ হচ্ছে $p = mv$

কাজেই

$$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

দুই পাশেই বর্গ করি:

$$p^2 = \frac{{m_0}^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

c^2দিয়ে গুণ করি:

$$p^2c^2 = \frac{{m_0}^2 v^2 c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

দুই পাশে $m_0^2c^4$ যোগ করি:

$$p^2c^2 + m_0^2c^4 = \frac{{m_0}^2 v^2 c^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} + m_0^2c^4$$

$$p^2c^2 + m_0^2c^4 = \frac{m_0{}^2v^2c^2 + m_0^2c^4 - m_0{}^2v^2c^2}{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{m_0^2c^4}{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

দুইপাশে বর্গমূল নেই

$$\sqrt{p^2c^2 + m_0^2c^4} = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = mc^2$$

আমরা জানি $E = mc^2$

কাজেই $\sqrt{p^2c^2 + m_0^2c^4} = E$
যদি $m_0 = 0$ হয়
$pc = E$
কাজেই $p = E/c$

অর্থাৎ ভর শূন্য হলেও ভরবেগ p শূন্য নয়। কত সহজে কত বিচিত্র বিষয় দেখানো যায়।

3.4 মহাকর্ষ বল (Gravitational Force)

আমরা বল কী সেটা বলেছি (যেটা ত্বরণের জন্ম দেয়) সেটা কেমন করে পরিমাপ করতে হয় সেটাও বলেছি (ভর আর ত্বরণের গুণফল) কিন্তু এখনো তোমাদেরকে সত্যিকার কোনো বলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিইনি। পদার্থবিজ্ঞানের একটি চমকপ্রদ বল হচ্ছে মহাকর্ষ বল, ভর আছে সে রকম যে কোনো বস্তু অন্য বস্তুকে মহাকর্ষ বল দিয়ে আকর্ষণ করে। ধরা যাক দুটি ভর m_1 এবং m_2 তাদের মাঝে দূরত্ব r তাহলে তাদের মাঝে যে বল সৃষ্টি হবে সেটাকে যদি আমরা F বলি তাহলে

$$F = G\frac{m_1m_2}{r^2}$$

মাত্রা: MLT^{-2}

এখানে G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এবং তার মান হচ্ছে :

$$6.67 \times 10^{-11}\ Nm^2kg^2$$

এখানে মনে রাখতে হবে m_1 ভরটি m_2 কে নিজের দিকে F বলে আকর্ষণ করে আবার m_2 ভরটি m_1 কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

এই দুটো ভরের একটা যদি আমাদের পৃথিবী হয় এবং আমরা যদি ধরে নিই তার ভর M, এবং পৃথিবীর উপরে m ভরের অন্য একটা জিনিস রাখা হয় তাহলে পৃথিবী m ভরকে তার কেন্দ্রের দিকে F বলে আকর্ষণ করবে

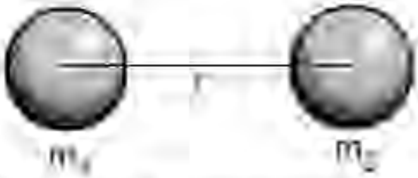

ছবি 3.5: দুটি ভরের ভেতর মহাকর্ষ বল

$$F = G\frac{mM}{R^2}$$

এই বলটিই আসলে বস্তুটির ওজন। মনে রাখতে হবে এখানে R পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে m ভরটি পর্যন্ত দূরত্ব। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে m ভরের দূরত্ব নয়। যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অনেক (প্রায় 6000 km) কাজেই পৃথিবীর পৃষ্ঠে ছোটখাটো উচ্চতাকে গণনার মাঝে আনার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব মাপা হয় কারণ যদি গোলাকার কোনো বস্তু হয় তাহলে তার সমস্ত ভর কেন্দ্রবিন্দুতে জমা হয়ে আছে ধরে নিলে কোনো ভুল হয় না। (তার কারণ পৃথিবীর প্রত্যেকটা বিন্দুই m ভরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং সবগুলো আকর্ষণ একত্র করা হলে মনে হয় যেন পৃথিবীর সমস্ত ভরটুকুই কেন্দ্রবিন্দুতে জমা হয়ে আছে।)

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি

$F = ma$ কাজেই

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য m ভরটি একটি ত্বরণ অনুভব করবে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য যে ত্বরণ হয় সেটিকে a না লিখে g লেখা হয় সেটা আমরা আগেই বলেছি। কাজেই

$$G\frac{mM}{R^2} = mg$$

পৃথিবীর ভর $M = 5.98 \times 10^{24}\ kg$, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $R = 6.37 \times 10^{6}\ m$

$$g = \frac{GM}{R^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.98 \times 10^{24}}{(6.37 \times 10^{6})^2} m/s^2 = 9.8\ m/s^2$$

আমরা এর আগের অধ্যায়েই গতির সমীকরণে g এর এই মান ব্যবহার করেছি, তখন তোমরা জানতে পারোনি কেন g এর এই মান ব্যবহার করা হয়েছিল।

উদাহরণ 3.8: স্পেস স্টেশনের উচ্চতা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক $100\ km$. সেখানে g এর মান কত?

উত্তর: স্পেস স্টেশনে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g' হলে

$$g' = \frac{GM}{(R+r)^2}$$

এখানে R পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $6000\ km$ এবং স্পেস স্টেশনের উচ্চতা $r = 100\ km$

$$g' = \frac{GM}{(R+r)^2} = \frac{GM}{R^2(1+r/R)^2} = \frac{g}{(1+r/R)^2}$$

$$g' = \frac{g}{1.016^2} = 9.49\ m/s^2$$

g' এর মান মোটেই শূন্য নয় তাহলে সেখানে মহাকাশচারীরা ওজনহীন (ছবি 3.6) কেন?

ছবি 3.6: মহাকাশযানে ভাসমান এস্ট্রোনট।

উদাহরণ 3.9: পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চাঁদের দূরত্ব $3.8 \times 10^5 km$. চাঁদের একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে কত সময় লাগবে?

উত্তর: চাঁদকে পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ বলে টানছে। সেটি F হলে

$$F = G\frac{mM}{r^2}$$

M পৃথিবীর ভর

m: চাঁদের ভর

r: পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব

পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য চাঁদের ত্বরণ a হলে

$$a = \frac{v^2}{r}$$

এখানে

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

T পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের যে সময় লাগে।

$F = ma$ ব্যবহার করে

$$G\frac{mM}{r^2} = m\frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r}$$

$$\frac{GM}{r} = \left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2$$

$$T = \frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM}{r}}} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

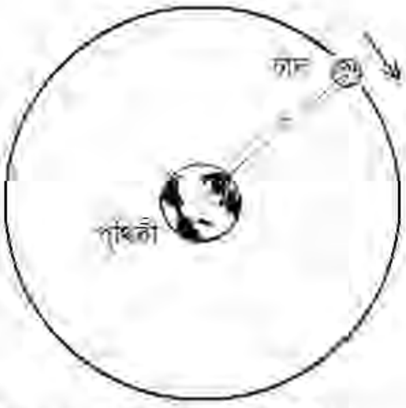

ছবি 3.7। পৃথিবীকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান চাঁদ।

আমরা এখানে প্রত্যেকটির মান বসিয়ে হিসাব করতে পারি কিন্তু সেটা না করে এখানে $g = \frac{GM}{R^2}$ ব্যবহার করে দেখি :

$$T = \frac{2\pi}{R}\sqrt{\frac{r^3}{g}}$$

এখানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $R = 6.37 \times 10^6\ m$ এবং $g = 9.8\ m/s^2$

$$T = \frac{2\pi \times (3.8 \times 10^5)^{\frac{3}{2}}}{6.37 \times 10^6 \times \sqrt{9.8}}\ s = \frac{2\pi \times (3.8 \times 10^5)^{\frac{3}{2}}}{6.37 \times 10^6 \times \sqrt{9.8} \times 60 \times 60 \times 24}\ days$$

$$T = 27\ days$$

পৃথিবী থেকে মনে হয় চাঁদ বুঝি 29.5 দিনে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে (উদাহরণ 2.15) আসলে সময়টি 27 দিন।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের প্রদক্ষিণ করতে কত সময় লাগে সেটা বের করতে আমাদের কোথাও চাঁদের ভর ব্যবহার করতে হয়নি। কাজেই

$$T = \frac{2\pi}{R}\sqrt{\frac{r^3}{g}}$$

সূত্রটি আমরা পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকা যে কোনো উপগ্রহের জন্যও ব্যবহার করতে পারব

উদাহরণ 3.10: সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্বগুলো হচ্ছে (পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায়)।

গ্রহ	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন
দূরত্ব	0.387	0.723	1	1.524	5.203	9.539	19.18	30.06

কোন গ্রহ কত সময়ে সূর্যকে একবার ঘুরে আসে?

উত্তরঃ m গ্রহের ভর এবং M সূর্যের ভর হলে, একটি গ্রহকে সূর্য তার দিকে যে বলে টানছেঃ

$$F = G\frac{mM}{r^2}$$

এই বলে টানার কারণে সেই গ্রহের ত্বরণঃ

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

এখানে T হচ্ছে সূর্যকে একবার ঘুরে আসার সময়।
যেহেতু $F = ma$

$$G\frac{mM}{r^2} = m\frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

কাজেই যে কোনো গ্রহের জন্য সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগে

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$$

$r = r_0$ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হলে $T = T_0$ হবে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর যে সময় লাগে,

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2 {r_0}^3}{GM}$$

কাজেই যে কোনো গ্রহের জন্য সূর্যকে একবার ঘুরে আসার সময়

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM} = \frac{4\pi^2 r_0^3}{GM}\left(\frac{r^3}{r_0^3}\right) = T_0^2\left(\frac{r^3}{r_0^3}\right)$$

$$T = T_0\sqrt{\left(\frac{r^3}{r_0^3}\right)}$$

এখন আমরা ভিন্ন গ্রহের জন্য r এর মান বসিয়ে সরাসরি পৃথিবীর তুলনায় অন্যান্য গ্রহের সূর্যকে ঘিরে আসতে কত সময় লাগবে বের করে ফেলতে পারি। যেহেতু পৃথিবীর সূযকে ঘিরে আসার সময়টাকে আমরা বৎসর বলি কাজেই তালিকাটা বৎসরে বের হবে।

যেমন বুধ গ্রহের জন্য

$$T = T_0 \sqrt{\left(\frac{0.387}{1}\right)^3} = 0.24$$

এভাবে অন্যগুলোও বের করতে পারি। উত্তর হবে :

গ্রহ	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন
বৎসর	0.24	0.614	1	1.881	11.86	29.46	84.00	164.81

তোমরা ইন্টারনেট বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে মিলিয়ে দেখ তোমার হিসাব কি সত্যি কি না! কত অল্প জেনে কোন গ্রহকে সূর্যকে ঘিরে আসতে বছর লাগবে বের করতে পারছ– ভেবে দেখেছ?

3.4.1 পৃথিবীর কেন্দ্রে g এর মান

আমরা দেখেছি পৃথিবীর পৃষ্ঠে g এর মান

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

যদি পৃথিবীর কেন্দ্রের g এর মান বের করার জন্যে এই সমীকরণে $R = 0$ বসিয়ে দিই তাহলে মোটেও সঠিক উত্তর পাব না, কাজেই ঠিক করে এটা বের করতে হবে।

ধরা যাক পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R এবং আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে গর্ত করে পৃথিবীর গভীরে ঢুকে গেছি এবং সেখানে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব r। আমরা r কে ব্যাসার্ধ ধরে আরেকটা গোলক কল্পনা করে নিই। এখন আমরা পৃথিবীটাকে দুই ভাগে ভাগ করে নিতে পারি, r ব্যাসার্ধের গোলক এবং তার বাইরের অংশটুকু। (ছবি 3.8)

পৃথিবীর গভীরে কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে যদি কোনো ভর m থাকে তাহলে তার ওপর মাধ্যাকর্ষণ বলটিকে আমরা দুটি ভিন্ন বলের যোগফল হিসেবে বের করতে পারি। r ব্যাসার্ধের গোলকের কারণে মাধ্যাকর্ষণ বল এবং বাইরের অংশটুকুর কারণে মাধ্যাকর্ষণ বল। ছবি দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ বাইরের অংশের কারণে যে মাধ্যাকর্ষণ বল তৈরি হয় সেটা যেমন নিচের দিকে আছে ঠিক সে রকম ওপরের দিকেও আছে। আমরা যদি ঠিক করে হিসেব করি তাহলে দেখব ব্যাসার্ধের পৃষ্ঠে যে কোনো বিন্দুতে নিচের পিছের দিকে যে মাধ্যাকর্ষণ বল টানছে সেটাকে কাটাকাটি করে ফেলছে উপর দিক থেকে টানা মাধ্যাকর্ষণ বল এবং সব মিলিয়ে এই মাধ্যাকর্ষণ বলের মান হচ্ছে শূন্য! কাজেই কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে থাকা ভরের ওপর মাধ্যাকর্ষণ বল আসবে শুধুমাত্র r গোলকের ভেতরকার ভরটুকুর জন্য বাইরে থেকে কিছু আসবে না।

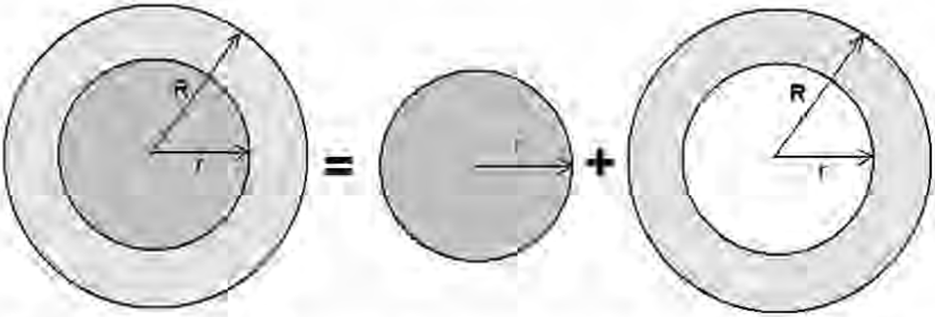

ছবি 3.8: পৃথিবীর ভেতরে একটি গোলকের উপর এবং গোলকের বাইরের অংশে ভরের কারণে তৈরী হওয়া g

পৃথিবীর ভর M এবং আয়তন $\left(\frac{4\pi}{3}\right)R^3$ তাই তার ঘনত্ব ρ

$$\rho = \frac{M}{\left(\frac{4\pi}{3}\right)R^3}$$

সুতরাং r ব্যাসার্ধের গোলকের ভর M'

$$M' = \left(\frac{4\pi}{3}\right)r^3\rho = \left(\frac{4\pi}{3}\right)r^3 \times \frac{M}{\left(\frac{4\pi}{3}\right)R^3} = \left(\frac{r}{R}\right)^3 M$$

সুতরাং পৃথিবীর ভেতরে কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে রাখা m ভরের ওপর মাধ্যাকর্ষণ বল হচ্ছে

$$F = \frac{GmM'}{r^2} = \frac{Gm}{r^2}\left(\frac{r}{R}\right)^3 M = \frac{GmM}{R^2}\left(\frac{r}{R}\right) = mg\left(\frac{r}{R}\right)$$

g হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ। সুতরাং পৃথিবীর ভেতরে কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g' হলে মাধ্যাকর্ষণ বল F হবে mg', কাজেই

$$mg' = mg\left(\frac{r}{R}\right)$$
$$g' = g\left(\frac{r}{R}\right)$$

কাজেই একেবারে কেন্দ্রে $(r = 0)$ g' এর মান শূন্য। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোনো বস্তু ওজনহীন।

উদাহরণ 3.11: পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্র থেকে করে শুরু পৃথিবী থেকে বাইরে g এর মান দূরত্বের সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয় দেখাও।

উত্তর: পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে:

$$g_{in} = g\left(\frac{r}{R}\right)$$

পৃথিবীর বাইরে কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে:

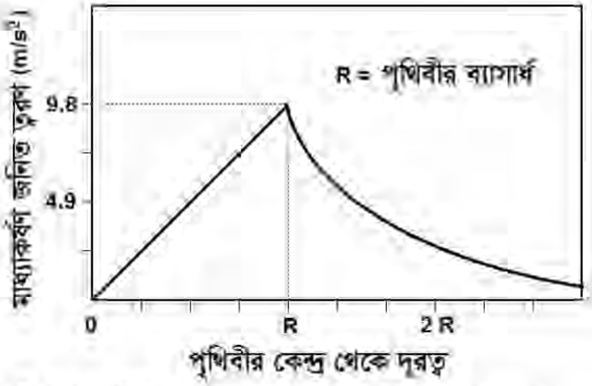

ছবি 3.9: পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে g এর মান।

$$F = mg_{out} = G\frac{mM}{r^2} = G\frac{mM}{R^2}\left(\frac{R^2}{r^2}\right) = mg\left(\frac{R^2}{r^2}\right)$$

$$g_{out} = g\left(\frac{R^2}{r^2}\right)$$

g এর মান 3.9 ছবিতে দেখানো হয়েছে

3.5 স্প্রিংয়ের বল

ধরা যাক স্বাভাবিক অবস্থায় একটা স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্য L এই স্প্রিংটাকে টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে এবং ধরা যাক এই স্প্রিংয়ের এক মাথা একটি দেয়ালে লাগানো অন্য মাথায় একটা ভর m লাগানো আছে। স্বভাবিক অবস্থায় m ভরটির ওপর স্প্রিংয়ের কারণে কোনো বল নেই। স্প্রিংয়ের পুরো দৈর্ঘ্য জানার চেয়ে তার সংকোচন কিংবা প্রসারণ জানতে আমরা বেশি আগ্রহী তাই স্প্রিংয়ের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য L বিন্দুটিকে x অক্ষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছি। (ছবি 3.10)

কাজেই যদি আমরা ভরটিকে আঙ্গুল দিয়ে স্প্রিংয়ের দিকে চেপে ধরি, অর্থাৎ F বল প্রয়োগ করি তাহলে স্প্রিংটা সংকুচিত হয়ে যাবে। আমরা যদি চাপ দিয়ে ধরে রাখি অর্থাৎ বল প্রয়োগ করি তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র $F = ma$ অনুযায়ী ত্বরণ হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু ভরটি স্থির কোনো ত্বরণ হচ্ছে না তার মানে নিশ্চয়ই অন্য একটি বল বিপরীত দিক থেকে কাজ করছে এবং দুটি বলের যোগফল শূন্য হয়ে যাওয়ার কারণে বস্তুটির মোট বল শূন্য এবং বস্তুটির ত্বরণ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বিপরীত দিক থেকে বলটি আসছে স্প্রিং থেকে যার অর্থ স্প্রিং যদি সংকুচিত হয় তাহলে সেটি বল প্রয়োগ

করে। প্রত্যেকটা স্প্রিংয়েরই একটা স্প্রিং ধ্রুবক থাকে এবং দেখা গেছে স্প্রিংকে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত করা হলে সংকোচন অথবা প্রসারণ একটা বল প্রদান করে। বিচ্যুতির পরিমাণ x হলে

$$F = -kx$$

এখানে একটি নেগেটিভ চিহ্ন রয়েছে যার অর্থ বলের দিকটি বিচ্যুতির বিপরীত দিকে। অর্থাৎ স্প্রিং যদি সংকুচিত হয় তাহলে x এর মান নেগেটিভ এবং সে কারণে F পজিটিভ অর্থাৎ F এর দিক হচ্ছে x অক্ষের পজিটিভ দিক ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। আবার যদি ভরটিকে টেনে ধরা হয় তাহলে স্প্রিংটার বিচ্যুতি হবে পজিটিভ কাজেই F এর মান হবে নেগেটিভ অর্থাৎ বলটা হবে x অক্ষের নেগেটিভ দিকে, ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে।

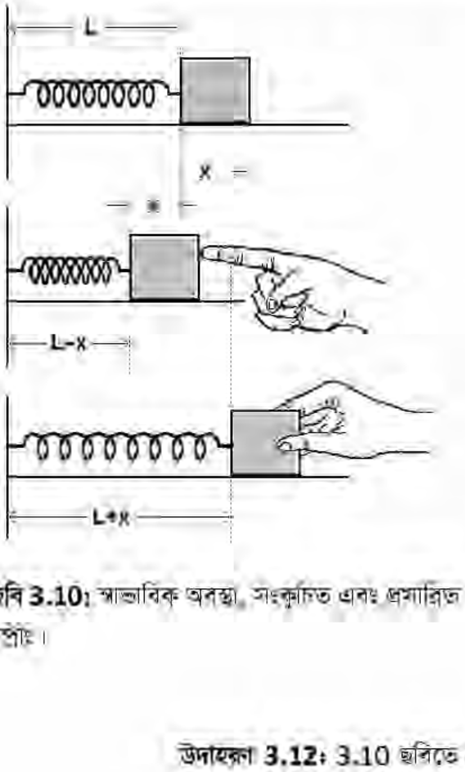

ছবি 3.10: স্বাভাবিক অবস্থা, সংকুচিত এবং প্রসারিত স্প্রিং।

স্প্রিংয়ের এই বলটি পদার্থবিজ্ঞানের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বল। আমরা ভরটিকে ছেড়ে দিইনি, তাই বলের লব্ধি শূন্য এবং ভরটিতে কোনো ত্বরণ হয়নি। কিন্তু স্প্রিংটিকে সংকুচিত কিংবা প্রসারিত করে আমরা ছেড়েও দিতে পারতাম তাহল স্প্রিং থেকে প্রয়োগ করা বলের কারণে ভরটার ত্বরণ হতো, বেগ বাড়তো এবং ভরটা নড়তে শুরু করত। এখানে বলটির মান সব সময় সমান থাকবে না, x বেড়ে যাওয়া, কমে যাওয়া, পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ হওয়ার কারণে বলটিও বাড়বে কমবে এমনকি দিকও পরিবর্তন করবে, কাজেই ত্বরণটা হবে বৈচিত্র্যময় এবং ভরটির গতি আরো বেশি বৈচিত্র্যময়।

স্প্রিংয়ের কারণে ভরটির বেগ কেমন হয় সেটি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সেটি সামনে পিছনে করতে থাকবে এবং ঘর্ষণের কারণে এক সময় থেমে যাবে। যদি ঘর্ষণ না থাকত ভরটি তাহলে অনন্তকাল সামনে পিছনে করতে থাকত।

উদাহরণ 3.12: 3.10 ছবিতে যে ভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে একটা (ঘর্ষণহীন) টেবিলে একটা ভর রাখা আছে। কোনো কিছু করা না হলে স্প্রিংটার দৈর্ঘ্য Lএখন স্প্রিংটাকে যদি x দূরত্ব টেনে নিয়ে ছেড়ে দিই তাহলে কী হবে?

উত্তর: স্প্রিংটা ভরটাকে $F = -kx$ বলে টানবে অর্থাৎ বলটা ভরটাকে বাম দিকে টানবে। এই বলের জন্য ভরের ত্বরণ হবে এবং ত্বরণের জন্য বেগ বাড়তে শুরু করবে। বেগের কারণে ভরটা বাম দিকে নড়তে শুরু করবে এবং x এর মান কমতে থাকবে– অর্থাৎ বলটাও কমতে থাকবে কাজেই ত্বরণও

কমতে থাকবে। এটা হচ্ছে সমত্বরণে না চলার একটা উদাহরণ। ত্বরণ কমতে থাকলেও যেহেতু ত্বরণ আছে তাই বেগ কিন্তু বাড়তে থাকবে। যখন ভরটা স্প্রিংয়ের আসল দৈর্ঘ্য L এ পৌঁছাবে তখন $x = 0$ কাজেই বল $F = 0$ এবং ত্বরণ $= 0$ অর্থাৎ বেগ আর বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু বৃদ্ধি না পেলেও এর মাঝে কিন্তু বেগ সর্বোচ্চ মানে বেড়ে গেছে কাজেই এটার থেমে যাবার কোনো সুযোগ নেই। এটা স্প্রিংটাকে সংকুচিত করেই চলতে থাকবে। যখন স্প্রিংটাকে সংকোচন করবে তখন স্প্রিংটা উল্টোদিকে বল প্রয়োগ করে ভরটাকে থামানোর চেষ্টা করবে। অন্যভাবে বলা যায় এবারে উল্টোদিকে ত্বরণ (বা মন্দন) হতে শুরু করবে এবং ভরটার গতি কমতে শুরু করবে। যখন আবার x দূরত্বে স্প্রিংটাকে সংকোচন করবে তখন বেগ কমতে কমতে শূন্য হয়ে যাবে।

স্প্রিংটা যেহেতু সংকুচিত হয়ে আছে সেটা কিন্তু ভরটাকে ডান দিকে বল প্রয়োগ করেই যাচ্ছে, কাজেই ত্বরণ তৈরি হবে এবং আবার বেগ বাড়তে থাকবে, তবে এবারে উল্টো দিকে। এভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি বারবার ঘটতেই থাকবে। ছবিতে যেরকম দেখানো হয়েছে।

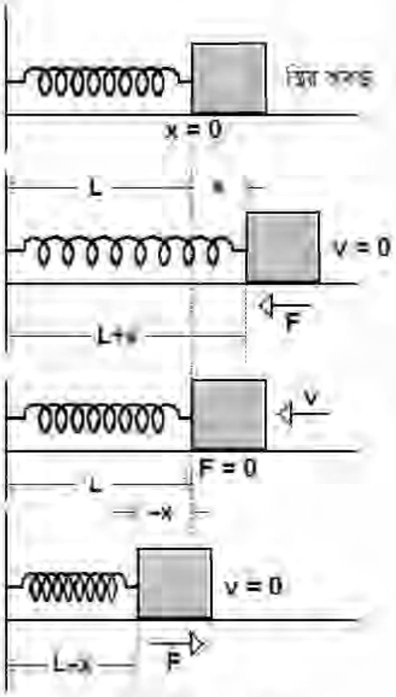

ছবি 3.11: স্প্রিংয়ের গতি।

উদাহরণ 3.13: পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে যদি একটা ফুটো করে তুমি ঝাপ দাও (ছবি 3.12) তাহলে কী হবে?

উত্তর: ঠিক স্প্রিংয়ের মতো এখানেও একই ব্যাপার হবে, শুরুতে তোমার বেগ শূন্য– আস্তে আস্তে সেটা বাড়তে থাকবে কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি, তারপর সেটা কমতে থাকবে– অন্য পাশে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেগ শূন্য হয়ে যাবে। তারপর দিকের পরিবর্তন হবে, আবার একই ব্যাপার। তার মানে তুমি এক দিক থেকে অন্যদিকে যেতে আসতে থাকবে।

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্প্রিংয়ের বেলায় বলটি ছিল $F = -kx$ এখানে $F = -kr$ যেখানে $k = g/R$

3.5 নিউটনের তৃতীয় সূত্র (Newton's Third Law)

কোনো বল প্রয়োগ না করলে কী হয় সেটি আমরা জানতে পেরেছি নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে। বল প্রয়োগ করলে কী হয় সেটা আমরা জেনেছি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে। যখন একটি বস্তু অন্য বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে তখন বস্তু দুটির মাঝে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, সেটি আমরা জানতে পারব নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে। সূত্রটি এরকম :

নিউটনের তৃতীয় সূত্র : যখন একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে তখন সেই বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির ওপর বিপরীত দিকে সমান বল প্রয়োগ করে।

পদার্থবিজ্ঞানের বইয়ে সাধারণত যেভাবে নিউটনের তৃতীয় সূত্র লেখা হয়, "প্রত্যেকটি ক্রিয়ার (action) একটা সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া (reaction) থাকে", আমরা এখানে সেভাবে লিখিনি। আমাদের এতক্ষণে বল সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হয়েছে হঠাৎ করে বলকে "ক্রিয়া" কিংবা প্রতিক্রিয়া বললে বিভ্রান্তি হতে পারে! তার চাইতে বড় কথা যারা নূতন পদার্থবিজ্ঞান শেখে তাদের প্রথম প্রশ্নই হয় যে যদি সকল ক্রিয়ার (কোনো একটি বল) একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া (আরেকটি বল) থাকে তাহলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একে অপরকে কাটাকাটি করে শূন্য হয়ে যায় না কেন! এজন্য তৃতীয় সূত্রটিতে খুব স্পষ্ট করে লিখে দেয়া দরকার যে তৃতীয় সূত্র বলছে যে যদি দুটি বস্তু A এবং B থাকে তাহলে A যখন B বলের উপর বল প্রয়োগ করে তখন B বল প্রয়োগ করে A এর ওপর! বিপরীত দুটি বল ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কাজ করে কখনোই এক বস্তুতে নয়। যদি একই বস্তুতে দুটি বল প্রয়োগ করা হতো শুধু তাহলেই একে অন্যকে কাটাকাটি করতে পারত। এখানে কাটাকাটির কোনো সুযোগ নেই।

ছবি 3.12: পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে ছেড়ে দেয়া একজন মানুষ উপরে নিচে করতে থাকবে।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক ওপর থেকে আমরা m ভরের একটা বস্তু ছেড়ে দিয়েছি (ছবি 3.13)। আমরা জানি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য m ভর পৃথিবীর দিকে একটা বল F অনুভব করবে:

$$F = G\frac{mM}{R^2}$$

আমরা আগেই দেখেছি এই বলটাকে mg হিসেবে লেখা যায়।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র শেখার পর আমরা জানি m ভরটিও বিশাল পুরো পৃথিবীটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে! সেই বলটিও F শুধুমাত্র বিপরীত দিকে! আমরা এই বলটিকে নিয়ে মাথা ঘামাইনা, তার কারণ এই বলটার কারণে পৃথিবীর কতটুকু ত্বরণ a হচ্ছে সেটা ইচ্ছে করলে বের করতে পারি :

$$F = Ma$$

এখানে M হচ্ছে পৃথিবীর ভর এবং a হচ্ছে পৃথিবীর ত্বরণ

কাজেই

$$a = \frac{F}{M} = \frac{mg}{M} = \left(\frac{m}{M}\right) g$$

যদি পৃথিবীর ভর $M = 5.98 \times 10^{24}\ kg$ হয় তাহলে আমরা যদি $1\ kg$ ভরের একটা বস্তুর উপর থেকে ছেড়ে দিই তার জন্য পৃথিবীর ত্বরণ হবে

$$a = 1.6 \times 10^{-24} m/s^2$$

এটি এত ক্ষুদ্র যে কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামায় না! তুমি যখন পরের বার কোনো জায়গায় লাফ দেবে তখন মনে রেখো নিচে পড়ার সময় পুরো পৃথিবীটাকে তুমি আকর্ষণ করে নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলে! (যত কমই হোক তুমি সারা পৃথিবীকে নিজের দিকে টেনেছিলে, সেটা নিয়ে একটু গর্ব করতে পার।)

ছবি 3.13: একটি ভরকে পৃথিবী যেমন আকর্ষণ করে ভরটি পৃথিবীকেও সেভাবে আকর্ষণ করে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র বোঝার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে আমরা কীভাবে হাঁটি সেটা বোঝা। আমরা সবাই হাঁটতে পারি এর পেছনে কি পদার্থবিজ্ঞান আছে সেটা না জেনেই সবাই হাঁটে। কিন্তু তোমরা যেহেতু পদার্থবিজ্ঞান শিখতে শুরু করেছ তোমাদের খুব সহজ একটা প্রশ্ন করা যায়। তুমি যেহেতু স্থির অবস্থা থেকে হাঁটতে পার কাজেই আসলে তোমার একটি ত্বরণ হচ্ছে, যার অর্থ তোমার উপর বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি কেউ আমাদের উপর বল প্রয়োগ করে না। আমরা নিজেরাই হাঁটি। কেমন করে সেটা সম্ভব?

নিউটনের তৃতীয় সূত্র না জানা থাকলে আমরা কখনোই হাঁটার বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। আমরা যখন হাঁটি তখন আমরা পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিই (অর্থাৎ বল প্রয়োগ করি) তখন মাটিটা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী আমাদের শরীরে সমান এবং বিপরীত বল প্রয়োগ কওে (ছবি 3.14)। এই সমান এবং বিপরীত বলটা দিয়েই আমাদের ত্বরণ হয়, আমরা হাঁটি!

বিষয়টা যাদের বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া যায়, শক্ত মাটিতে হাঁটা সোজা কিন্তু ঝুরঝুরে বালুর উপর হাঁটা সোজা না– তার কারণ বালুর ওপর বল প্রয়োগ করা যায় না, বালু সরে যায়– তাই নিউটনের তৃতীয় সূত্রের পাল্টা বলটাও ঠিক ভাবে পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা আরো অনেক স্পষ্ট করে দেয়া যায় যদি কাউকে অসম্ভব মসৃণ একটা মেঝেতে সাবান পানি কিংবা তেল দিয়ে পিচ্ছিল করে হাঁটতে দেয়া হয়! সেখানে ঘর্ষণ খুব কম, তাই আমরা পিছনে বল প্রয়োগ করতেই পারব না, এবং সে জন্য তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমাদের ওপর কোনো বলও পাব না! আর তাই হাঁটতেও পারব না (বিশ্বাস না হলে চেষ্টা করে দেখতে পার)। বল প্রয়োগ করলে বিপরীত এবং সমান বল পাওয়া যায়, যদি প্রয়োগ করতেই না পারি তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বল পাব কেমন করে? আর হাঁটব কেমন করে?

ছবি 3.14: একজন মানুষ হাঁটার সময় পা দিয়ে যখন মাটিকে ধাক্কা দেয় তখন মাটিও মানুষটিকে পাল্টা ধাক্কা দেয়।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র বুঝতে গিয়ে অনেকেই প্রথম প্রথম একটা ভুল করে। সেটা হচ্ছে আমরা যদি মাটিতে একটা পাথর রাখি তখন কী হয় সেটা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না. পাথরটি যেহেতু নড়ছে না কাজেই তার ত্বরণ নেই কাজেই এর উপরে নিশ্চয়ই কোনো বল কাজ করছে না অর্থাৎ মোট বলের পরিমাণ শূন্য কিংবা বলগুলো একটা আরেকটাকে কাটাকাটি করছে। বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই বলে ফেলি পাথরটা মাটিকে তার ওজনের সমান বল প্রয়োগ করছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী মাটিটাও তার বিপরীতে পাথরটাকে সমান এবং বিপরীত বল প্রয়োগ করছে এবং এই দুটো বল একটা আরেকটাকে কাটাকাটি করে ফেলছে। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই ব্যাখ্যাটা সঠিক না– কারণ তৃতীয় সূত্র বলে দিয়েছে একটি বস্তু অন্যটির ওপর বল প্রয়োগ করবে। কাজেই কাটাকাটি করতে হলে একই বস্তুর ওপর দুটি বল প্রয়োগ করতে হবে– নিউটনের তৃতীয় সূত্র সেটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে!

এর সঠিক উত্তর বের করার জন্য আমরা প্রথমে পাথর এবং মাটির মাঝখানে একটা স্প্রিং কল্পনা করে নিই (ছবি 3.15)। পাথরের ওজনের জন্য স্প্রংটা একটু সংকুচিত হয়ে পাথরটার ওপর বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ

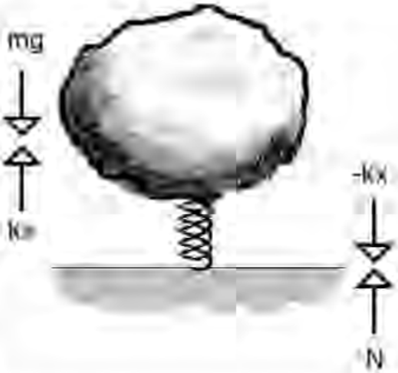

ছবি 3.15: মাটির ওপর রাখা পাথরকে একটা স্প্রিংয়ের ওপর রয়েছে কল্পনা করা যায়।

করবে এবং পাথরটাতে দুটি সমান এবং বিপরীত বল একে অন্যকে কাটাকাটি করে লব্ধি শূন্য করে দেবে। ঠিক একইভাবে স্প্রিংটার অন্য অংশও মাটিকে বল প্রয়োগ করবে, মাটিও বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করবে! কাজেই প্রত্যেকটা বস্তুতেই দুটো বিপরীত বল একে অন্যকে কাটাকাটি করে স্থির অবস্থায় থাকবে।

স্বাভাবিক ভাবেই তোমরা প্রশ্ন করতে পার, আমরা যখন মাটিতে একটা পাথর রাখি কিংবা যখন একটা চেয়ারে বসি তখন তো আসলে মাঝখানে কোনো স্প্রিং থাকে না– তখন কী হয়? স্প্রিং না থাকলেও স্প্রিং যে দায়িত্বটা পালন করে কঠিন বস্তু প্রয়োজনে একটু বিকৃত, বিচ্যুত, বাঁকা (deform) হয়ে সেই কাজটুকু করে ফেলে! কাজেই কঠিন বস্তু স্প্রিংয়ের মতোই পাল্টা একটা বল সরবরাহ করে।

উদাহরণ **3.14:** (a) ধরা যাক তুমি সম্পূর্ণ ঘর্ষণহীন একটা সমতলে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার ওজন $50kg$ এবং তোমার সামনে একটা $100kg$ ভরের পাথর। তুমি ঠিক করলে তুমি পাথরটাকে $50N$ বল দিয়ে ধাক্কা দিয়ে এক মাথা থেকে অন্য মাথায় নিয়ে যাবে। $10s$ পরে পাথরটার বেগ কত হবে? (ছবি 3.16)

উত্তরঃ তুমি যখন পাথরটাকে $50N$ বল দিয়ে ধাক্কা দেবে পাথরটাও কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী তোমাকে $50N$ বল দিয়ে ধাক্কা দেবে। পাথরটার ত্বরণ হবে ডান দিকে

$$a = \frac{F}{m} = \frac{50}{100}\ m/s^2 = 0.5\ m/s^2$$

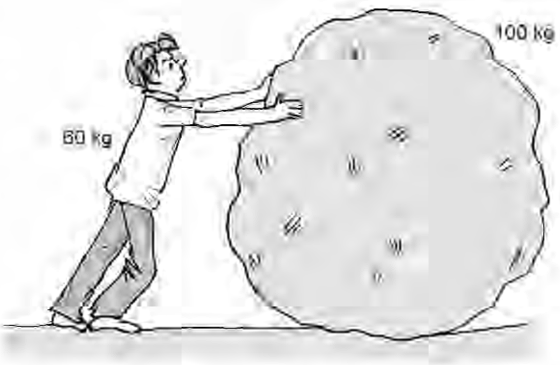

ছবি **3.16:** একজন মানুষ যখন একটা পাথরকে ধাক্কা দেয় তখন পাথরটিও মানুষটিকে পাল্টা ধাক্কা দেয়।

ঠিক সে রকম তোমারও ত্বরণ হবে বাম দিকে

$$a = \frac{F}{m} = \frac{50}{50}\ m/s^2 = \ 1\ m/s^2$$

কাজেই তুমি এবং পাথর দুটি দুদিকে সরে যাবে! পাথরটাকে ধাক্কা দিয়ে এক মাথা থেকে অন্য মাথায় তুমি নিয়ে যেতে পারবে না! কারণ পাথর আর তোমার ভেতর একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে– কাজেই টানা $10s$ পাথরটাকে ধাক্কা দেয়া সম্ভব না!

(b) ধরা যাক তুমি $2s$ পাথরটাকে ধাক্কা দিতে পেরেছ তখন কী হবে?

উত্তর: $2s$ এ পাথরটার বেগ বেড়ে হবে:

$$v = u + at = 0 + 0.5 \times 2 m/s = 1 m/s$$

এরপর থেকে তুমি $1 m/s$ সমবেগে যেতে থাকবে।

$2s$ এ তোমার বেগ হবে।

$$v = u + at = 0 + 1 \times 2 m/s = 2 m/s$$

এর পর তুমি $2m/s$ সমবেগে পিছনে ধারে যেতে থাকবে।

3.6 ঘর্ষণ বল (Frictional Force)

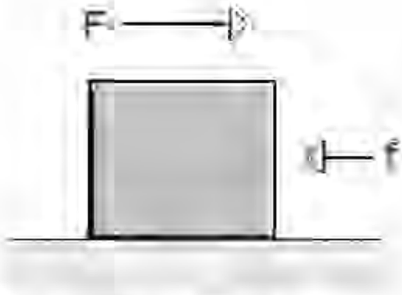

ছবি 3.17: একটি ভরের উপর বল প্রয়োগ করলে ঘর্ষণের জন্যে বিপরীত দিকে একটি বল তৈরী হতে পারে।

আমরা এর আগে মহাকর্ষ কিংবা মাধ্যাকর্ষণ বল এবং স্প্রিংয়ের বল নিয়ে আলোচনা করেছি, এবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বল নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হলো ঘর্ষণ বল।

ধরা যাক একটা টেবিলে কোনো একটা কাঠের টুকরো রয়েছে এবং সেই কাঠের টুকরোর উপর বল প্রয়োগ করে সেখানে ত্বরণ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। ধরা যাক 3.17 ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে ভরটির উপর বাম থেকে ডানে F বল প্রয়োগ করছি, দেখা যাবে কাঠের টুকরোর টেবিলের সাথে কাঠের টুকরোর ঘর্ষণের কারণে একটা ঘর্ষণ বল f তৈরি হয়েছে এবং সেটি ডান থেকে বাম দিকে কাজ করে প্রয়োগ করা বলটিকে কমিয়ে দিচ্ছে।

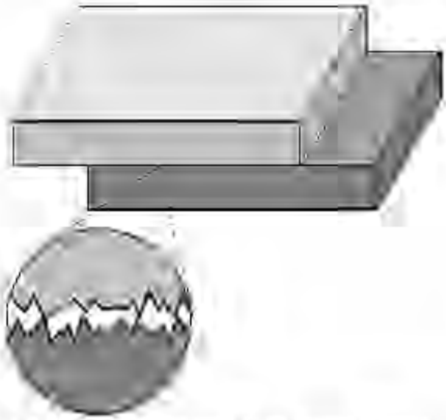

ছবি 3.18: ঘর্ষণ পৃষ্ঠতলকে সুক্ষ্ম এবড়ো থেবড়ো থাকার কারণে তৈরী হয়।

এখন তুমি যদি মনে কর ঘর্ষণের ফলে ডান থেকে বাম দিকে একটা ঘর্ষণ বল তৈরি হয় কাজেই কাঠের টুকরোর উপরেও যদি বাম দিকে বল প্রয়োগ করি তাহলে প্রয়োগ করা বল আর ঘর্ষণ বল একই দিকে হওয়ার কারণে বাড়তি একটা বল পেয়ে যাব! কিন্তু দেখা যাবে এবারেও ঠিক বিপরীত দিকে ঘর্ষণ বল কাজ করছে– ঘর্ষণ বল সব সময়েই প্রয়োগ করা বলের বিপরীত দিকে কাজ করে। কাঠের টুকরোর উপরে যদি খানিকটা ওজন বসিয়ে দিই, দেখা যাবে ঘর্ষণ বল আরো বেড়ে গেছে যদিও ওজন এবং ঘর্ষণ বল পরস্পরের উপর লম্ব।

ঘর্ষণ বল কীভাবে তৈরি হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারলেই আমরা দেখব এতে অবাক হবার কিছু নেই। যদিও আপাত দৃষ্টিতে কাঠ, টেবিলকে কিংবা যে

দুটো তলদেশের মাঝে ঘর্ষণ হচ্ছে) অনেক মসৃণ মনে হয় কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে (ছবি 3.18) সব তলদেশেই এবড়োথেবড়ো এবং এই এবড়োথেবড়ো অংশগুলোর অংশগুলো এক অন্যকে স্পর্শ করে বা খাঁজগুলো একে অন্যের সাথে আটকে যায় সেটার কারণেই গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আমরা বলি বিপরীত দিক থেকে ঘর্ষণ বলের জন্ম হয়েছে। যদি দুটো তলদেশকে আরো চাপ দেয়া হয় তাহলে এবড়োথেবড়ো অংশ আরো বেশি একে অন্যকে স্পর্শ করবে, একটির খাঁজ অন্যটির আরো গভীর খাঁজে ঢুকে যাবে এবং ঘর্ষণ বল আরো বেড়ে যাবে।

ঘর্ষণের জন্য তাপ সৃষ্টি হয়। সেটা অনেক সময়েই সমস্যা। যেমন গাড়ির সিলিন্ডারে পিস্টনকে ওঠানামা করার সময়ে সেখানে ঘর্ষণের জন্য তাপের সৃষ্টি হয় আর সেই তাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গাড়ির ইঞ্জিনকে শীতল রাখতে হয়। তাই সেখানে ঘর্ষণ কমানোর জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

কিন্তু তোমরা যেন মনে না করো আমরা সব সময়েই ঘর্ষণ বল কমাতে চাই। তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো কাদার মাঝে কোনো গাড়ি বা ট্রাক আটকে যেতে দেখেছ। তখন গাড়ির চাকা ঘুরলেও ঘর্ষণ কম বলে কাদা থেকে গাড়ি বা ট্রাক উঠে আসতে পারে না, চাকা পিছলিয়ে যায়। ঘর্ষণ বাড়িয়ে অনেক কষ্ট করে গাড়ি বা ট্রাককে তুলে আনতে হয়। সে জন্য গাড়ির চাকার যেন রাস্তার সাথে ঘর্ষণ বল অনেক বেশি হয় তার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়, গাড়ির টায়ারে অনেক ধরনের খাঁজ কাটা হয়। যারা গাড়ি চালায় তারা সব সময় লক্ষ রাখে তাদের টায়ারের খাঁজ কমে মসৃণ হয়ে যাচ্ছে কি না কারণ তখন ব্রেক করার পরেও গাড়ি না থেমে পিছলে এগিয়ে যাবে! ঠিক একই কারণে আমাদের জুতোর তলায় অনেক ধরনের খাঁজ থাকে যেন পিছলে না যাই।

অনেক ধরনের ঘর্ষণ বল রয়েছে, পদার্থবিজ্ঞানে বস্তুর বেগ এবং গতিতে স্থিতি ঘর্ষণ এবং গতি ঘর্ষণ বড় ভূমিকা পালন করে। দুটো বস্তু একে অন্যের সাপেক্ষে স্থির থাকা অবস্থায় যে ঘর্ষণ বল থাকে সেটা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ (static friction)। দুটো বস্তু একে অন্যের সাপেক্ষে চলমান হলে সাধারণত ঘর্ষণ বল একটু কমে যায় এবং সেটাকে বলে গতি ঘর্ষণ (Dynamic Friction)

উদাহরণ 3.15: ঘর্ষণহীন একটি সমতলে যদি কোনো ভর m থাকে তাহলে তার ভর যতই হোক না কেন তার উপর F বল প্রয়োগ করা হলে তার a ত্বরণ হবে

$$a = \frac{F}{m}$$

m যদি বেশি হয় তাহলে ত্বরণ হবে কম, m যদি কম হয় ত্বরণ হবে বেশি। ভরটি যে সমতলে আছে সেখানে যদি ঘর্ষণ থাকে তাহলে দেখা যাবে বল প্রয়োগ করলেই ত্বরণ হচ্ছে না, একটা নির্দিষ্ট বল f প্রয়োগ করা হলে হঠাৎ করে ভরটি নড়তে শুরু করে। এই f হচ্ছে ঘর্ষণজনিত বল। কাজেই কোথাও যদি ঘর্ষণ থাকে তাহলে আমাদের লিখতে হবে

$$F - f = ma$$

ঘর্ষণজনিত বল f বস্তুর ওজনের ওপর নির্ভর করে। বস্তুর ওজন $w\ (= mg)$ যত বেশি হবে ঘর্ষণ জনিত বল f তত বেশি হবে।

অর্থাৎ $f = \mu w$ এখানে μ হচ্ছে ঘর্ষণ সহগ

যদি $10kg$ ভরের একটা বস্তুকে $5N$ বল প্রয়োগ না করা পর্যন্ত নড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে μ কত?

উত্তরঃ

$$w = mg = 10 \times 9.8\,N = 98N$$
$$\mu = \frac{f}{F} = \frac{5}{98} = 0.05$$

অনুশীলনী

প্রশ্ন :

1. চলন্ত ট্রেন থেকে নামার চেষ্টা করলে তুমি কেন সামনের দিকে আছাড় খেয়ে পড়?
2. ছবি ৩.19 এ দেখানো সুতায় হ্যাঁচকা টান দিলে A সুতাটি ছিড়বে ধীরে ধীরে টান দিলে B সুতাটি ছিড়বে। কেন?
3. বেশি ভরের বস্তুর ওজন বেশি বা বল বেশি তাই উপর থেকে ছেড়ে দিলে তার ত্বরণ বেশী হবে– কথাটি কি সত্যি?
4. তুমি একটি লিফটের ভেতর ওজন মাপার যন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছ। লিফটের ক্যাবল ছিড়ে গেল– তোমার ওজন কত দেখাবে ?
5. পুরোপুরি ঘর্ষণহীন একটা পৃষ্ঠে একটা পাথরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিজের দিকে আনার চেষ্টা করলে কী হবে?

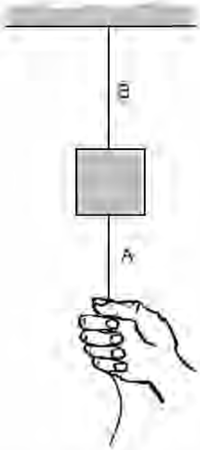

ছবি **3.19:** দুটো সুতো দিয়ে ঝোলানো একটি ভর

গাণিতিক সমস্যা :

1. ছবি 3.20 এ দেখানো 1 kg ভরের একটি বেগ–সময় লেখচিত্র বা গ্রাফ দেখানো হয়েছে। বল-সময় লেখচিত্রটি আঁক।
2. স্থির অবস্থায় থাকা 5 kg ভরের একটা বস্তুর ওপর $10N$ বল $2s$ কাজ করেছে তার $5s$ পরে $5\ s20N$ একটি বল $3s$ কাজ করেছে। বস্তুটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে?
3. **স্থির অবস্থায় থাকা 10 kg ভরের একটা বস্তুর ওপর $10N$ বল কাজ করেছে তার 10 s পরে $20N$ বল বিপরীত দিকে 5 s কাজ করেছে। বস্তুটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে?**
4. **একটি নৌকা থেকে তুমি $10m/s$ বেগে তীরে লাফ দিয়েছ। তোমার ভর $50kg$, নৌকার ভর $100kg$ হলে নৌকাটি কোন দিকে কত বেগে যাবে?**

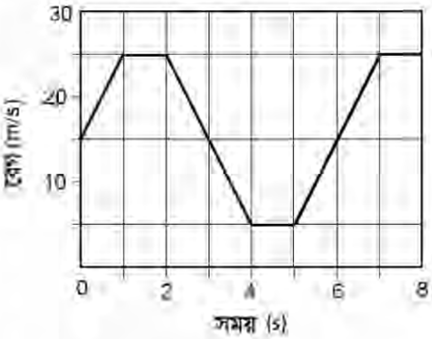

ছবি **3.20:** বেগ ও সময়ের একটি লেখচিত্র

5. **মেঝেতে রাখা একটি কাঠের টুকরোর ঘর্ষণ** সহগ μ এর মান 0.01, কাঠের ভর $10kg$ হলে সেটাকে নাড়াতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে? কাঠের উপর $100kg$ ভরের একটি পাথর রাখা হলে কতো বল প্রয়োগ করে নাড়ানো সম্ভব? মেঝে ঘর্ষণ হীন হলে কী হতো?

চতুর্থ অধ্যায়

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

(Work Power and Energy)

Issac Newton (1642-1727)

আইজাক নিউটন

আইজাক নিউটন ছিলেন একজন ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ এবং তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী হিসেবে স্মরণ করা হয়। তিনি বলবিদ্যা এবং মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন যেটি পরবর্তী তিনশত বৎসর গতিবিদ্যার সকল সমস্যার ব্যাখ্যা দেয়। শব্দ আর আলোক তত্ত্বেও তাঁর দক্ষতা ছিল এবং জার্মান গণিতবিদ লিবনিজের পাশাপাশি তিনিও গণিতের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ক্যালকুলাস উদ্ভাবন করেন। নিউটন ব্যবহারিক গবেষণাতেও পারদর্শী ছিলেন এবং প্রথম প্রতিফলন টেলিস্কোপ তৈরি করেছিলেন। তিনি একই সাথে একজন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন।

4.1 কাজ (Work)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজ শব্দটা অনেকভাবে ব্যবহার করি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কাজ কথাটার খুব সুনির্দিষ্ট একটা অর্থ আছে। কোনো বস্তুর ওপর যদি F বল প্রয়োগ করা হয় এবং বস্তুটি যদি F বলের দিকে s দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে ঐ বল দিয়ে করা কাজের পরিমাণ W

$$W = Fs$$

কাজের মাত্রা $\mathrm{ML^2T^{-2}}$

কাজের কোনো দিক নেই এটা স্কেলার রাশি এবং এর একক হচ্ছে $Joule$ সংক্ষেপে J অর্থাৎ $1N$ বল প্রয়োগ করে কোনো কিছুকে যদি বলের দিকে $1m$ দূরত্ব অতিক্রম করানো যায় তাহলে বলা হবে বলটি $1J$ কাজ করেছে।

তোমরা বিষয়টি হয়তো লক্ষ করেছ প্রত্যেকবার কাজ করার কথা বলার সময় আমরা বলছি "বল"টি কাজ করছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কাজ করি কিংবা একটা যন্ত্র কাজ করে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কিন্তু সব সময় "বল" কাজ করে– সেই বলটি হয়তো আমরা প্রয়োগ করি কিংবা কোনো যন্ত্র প্রয়োগ করে।

এবার কাজের আরো কিছু উদাহরণ দেখা যাক। কোনো একজন একটি ভর m কে F বল দিয়ে θ কোণে টেনে দিচ্ছে (ছবি 4.1)। যদি ভরটিকে s দূরত্ব টেনে নেয় কতটুকু কাজ করা হবে?

মানুষটি ভরটাকে F বল দিয়ে কোনাকুনি ভাবে টানছে, সমতলের সাথে θ কোণে, আমরা কাজের সংজ্ঞা সময় স্পষ্ট করে বলেছি বলের দিকে যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেই দূরত্বটুকু ব্যবহার করতে হবে। s দূরত্ব F বলের দিকে নয়, বলা যেতে পারে s এর একটা অংশ F বলের দিকে। s যেহেতু একটা ভেক্টর আমরা তার F বলের দিকের অংশটুকু বের করতে পারি সেটা হচ্ছে $s\cos\theta$

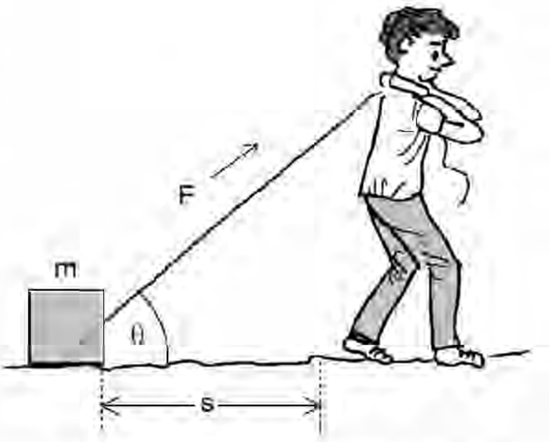

ছবি **4.1:** একজন মানুষ একটি ভরকে টেনে নিচ্ছে

কাজেই $W = Fs\ \cos\theta$

কাজেই মানুষটি যে বল প্রয়োগ করেছে সেই বল $Fs\ \cos\theta$ পরিমাণ কাজ করেছে। এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ করতে হবে। ভরটির একটা ওজন আছে, সেটাও বল, তার পরিমাণ mg এবং সেই বলটি নিচের দিকে কাজ করছে। এই বলটি কতটুকু কাজ করছে?

mg বলটি এবং s দূরত্বটি পরস্পরের সাথে 90° কোণ করে আছে কাজেই s দূরত্বের কোনো অংশ mg এর দিকে নেই। ($\cos 90^{\circ} = 0$) কাজেই mg বল দিয়ে করা কাজের পরিমাণ শূন্য! এটা মনে রাখা ভালো, সব সময়েই এটা সত্যি, যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয়েছে সরণ যদি তার সাথে লম্বভাবে অর্থাৎ 90^{0} কোণ করে হয় তাহলে কাজের পরিমাণ শূন্য অর্থাৎ সেই বল কোনো কাজ করে না! মনে রেখ একটা বস্তুর ওপর একই সাথে বেশ কয়েকটা বল প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং প্রত্যেকটা বলই আলাদা আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে পারে!

উদাহরণ **4.1:** একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটা বস্তুর ওপর F বল প্রয়োগ করার পর সেটি A থেকে B তে গিয়েছে (ছবি 4.2)। কোথায় কাজ হয়েছে কোথায় হয়নি বল।

উত্তর: (a) তে কাজ হয়েছে কারণ F বলের দিকে সরণ হয়েছে। (b) তে বল এবং সরণ বিপরীতমুখী কাজেই নিগেটিভ কাজ হয়েছে অর্থাৎ প্রয়োগ করা বল কাজ করেনি, প্রয়োগ করা বলের ওপর কাজ হয়েছে (c) তে কোনো কাজ হয়নি কারণ বল আর সরণ পরস্পরের ওপর লম্ব (d) F বল কাজ করেছে কারণ সরণের দিকে এই বলের একটা অংশ রয়েছে।

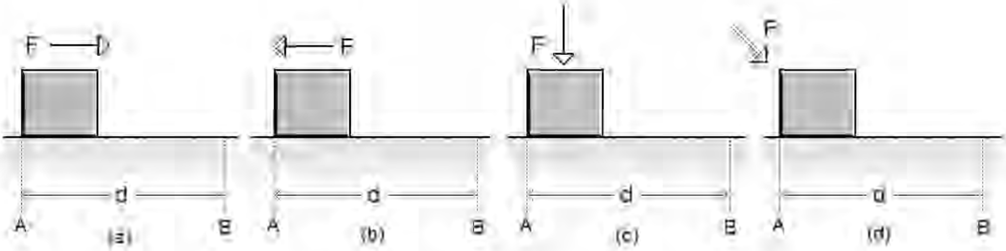

ছবি **4.2:** একটি ভর, তার উপর প্রযুক্ত বল F এবং সরণ d

উদাহরণ 4.2: পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে, কত কাজ হচ্ছে?

উত্তর: কোনো কাজই হচ্ছে না কারণ চাদের গতি মাধ্যাকর্ষণ বলের সাথে 90^0 কোণ করে থাকে।

উদাহরণ 4.3: ভার উত্তোলনকারী যখন একটি ভারী বারবেল উপরে তুলে ধরে রাখে (ছবি 4.3) তখন কোনো কাজ করা হচ্ছে না, তাহলে পরিশ্রম হয় কেন?

উত্তর: তার কারণ বারবেলটা একেবারে স্থির থাকে না, শরীরে, হাতে যত কমই হোক কম্পন হয়, ভারী বারবেল একটু নিচে নামে আবার উপরে তুলতে হয়– তাই প্রত্যেকবার সেই অল্প একটু উপরে তুলতে গিয়ে কাজ করতে হয়।

ছবি **4.3:** ভার উত্তোলনকারী

উদাহরণ 4.4: তোমার ভর $50\ kg$ তুমি 10 তালা বিল্ডিংয়ের উপরে উঠেছ, তুমি কত কাজ করেছ? (প্রতি তালার উচ্চতা $3m$)

উত্তর: তোমার ভর $50\ kg$ হলে ওজন $50\ \times 9.8 = 490\ N$ এই ওজন একটা বল, সেটা নিচের দিকে কাজ করছে। তুমি যদি উপরে উঠতে চাও তাহলে তোমাকে এই বলের সমান একটা বল উপরের দিকে প্রয়োগ করে নিজেকে উপরে তুলতে হবে।

কাজেই উপরের দিকে তোমার প্রয়োগ করা বল $490\ N$.
উপরে দিকে অতিক্রান্ত দূরত্ব: $10\ \times 3m = 30m$
কাজেই সেই কাজের পরিমাণ $490N\ \times 30m = 14700J = 14.7\ kJ$

উদাহরণ 4.5: একজন একটা $10\ kg$ ভরকে সোজাসুজি উপরে তুলেছে অন্য একজন ভরটিকে 45^0 কোণের একটা ঢালুতে রেখে টেনে $10\ m$ উপরে তুলল (ছবি 4.4)। কে কতটুকু কাজ করেছে?

উত্তর: $10\,kg$ ভরের ওজন $F = mg = 10\,kg \times 9.8m/s^2 = 980N$ (a) যদি এটাকে $10\,m$ উচ্চতে তুলতে হয় তাহলে উপরের দিকে $980N$ বল প্রয়োগ করতে হবে। কপি কলের মাধ্যমে একজন সেই $980N$ প্রয়োগ করে ভরটিকে উপরে তুলছে।

বল এবং সরণ একই দিকে কাজেই কাজ

$$W = F \times h = 980N \times 10m = 9800J$$

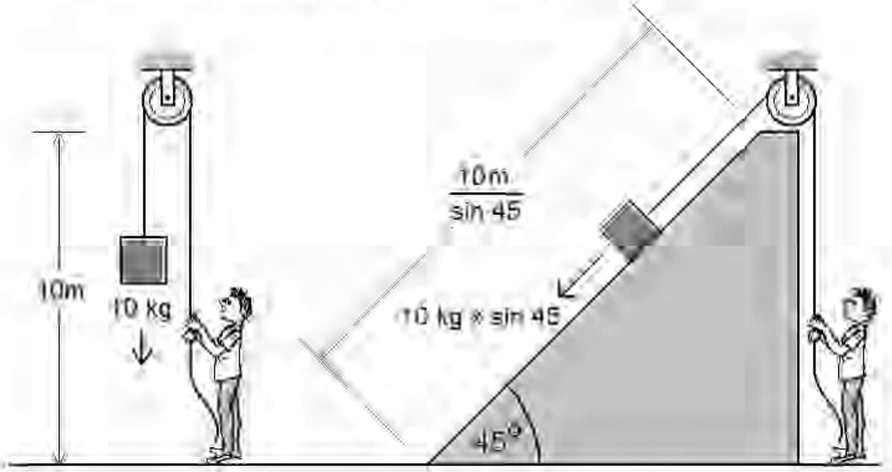

ছবি 4.4: খাড়াভাবে এবং 45° কোণে একটি ভরকে উপরে টেনে উপরে তোলা হচ্ছে

45°
কোণের ঢালুতে রাখা আছে কাজেই এটাকে টেনে তুলতে কম বল প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

$$F = mg\sin 45^\circ = 980N \times \sin 45^\circ N$$

বলের দিকে দূরত্ব হচ্ছে

$$S = \frac{10}{\sin 45^\circ} m$$

কাজেই কাজের পরিমাণ

$$W = F \times s \times \sin 45^\circ = 980N \times \frac{10}{\sin 45^\circ} \times \sin 45^\circ J = 9800J$$

অর্থাৎ একই পরিমাণ কাজ করা হয়েছে।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করছ ঢালুটা 45° না হয়ে অন্য যে কোনো কোণ হলেও একই উত্তর হতো। অর্থাৎ কাজের পরিমাণ কোন পথে উপরে তোলা হয়েছে সেটার ওপর নির্ভর করেনা, নির্ভর করে কতটুকু উপরে তোলা হয়েছে তার ওপর।

আমরা আগের অধ্যায়ে ঘর্ষণ বলের কথা পড়েছি। ঘর্ষণ বল কী পরিমাণ কাজ করে? ধরা যাক একটা বস্তুর ভর m এবং সেটার ওপর F বল প্রয়োগ করে d দূরত্ব নেয়া হলো, কাজেই F বল দ্বারা করা কাজ

$$W = Fd$$

কিন্তু এই সময়ে ঘর্ষণ বল f কাজ করছে উল্টো দিকে তাই সরণ বা অতিক্রান্ত দূরত্ব ঘটেছে ঘর্ষণ বল f এর বিপরীত দিকে। তাই ঘর্ষণ বল দিয়ে করা কাজ হচ্ছে

$$W = (-f)d = -fd$$

কাজ করার পরিমাণ নেগেটিভ। তাহলে আমরা দেখছি একটা বল ধনাত্মক বা পজিটিভ পরিমাণ কাজ করতে পারে, আবার ঋণাত্মক বা নিগেটিভ পরিমাণ কাজও করতে পারে? পজিটিভ এবং নিগেটিভ পরিমাণ কাজ করার অর্থ কী?

এই বিষয়টা বোঝার আগে আমাদের শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকতে হবে।

4.2 শক্তি (Energy)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা শক্তি শব্দটা অনেকভাবে ব্যবহার করি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষাতে শক্তি শব্দটার একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সাধারণ মুখের ভাষায় বল প্রয়োগ করা আর শক্তি প্রয়োগ করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এই দুটি বাক্যাংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বোঝায়। বল বলতে কী বোঝায় সেটা আমরা আগের অধ্যায়ে পড়ে এসেছি, এই অধ্যায়ে শক্তি বলতে কী বোঝায় সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শক্তি বলতে কী বোঝায় আমাদের সবার মাঝে তার একটা ভাসাভাসা ধারণা আছে, কারণ আমরা কথাবার্তায় বিদ্যুৎ শক্তি, তাপ শক্তির কথা বলে থাকি। মাঝে মাঝে আমরা রাসায়নিক শক্তি বা নিউক্লিয়ার শক্তির কথাও শুনে থাকি। আলোকে শক্তি হিসেবে সেভাবে বলা না হলেও আমরা অনুমান করতে পারি আলোও হচ্ছে এক ধরনের শক্তি। দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে শক্তিটার কথা খুব বেশি বলা হয় না– কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে অসংখ্যবার যে শক্তির কথা বলা হবে সেটা হচ্ছে গতি শক্তি! কাজেই আমাদের ধারণা হতে পারে প্রকৃতিতে বুঝি অনেক ধরনের শক্তি আছে, কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে সব শক্তিই কিন্তু এক এবং আমরা শুধু এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করি! তাহলে শক্তিটা কী?

শক্তি হচ্ছে কাজ করার ক্ষমতা! শুধু তাই না যখন কোনো বস্তুর ওপর কোনো বল প্রয়োগ করে ধনাত্মক কাজ করা হয় তখন সেই বলটি আসলে বস্তুটির মাঝে একটা শক্তি সৃষ্টি করে। বস্তুটির মাঝে যেটুকু শক্তি সৃষ্টি হয় বল প্রয়োগ করার সময় যে বল প্রয়োগ করছে তাকে ঠিক ততটুকু শক্তি দিতে হয়! দরকার হলে তুমি এই বাক্যটা আরো কয়েকবার পড়– কারণ এটা পদার্থবিজ্ঞানের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়!

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে তাহলে নিগেটিভ কাজ মানে কী? যখন কোনো বল কোনো কিছুর ওপর নিগেটিভ কাজ করে তখন বুঝতে হবে সেই বলটি বস্তুটির শক্তি সরিয়ে নিয়েছে! কিংবা যে বল প্রয়োগ করছে তার কোনো শক্তি দিতে হবে না উল্টো সে খানিকটা শক্তি পেয়ে যাবে! ঘর্ষণের সময় ঘর্ষণ বল নিগেটিভ কাজ করার অর্থ এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ঘর্ষণ বল বস্তুটার খানিকটা শক্তি নিয়ে নিচ্ছে (যেটা হয়তো তাপ শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে)। ধরা যাক একটা গাড়ি তোমার দিকে আসছে, তুমি গাড়িটাকে থামানোর জন্য উল্টোদিকে F বল প্রয়োগ করছ কিন্তু তারপরও গাড়িটা তোমাকে d দূরত্ব ঠেলে নিয়ে গেল। কাজেই গাড়িটা তোমার দেয়া F বলের উল্টোদিকে d দূরত্ব অতিক্রম করেছে। কাজের পরিমাণ $-Fd$, অর্থাৎ তুমি গাড়িটাকে শক্তি দাওনি, গাড়িটার শক্তি নিয়ে নিয়েছ। তুমি যদি বল প্রয়োগ না করতে তাহলে গতি শক্তি আরো বেশি হতো– তুমি শক্তিটা কমিয়ে দিয়েছ।

উদাহরণ 4.6: একটা পাথরের ওপর $100N$ বল প্রয়োগ করে $10m$ নিয়ে গেছ ঘর্ষণ বল যদি বিপরীত দিকে $10N$ হয় তাহলে তুমি কতটুকু কাজ করছ? ঘর্ষণ বল কতটুকু কাজ করেছে? (ছবি 4.5)

উত্তর: তুমি $W = F \times s = 100N \times 10m = 1000J = 1kJ$ কাজ করেছ।
ঘর্ষণ বল $W = f \times s = -10N \times 10m = -100J$ কাজ করেছে।

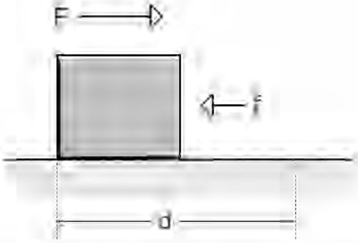

ছবি 4.5: একটি ভরের উপর বল প্রয়োগ করা হলে ঘর্ষণবল উল্টো দিকে কাজ করে।

তোমার কাজের কারণে পাথরটা শক্তি অর্জন করেছে।
ঘর্ষণ বলের কারণে শক্তি ক্ষয় হয়েছে, হয়তো তাপ সৃষ্টি হয়েছে।

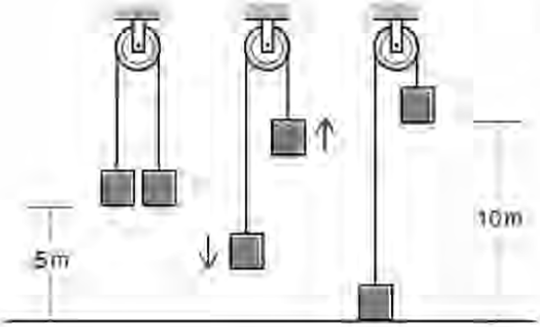

ছবি 4.6: কপিকলের দুই পাশে দুটি বস্তু ঝুলছে

উদাহরণ 4.7: একটি $10m$ উঁচু কপিকলের দুই পাশে $5m$ উঁচুতে $10kg$ ভরের দুটি বস্তু ঝুলছে (ছবি 4.6)। একটি বস্তু $5m$ নিচে মাটিতে নামার সময় অন্যটি $5m$ উপরে উঠে গেল। কোন ভরে কতটুকু কাজ হলো? (ধরে নাও পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে খুবই ধীরে ধীরে অর্থাৎ কোনো বেগ সৃষ্টি না করে)

উত্তর: দুটি বস্তুর উপরেই ওজনের সমান বল উপরের দিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

বাম দিকে ভরটি বলের দিকে উঠে গেছে কাজেই কাজের পরিমাণ

$$W = F \times s = 10 \times 9.8N \times 5m = 490J$$

কাজেই এই ভরটির ওপর কাজ করা হয়েছে এবং ভরটি শক্তি অর্জন করেছে।

ডান দিকের ভরটি নিচে, অর্থাৎ বলের বিপরীত দিকে নেমে গেছে

$$W = -F \times s = -10 \times 9.8N \times 5m = -490J$$

অর্থাৎ এই ভরটি থেকে $490J$ শক্তি নিয়ে নেয়া হচ্ছে। বুঝতেই পাছ ডান দিকের ভরটি থেকে $490J$ শক্তি নিয়ে বাম দিকের ভরটিতে দেয়া হয়েছে।

4.2.1: গতি শক্তি (Kinetic Energy)

শক্তির সবচেয়ে সহজ ইদাহরণ হচ্ছে গতি শক্তি। সাধারণভাবে বলা যায় গতির জন্য যে শক্তি সেটাই গতি শক্তি। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় d ভরের একটি বস্তু যদি v গতিতে যায় তাহলে তার গতি শক্তি E

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

শক্তির মাত্রা ML^2T^{-2}

গতি শক্তির একক আর কাজের একক একই, অর্থাৎ জুল (J)

উদাহরণ 4.8: $10kg$ ভরের একটা স্থির বস্তুর ওপর $10s$ ব্যাপী $10N$ বল প্রয়োগ করা হয়েছে (a) বস্তুটির গতি শক্তি কত? (b) $20s$ পরে গতি শক্তি কত? (c) যদি পুরো $20s$ বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে গতি শক্তি কত?

উত্তর: $10N$ বল প্রয়োগ করলে ত্বরণ :

$$a = \frac{F}{m} = \frac{10N}{10kg} = 1m/s^2$$

কাজেই $10s$ পরে বেগ

$$v = at = \frac{1m}{s^2} \times 10s = 10m/s$$

(a) কাজেই গতি শক্তি

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^2 J = 500J$$

(b) $10s$ পর্যন্ত ত্বরণ হবে এর পরে ত্বরণ নেই বলে বেগ অপরিবর্তিত কাজেই $20s$ পরে গতি শক্তি একই থাকবে।

(c) পুরো $20s$ বল প্রয়োগ করা হলে $v = at = 1m/s^2 \times 20s = 20m/s$
কাজেই গতি শক্তি

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 20^2 J = 2000J$$

উদাহরণ **4.9:** $10kg$ ভরের একটি বস্তুকে বল প্রয়োগ করে গতিশীল করায় তার গতি শক্তি হয়েছে $80J$, বস্তুটির বেগ কত?

উত্তর: গতিশক্তি

$$\frac{1}{2}mv^2 = 80J$$
$$v^2 = \frac{2 \times 80J}{m} = \frac{160m^2}{10s^2}$$
$$v = 4m/s$$

আমরা আগে বলেছি কাজ করার ক্ষমতা হচ্ছে শক্তি। আমরা সবাই জানি কোনো বস্তু গতিশীল হলে সেটা অন্য বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে সেটাকেও গতিশীল করে খানিকটা দূরত্ব ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। অন্য বস্তুকে গতিশীল করে ফেলার অর্থ নিশ্চয়ই সেখানে বল প্রয়োগ হয়েছে এবং সেই বলের জন্য খানিকটা দূরত্ব যাওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই সেখানে কাজ হয়েছে! কাজেই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি গতির জন্য বস্তুর যে শক্তি হয় সেটা নিশ্চয়ই এক ধরনের শক্তি বা গতি শক্তি। আমরা রাস্তাঘাটে যে ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটতে থাকি সেখানে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার প্রধান কারণ এই গতি শক্তি। একটা বাস-ট্রাক বা গাড়ি যখন প্রচ= বেগে ছুটতে থাকে তখন তার অনেক বড় গতি শক্তি থাকে। অ্যাকসিডেন্টের সময় এই পুরো শক্তিটা দিয়ে গাড়ি ভেঙেচুরে যায়, প্রচ= ধাক্কায় মানুষ মারা যায়।

গতি শক্তিতে v এর বর্গ রয়েছে যার অর্থ যদি কোন গাড়ির বেগ দ্বিগুণ করে ফেলা হয় তাহলে শক্তির পরিমাণ কিন্তু দ্বিগুণ হয় না, চারগুণ হয়। এজন্য গাড়ির গতি বাড়ানো এত বিপজ্জনক– বিপদটি বর্গ হিসেবে বাড়ে।

এবারে আমরা দেখি কেন কোন বস্তুতে কাজ করা হলে সেখানে শক্তি সৃষ্টি হয়। ধরা যাক F বল m ভরের ওপর প্রয়োগ করে d দূরত্ব নিয়ে গেল। অর্থাৎ কাজের পরিমাণ :

$$W = Fd$$

এখানে $F = ma$

কাজেই $W = mad$

বল প্রয়োগ করার আগে যদি m ভরটি স্থির থাকে তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব :

$$d = \frac{1}{2}at^2$$

কাজেই $W = \frac{1}{2}ma^2t^2$

কিন্তু আমরা জানি $v = at$

কাজেই $W = \frac{1}{2}mv^2$

অর্থাৎ বলটি যে পরিমাণ কাজ করেছে বস্তুটির ঠিক সেই পরিমাণ গতি শক্তি হয়েছে!

উদাহরণ 4.10: এখানে আমরা ধরে নিয়েছি শুরুতে বস্তুটি স্থির ছিল। আমরা যদি ধরে নিই শুরুতে বস্তুটির আদিবেগ u তাহলে দেখাতে পারব F বল প্রয়োগ করে d দূরত্ব নিয়ে গেলে যেটুকু গতি শক্তি বেড়ে যাবে সেটা হচ্ছে

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2$$

এটা দেখাও।

উত্তর: গতি শক্তির সূত্রগুলো বের করার সময় আমরা দেখেছি

$$v^2 = u^2 + 2as$$

দুই পাশে $\frac{1}{2}m$ দিয়ে গুণ দাও

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mu^2 + mas$$

এখানে $ma = F$ লিখ

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mu^2 + Fs$$

কিংবা

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = Fs$$

কিন্তু

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2$$

কাজেই $\Delta E = Fs$

আমরা দেখেছি বল প্রয়োগ করা হলে ভর বেগের পরিবর্তন হয়। যদি এক বা একাধিক বস্তু গতিশীল থাকে এবং বাইরে থেকে যদি তাদের ওপর কোনো বল প্রয়োগ করা না হয় তাহলে তাদের সম্মিলিত ভর বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না। যদি নিজেদের মাঝে ধাক্কা ধাক্কি হয় তাহলে একটির ভরবেগ বেড়ে যেতে পারে অন্যটির কমে যেতে পারে কিন্তু সম্মিলিতভাবে তাদের ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হবে না। এটার নাম ভরবেগের নিত্যতা (momentum conservation) ।

ভরবেগের জন্য যেটা সত্যি গতিশক্তির জন্যও সেটা সত্যি। যদি কোথাও এক বা একাধিক কোনো বস্তু গতিশীল থাকে তাহলে তাদের একটা সম্মিলিত গতি শক্তি থাকবে। যদি বাইরে থেকে তাদের ওপর কোনো বল প্রয়োগ করা না হয় তাহলে তাদের এই সম্মিলিত গতিশক্তির কোনো পরিবর্তন হবে না। একটির সাথে অন্যটির ধাক্কা ধাক্কি হয়ে নিজেদের কোনোটির গতি শক্তি বেড়ে যেতে পারে কোনোটির কমে যেতে পারে কিন্তু সম্মিলিত গতিশক্তি অপরিবর্তিত থাকবে। এটার নাম শক্তির নিত্যতা (energy conservation)

4.3 সংঘর্ষ (Collision)

আমরা যদি উপরের এই দুটো নিত্যতার কথা মনে রাখি তাহলে পদার্থবিজ্ঞানের "সংঘর্ষ" বলে অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারব।

মনে করি একটি সমতলে m_1 এবং m_2 ভর u_1 এবং u_2 বেগে সরল রেখায় যাচেছ। তাদের বেগের ভিন্নতার কারণে ধরা যাক তাদের মাঝে সংঘর্ষ হলো, এবং সে কারণে তাদের বেগ পাল্টে গেল, m_1 ভরটির বেগ এখন v_1 এবং m_2 ভরটির বেগ v_2। আমরা সংঘর্ষের পর বেগ v_1 এবং v_2 কত সেটা বের করতে চাই।

একটুখানি এলজেবরা করলে আমরা খুব মজার কিছু ফলাফল পাব, চেষ্টা করে দেখা যাক।

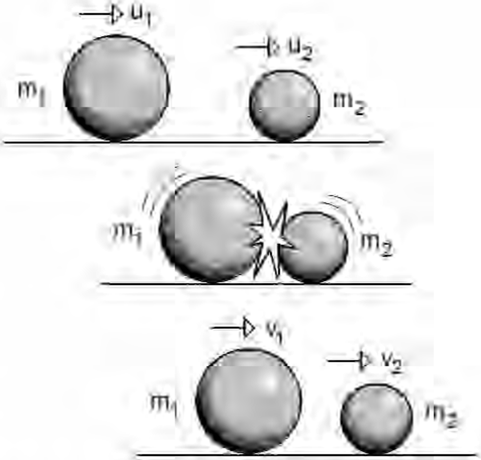

ছবি 4.7: m_1 এবং m_2 পরস্পরকে আঘাত করার পর তাদের বেগ পরিবর্তিত হয়ে v_1 এবং v_2 হয়েছে।

সংঘর্ষের আগে ভর দুটির সম্মিলিত ভরবেগ $m_1u_1 + m_2u_2$
সংঘর্ষের পর ভর দুটির সম্মিলিত ভরবেগ $m_1v_1 + m_2v_2$
কাজেই ভরবেগের নিত্যতার কারনে $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$ ...... (1)

ঠিক সে রকম সংঘর্ষের আগে সম্মিলিত গতি শক্তি $\frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2$
সংঘর্ষের পর সম্মিলিত গতি শক্তি $\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$
গতিশক্তির নিত্যতার কারনে $\frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$ ......(2)

আমরা সমীকরণ (1) কে একটু অন্যভাবে লিখি-

$$m_1u_1 - m_1v_1 = m_2v_2 - m_2u_2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

কিংবা $m_1(u_1 - v_1) = m_2(u_2 - v_2)$ .... (4)

একইভাবে সমীকরণ (2) কে অন্যভাবে লিখি:

$$\frac{1}{2}m_1u_1^2 - \frac{1}{2}m_1v_1^2 = m_2v_2^2 - \frac{1}{2}m_2u_2^2$$

কিংবা

$$\frac{1}{2}m_1(u_1^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}m_2(v_2^2 - u_2^2) \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (5)$$

অর্থাৎ

$$\frac{1}{2}m_1(u_1 + v_1)(u_1 - v_1) = \frac{1}{2}m_2(v_2 + u_2)(v_2 - u_2) \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (6)$$

এখন (6) কে (4) দিয়ে ভাগ দিই:

$$u_1 + v_1 = v_2 + u_2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (7)$$

(7) কে m_2 দিয়ে গুণ করে সেখান থেকে (3) বিয়োগ করলে পাব

$$\begin{array}{c} m_2u_1 + m_2v_1 = m_2v_2 + m_2u_2 \\ m_1u_1 - m_1v_1 = m_2v_2 - m_2u_2 \\ \hline (m_2 - m_1)u_1 + (m_1 + m_2)v_1 = 2m_2u_2 \end{array}$$

এখান থেকে v_1 বের করা যায়।

$$v_1 = \frac{2m_2u_2 + (m_1 - m_2)u_1}{m_1 + m_2}$$

একই ভাবে (7) কে m_1 দিয়ে গুণ দিয়ে (3) এর সাথে যোগ করি

$$\begin{array}{c} m_1u_1 + m_1v_1 = m_1v_2 + m_1u_2 \\ m_1u_1 - m_1v_1 = m_2v_2 - m_2u_2 \\ \hline 2m_1u_1 = (m_1 + m_2)v_2 - (m_2 - m_1)u_2 \end{array}$$

কাজেই এখান থেকে আমরা v_2 বের করতে পারি

$$v_2 = \frac{2m_1u_1 + (m_2 - m_1)u_2}{m_1 + m_2}$$

যেহেতু সূত্রগুলো বের হয়ে গেছে এখন এখান থেকে অত্যন্ত মজার কিছু ফলাফল আমরা পেতে পারি।

সমান ভরের গতিশীল বস্তুর সাথে স্থির বস্তুর সংঘর্ষ :

$m_1 = m_2$ অর্থাৎ দুটির ভর সমান।

m_1 স্থির (অর্থাৎ $u_1 = 0$) সংঘর্ষের আগে m_1 এর বেগ0 m_2 এর বেগ u_2

সংঘর্ষের পর m_1 এর বেগ বের করার জন্যে v_1 এ $m_2 = m_1$ বসিয়ে:

$$v_1 = \frac{2m_1u_2 + (m_1 - m_1)u_1}{m_1 + m_1} = u_2$$

সংঘর্ষের পর m_2 এর বেগে $m_2 = m_1$ এবং $u_1 = 0$ বসিয়ে:

$$v_2 = \frac{2m_1 \times 0 + (m_1 - m_1)u_2}{m_2 + m_2} = 0$$

অর্থাৎ যদি স্থির একটা মার্বেলকে দ্বিতীয় অন্য একটা (সমান ভরের) মার্বেল দিয়ে ঠোকা দেয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় মার্বেলটা স্থির হয়ে যাবে, প্রথমটা সেই বেগ নিয়ে বের হয়ে যাবে। বিষয়টা সত্যি কি না তোমরা এখনই পরীক্ষা করে দেখতে পার।

গতিশীল হালকা বস্তুর সাথে স্থির ভারী বস্তুর সংঘর্ষ :

$m_1 \gg m_2$অর্থাৎ m_1এর ভর m_2 থেকে এত বেশি যে $\frac{m_2}{m_1}$ কে শূন্য ধরা যেতে পারে।

m_1 স্থির (অর্থাৎ $u_1 = 0$)

v_1 এর সূত্রটির ডান পাশে উপরে ও নিচে m_1, দিয়ে ভাগ দাও এবং তারপর $\frac{m_2}{m_1} = 0$ বসাও

$$v_1 = \frac{2\frac{m_2}{m_1}u_2 + \left(1 - \frac{m_2}{m_1}\right)u_1}{1 + \frac{m_2}{m_1}} = \frac{2 \times 0 \times u_2 + (1 - 0) \times 0}{1 + 0} = 0$$

অর্থাৎ ভারী বস্তুটি স্থির ছিল সেটা স্থিরই থাকবে।

এবারে v_2 এর সূত্রটির উপরে নিচে m_1 দিয়ে ভাগ দাও এবং $\frac{m_2}{m_1} = 0$ বসাও

$$v_2 = \frac{2u_1 + \left(\frac{m_2}{m_1} - 1\right)u_2}{1 + \frac{m_2}{m_1}} = \frac{2 \times 0 + (0 - 1)u_2}{1 + 0} = -u_2$$

অর্থাৎ m_2 ভরটি যে বেগে m_1 এ আঘাত করেছে সেই বেগে উল্টো দিকে ফিরে আসবে। তুমি ছোট একটা টেনিস বল দাড়িয়ে থাকা বিশাল একটা ট্রাকের গায়ে ছুড়ে মারো, দেখবে টেনিস বলটা ধাক্কা খেয়ে ঠিক তোমার দিকে ফিরে আসবে।

গতিশীল ভারী বস্তুর সাথে হালকা স্থির বস্তুর সংঘর্ষ :

$m_1 \gg m_2$ অর্থাৎ m_1 এর ভর m_2 থেকে এত বেশি যে $\frac{m_2}{m_1}$ কে শূন্য ধরা যেতে পারে।

m_2 স্থির (অর্থাৎ $u_2 = 0$)

আবার v_1 ও v_2 এর সূত্রগুলোর উপরে নিচে m_1 দিয়ে ভাগ দাও এবং $\frac{m_2}{m_1} = 0$ বসাও

$$v_1 = \frac{2\frac{m_2}{m_1}u_2 + \left(1 - \frac{m_2}{m_1}\right)u_1}{1 + \frac{m_2}{m_1}} = \frac{2 \times 0 \times 0 + (1 - 0) \times u_1}{1 + 0} = u_1$$

$$v_2 = \frac{2u_1 + \left(\frac{m_2}{m_1} - 1\right)u_2}{1 + \frac{m_2}{m_1}} = \frac{2u_1 + (0 - 1) \times 0}{1 + 0} = 2u_1$$

অর্থাৎ বিশাল একটা ট্রাক (m_1) যদি দাঁড়িয়ে থাকা ছোট একটা সাইকেলকে (m_2) আঘাত করে তাহলে ট্রাকের গতির কোনো পরিবর্তন হবে না, কিন্তু সাইকেলটা ট্রাকের গতির দ্বিগুণ গতিতে ছিটকে যাবে!

আমরা মাত্র তিনটি উদাহরণ দিয়েছি– তোমরা এ রকম আরো নানা ধরনের উদাহরণ নিতে পারো, একটা ভারী এবং একটা হালকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে কোনটার ভরবেগের কত পরিবর্তন হয় বের করতে পায়, সেখান থেকে কোনটার বেশি ক্ষতি হয় সেটাও তুমি অনুমান করতে পারবে।

উদাহরণ 4.11: $50,000kg$ ভরের একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, তুমি এবং তোমার সাইকেলের ভর $50kg$, তুমি $30km/hour$ বেগে ট্রাকটিকে আঘাত করেছ। আগাত দেয়ার পর কার বেগ কত হবে?

উত্তরঃ ট্রাকের ভর $m_2 = 50,000kg$ এবং সাইকেলের ভর $m_1 = 50kg$ হলে

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{50}{50,000} = 0.001$$

এটাকে শূন্য ধরে নেয়া যেতে পারে। কাজেই গতিশীল হালকা বস্তুর সাথে স্থির ভারী বস্তুর সংঘর্ষের উদাহরণ থেকে বলতে পারি ট্রাকের বেগ $v_1 = 0\,m/s$ এবং সাইকেলের বেগ $v_2 = -30\,km/hour$

উদাহরণ 4.12: $60,000kg$ ভরের একটা ট্রাক $60km/hour$ বেগে যেতে যেতে $60\,kg$ ভরের একটা সাইকেলকে ধাক্কা দিল। সংঘর্ষের পর কার বেগ কত?

উত্তরঃ ধরা যাক ট্রাকের ভর m_1এবং সাইকেলের ভর m_2 কাজেই

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{60}{60,000} = 0.001$$

এটাকে শূন্য ধরা যায়।

গতিশীল ভারী বস্তুর সাথে স্থির হালকা বস্তুর সংঘর্ষের উদাহরণ থেকে বলতে পারি সংঘর্ষের পর ট্রাকের গতিবেগ অপরিবর্তিত, $60km/hour$, সাইকেলের বেগ

$$2u_1 = 2 \times 60km/hour = \ 120km/hour$$

উদাহরণ 4.13: $1000kg$ ভরের একটা গাড়ি এবং $50,000kg$ ভরের একটা ট্রাক $60km/hour$ বেগে পরস্পরকে মুখোমুখি ধাক্কা দিল। সংঘর্ষের পর কার গতিবেগ কত হবে?

উত্তরঃ ট্রাকের ভর $m_1 = 50,000kg$, বেগ

$$u_1 = \frac{60 \times 1000m}{60 \times 60\ s} = 16.67\ m/s$$

গাড়ির ভর $m_2 = 1000kg$, বেগ
$u_2 = -u_1 = -16.67m/s$ যেহেতু বিপরীত দিক থেকে আসছে তাই নিগেটিভ ধরে নেয়া হল।

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{1000}{50,000} = 0.02$$

এটি খুব ছোট নয়। কাজেই এটাকে শূন্য না ধরতে পারব না।

$$v_1 = \frac{2m_2u_2 + (m_1 - m_2)u_1}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{2 \times 1000 \times (-16.67) + (50,000 - 1000) \times 16.67}{50,000 + 1000} m/s$$

$$v_1 = 15.36 m/s$$

সংঘর্ষের পর ট্রাকের গতিবেগ খুব বেশি পরিবর্তিত হবে না।

$$v_2 = \frac{2m_1u_1 + (m_2 - m_1)u_2}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{2 \times 50,000 \times 16.67 + (1000 - 50,000) \times (-16.67)}{50,000 + 1000} m/s$$

$$v_2 = 48.70\ m/s$$

অর্থাৎ গাড়িটির বেগ $-16.67m/s$ থেকে পরিবর্তিত হয়ে $48.70\ m/s$ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ধাক্কা খেয়ে বিপরীত দিকে প্রকৃত বেগের প্রায় তিন গুণ বেগে ছুটে যাবে।

এই বিশাল শক্তি আসলে ছোট গাড়িটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। অর্থাৎ মুখোমুখি সংঘর্ষে বড় ট্রাকের কোনো ক্ষতি হয় না, ছোট গাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

4.4 বিভব শক্তি (Potential Energy)

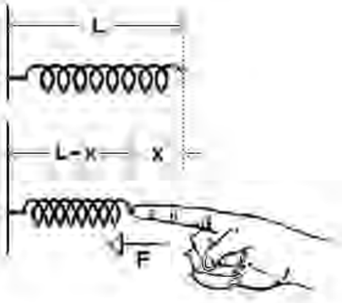

ছবি **4.8:** স্প্রিংয়ের স্থিরাবস্থা এবং বল প্রয়োগ করে সংকুচিত করা

কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যখন কোনো বল কোনো কিছুর ওপর পজিটিভ কাজ করে তখন সেখানে শক্তির সৃষ্টি হয়। গতি শক্তি সম্পর্কে বলার সময় আমরা তার একটা উদাহরণও দিয়েছিলাম, দেখিয়েছিলাম একটা বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করে সেটাকে খানিকটা দূরত্ব নিয়ে গেলে গতি শক্তি $\frac{1}{2}mv^2$ বেড়ে যায়।

এবারে এমন একটা উদাহরণ দেয়া হবে, যেখানে বল প্রয়োগ করে খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করার পরও কোনো গতিশক্তি তৈরি হবে না। মনে কর টেবিলে একটা স্প্রিং 4.8 ছবিতে দেখানো উপায়ে রাখা আছে, তুমি স্প্রিংয়ের খোলা মাথায় আঙুল দিয়ে F বল প্রয়োগ করে স্প্রিংটাকে x দূরত্বে সংকুচিত করে দিয়েছ। এ রকম অবস্থায় তোমার হাত বা স্প্রিং কোনোটাই গতিশীল না তাই কোথাও কোনো গতি শক্তি নেই! যেহেতু যেদিকে F বল প্রয়োগ করা হয়েছে অতিক্রান্ত দূরত্বও x সেই দিকে তাই কাজটি পজিটিভ, আমাদের কাজের সংজ্ঞা অনুযায়ী এখানে শক্তি-সৃষ্টি হওয়ার কথা– কিন্তু সেই শক্তিটি কোথায়? কোনো কিছু গতিশীল নয় তাই এখানে নিশ্চিত ভাবে কোনো গতিশক্তি নেই।

আমরা যারা স্প্রিং ব্যবহার করেছি তারা অনুমান করতে পারছি যে সংকুচিত স্প্রিংয়ের ভেতর নিশ্চয়ই শক্তিটুকু লুকিয়ে রয়েছে। কারণ আমরা জানি সংকুচিত স্প্রিংটার সামনে একটা m ভরের বস্তু রেখে স্প্রিংটা ছেড়ে দিলে স্প্রিংটা ভরটার ওপর বল প্রয়োগ করে একটা দূরত্ব অতিক্রম করাতে পারত যার অর্থ কাজ করাতে পারত। অর্থাৎ এটি একটি শক্তি, গতিশক্তি না হলেও এটি অন্য এক ধরনের শক্তি। এই ধরনের সঞ্চিত শক্তিকে বলে বিভব শক্তি (potential energy)।

আমরা ইচ্ছে করলে বিভব শক্তির পরিমাণটাও বের করতে পারব। বল এবং দূরত্বের গুণফল হচ্ছে কাজ, আঙ্গুল দিয়ে যেটুকু বল দেয়া হয়েছে সেটা যদি সব সময় সমান হতো তাহলে কাজটা সহজ হতো, কিন্তু আমরা জানি স্প্রিংয়ের বেলায় সেটা সত্যি না। স্প্রিং যে বল প্রয়োগ করে তার পরিমাণ হচ্ছে

$$F = -kx$$

অর্থাৎ x বেশি হলে F এর মান বেশি, x কম হলে F এর মান কম। (মাইনাস সাইন থাকার কারণে আমরা বুঝতে পারছি যেদিকে সংকুচিত করা হয় বলটা তার উল্টোদিকে কাজ করে।) যেহেতু বলটা সব সময় সমান নয় তাই আমরা প্রথমে একটা গড় (average) বল F_{av} ধরে নিয়ে কাজের পরিমাণটা বের করতে পারি। যেহেতু যেদিকে F বল প্রয়োগ করা হয়েছে অতিক্রান্ত দূরত্ব x সেই দিকে তাই কাজ W পজিটিভ। যদি আমরা x_0 দূরত্ব পর্যন্ত সংকোচন করি তাহলে

$$F_{av} = \frac{0 - kx_0}{2} = -\frac{1}{2}kx_0$$

সংকোচন $-x_0$

$$W = F_{av}(-x_0) = \left(-\frac{1}{2}kx_0\right)(-x_0)$$

$$W = \frac{1}{2}kx_0^2$$

যদি স্প্রিংটাকে x_0 দূরত্ব সংকোচন না করে স্প্রিংটাকে x_0 দূরত্ব টেনে ধরতাম তাহলে বল এবং সরণ দুটিই দিক পরিবর্তন করত তাই গুণফল আবার পজিটিভ হতো অর্থাৎ একই উত্তর পেতাম অর্থাৎ একই মান পেতাম। এখানে উল্লেখ করা দরকার গড় বল বের করে আমরা সঠিক ফলাফল পাই কারণ F বলটি x এর সাথে সমহারে পরিবর্তিত হয় (Linear)। সমহারে ত্বরণের বেগের বেলাতেও আমরা আগে এই বিষয়টি একবার দেখেছিলাম (উদাহরণ 2.16)।

উদাহরণ 4.14: $10\ kg$ ভরের একটা বস্তু $10\ m/s$ বেগে একটা স্প্রিংয়ের ওপর পড়ল। স্প্রিং ধ্রুবক $k = 100{,}000 J/m^2$ সেটি কতটুকু সংকুচিত হবে?

উত্তর: বস্তুটির গতি শক্তি

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^2 J = 500J$$

এই শক্তিটুকু স্প্রিংটাকে সংকুচিত করবে অর্থাৎ

$$\frac{1}{2}kx^2 = 500J$$

কাজেই

$$x^2 = \frac{2 \times 500}{100,000} m^2 = \frac{1}{100} m^2$$

$$x = 0.1m$$

আমরা যখন কোনো কিছুকে উপরে তুলি তখনো সেটা বিভব শক্তি অর্জন করে। এক টুকরো পাথর ওপর থেকে ছেড়ে দিলে সেটা নিচে নামার সময় তার গতি বাড়তে থাকে তাই সেটার মাঝে গতি শক্তির জন্ম হয়। এটি সম্ভব হয় কারণ পাথরটা যখন উপরে ছিল তখন এই "উপরে" অবস্থানের জন্য তার মাঝে এক ধরনের বিভব শক্তি জমা হয়েছিল। একটা পাথরকে উপরে তোলা হলে তার ভেতরে কী পরিমাণ বিভব শক্তি জমা হয় এখন সেটাও আমরা বের করতে পারি। বুঝতেই পারছ একটা বস্তুকে উপরে তুলতে হলে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটাই বিভব শক্তি হিসেবে পাথরের মাঝে জমা হয়ে যাবে। কাজের পরিমাণ W হলে

$$W = Fh$$

এখানে F হচ্ছে প্রযুক্ত বল এবং h হচ্ছে উচ্চতা। F বলটি আমাদের প্রয়োগ করতে হয় উপরের দিকে এবং অতিক্রান্ত দূরত্বও উপরের দিকে, কাজেই W পজিটিভ। উপরে তোলার জন্য যে বল প্রয়োগ করতে হয় তার মান স্প্রিংয়ের বলের মতো পরিবর্তন হয় না এবং এই বলটি পাথরটির ওজনের সমান। পাথরটির ওজন mg হলে

$$F = mg$$

এবং

$$W = mgh$$

মনে রাখতে হবে, পাথরটির ওজন একটি বল এবং সেটি নিচের দিকে কাজ করে। পাথরটাকে উপরে তুলতে হলে এই ওজনের সমান একটা বল আমাদের উপরের দিকে প্রয়োগ করতে হয়।

m ভরের একটা পাথরকে h উচ্চতায় তুলে তার ভিতরে বিভব শক্তি সৃষ্টি করে যদি পাথরটাকে ছেড়ে দিই তাহলে সেটা যখন নিচের দিকে h দূরত্ব নেমে আসবে তখন তার ভেতরে কী পরিমাণ গতি শক্তি জন্ম নেবে?

শক্তি অবিনশ্বর, তাই তার বিভব শক্তির পুরোটুকুই গতি শক্তিতে পরিণত হবে। আমরা জানি গতি শক্তি হচ্ছে $\frac{1}{2}mv^2$ তাই আমরা লিখতে পারি :

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$$
$$v^2 = 2gh$$

সত্যি কথা বলতে কী আমরা পড়ন্ত বস্তুর সমীকরণ বের করার সময় হুবহু এই সূত্রটি ইতোমধ্যে একবার বের করেছিলাম! শক্তির ধারণা দিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ অন্যভাবে আমরা আবার একই সূত্র বের করেছি!

উদাহরণ 4.15: $10kg$ ভরের একটা বস্তুকে $100m/s$ বেগে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে এটা কত উপরে উঠবে?

উত্তর: এটি আগে গতি সূত্র দিয়ে করা হয়েছে। এখন শক্তির রূপান্তর দিয়ে করা যেতে পারে।
গতিশক্তি :

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 100^2 = 50{,}000J$$

বস্তুটি যখন h উচ্চতায় পৌঁছাবে তখন যদি পুরো গতিশক্তিটি বিভব শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে,

$$mgh = 50{,}000J$$

$$h = \frac{50{,}000J}{mg} = \frac{50{,}000}{10 \times 9.8}m = 510m$$

তোমাদের বোঝানোর জন্য এখানে $10kg$ ভর কথাটি বলা হয়েছে। এটা কিন্তু ভরের উপর নির্ভর করে না। যেকোন ভরকে $100m/s$ বেগে উপরে ছুড়ে দিলে আমরা এই উত্তর পাব।

উদাহরণ 4.16: $5kg$ ভরের একটা বস্তুকে $50m/s$ বেগে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে কোন উচ্চতায় এর বিভব শক্তি এবং গতি শক্তি সমান হবে?

উত্তর: বস্তুটির প্রাথমিক গতি শক্তি

$$T_0 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 50^2 J = 6{,}250J$$

যখন গতি শক্তি বিভব শক্তির সমান হবে তখন সেই h উচ্চতায় আমরা বলতে পারি

গতি শক্তি = বিভব শক্তি
গতি শক্তি + বিভব শক্তি = প্রাথমিক গতি শক্তি
বিভব শক্তি = গতি শক্তি = প্রাথমিক গতি শক্তি/ 2

$$mgh = \frac{6250J}{2}$$

$$h = \frac{6250J}{2 \times mg} = \frac{6250}{2 \times 5 \times 9.8} m = 63.78m$$

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করছ এই সমস্যাটিও আসলে ভরের মানের উপর নির্ভর করে না।

4.5 শক্তির রূপান্তর (Transformation of Energy)

শক্তি অবিনশ্বর এর কোনো ক্ষয় নেই, এটি শুধুমাত্র একটি রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন হয়। একটা পাথর উপরে তুললে তার ভেতরে এক ধরনের বিভব শক্তির জন্ম হয়, পাথরটা ছেড়ে দিলে বিভব শক্তি

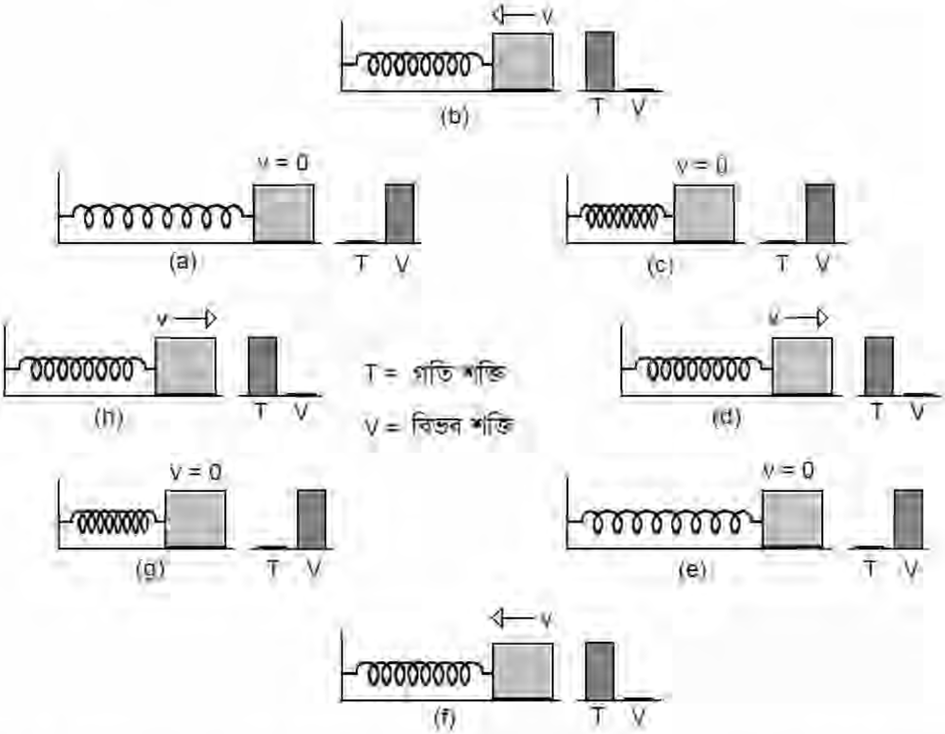

ছবি 4.9: একটি ভরসংযুক্ত স্প্রীং সংকুচিত এবং প্রসারিত হচ্ছে, গতি শক্তি এবং বিভব শক্তির মাঝে শক্তি বিনিময় হচ্ছে

কমতে থাকে এবং গতি শক্তি বাড়তে থাকে। মাটি স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে পুরো শক্তিটাই গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মাটিকে স্পর্শ করার পর পাথরটি যখন থেমে যায় তখন তার ভেতরে বিভবশক্তিও থাকে না গতি শক্তিও থাকে না তাহলে শক্তিটুকু কোথায় যায়?

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ পাথরটা যখন মেঝেতে আঘাত করে তখন সেটি শব্দ করে, যেখানে আঘাত করেছে সেখানে তাপের সৃষ্টি করে অর্থাৎ গতিশক্তিটুকু শব্দ শক্তি বা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বিভব শক্তি এবং গতি শক্তির এক ধরনের শক্তি থেকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরের উদাহরণটি খুব চমকপ্রদ কারণ ঠিক ঠিকভাবে ব্যবস্থা করা হলে এটি একটি থেকে অন্যটিতে রূপান্তরিত হয়ে শেষ হয়ে যায় না। বিভব শক্তি থেকে গতি শক্তি আবার গতি শক্তি থেকে বিভব শক্তি এই রূপান্তর

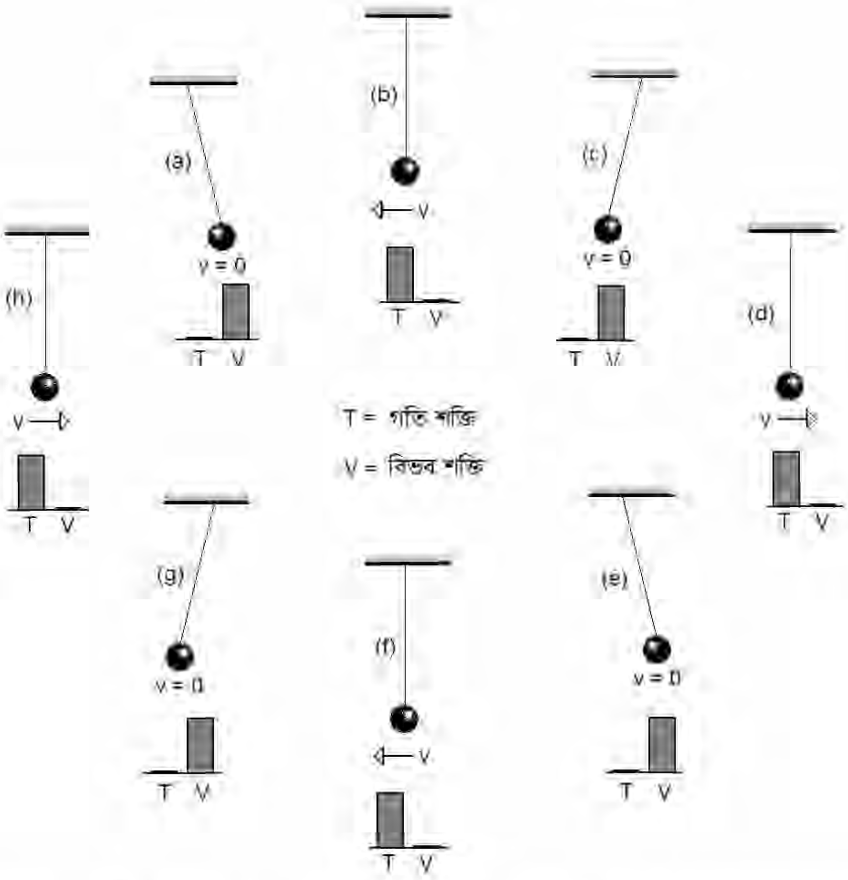

ছবি **4.10:** একটি পেন্ডুলাম দুলছে, মোট শক্তি গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির মাঝে স্থান বদল করছে।

প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। আমরা এর মাঝেই তার একটি উদাহরণ দেখেছি, স্প্রিংয়ের সাথে একটি ভরকে জুড়ে দেয়া। ছবি 4.9 এ কীভাবে ভরের গতি শক্তি এবং স্প্রিংয়ের বিভব শক্তি একটি থেকে অন্যটিতে

রূপান্তরিত হতেই থাকে সেটি দেখানো হয়েছে। তোমরা ছবিটির (a) থেকে (h) পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপ একটু খুঁটিয়ে দেখ।

আমরা যদি এক টুকরো পাথরকে সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দুলিয়ে দিই তাহলেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটতে থাকে। এখানেও গতি শক্তি এবং বিভব শক্তির মাঝে রূপান্তর ঘটতে থাকে।

উদাহরণ 4.17: স্প্রিং এবং ভরের মতো পেন্ডুলামের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান এঁকে কীভাবে বিভব শক্তি এবং গতি শক্তির ভেতরে রূপান্তর ঘটে সেটি দেখাও।

উত্তর: 4.10 ছবিতে দেখানো হয়েছে

একটি স্প্রিংয়ের সাথে লাগানো একটি ভরকে সংকুচিত করে ছেড়ে দিলে অনন্তকাল এটির সামনে পিছনে যাবার কথা, ঠিক সে রকম একটি পেন্ডুলাম দুলিয়ে ছেড়ে দিলেও সেটি অনন্তকাল দুলতে থাকার কথা। বাস্তবে সেটা কখনোই ঘটে না, আস্তে আস্তে সেটা থেমে যায়। তার কারণ সব সময়েই ঘর্ষণ বল থাকে এবং এই ঘর্ষণ বল আসলে শক্তিটুকু নিয়ে সেটাকে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করে ধীরে ধীরে শক্তিটুকু খরচ করে ফেলে। ঘর্ষণে যে তাপ তৈরি হয় আমরা নিজেরা সেটা জানি, শীতের দিনে হাত ঘষে আমরা সবাই কখনো না কখনো হাতকে গরম করেছি।

কাজেই শক্তির রূপান্তর খুবই স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া। আমরা বিভিন্ন ধরনের শক্তির রূপান্তরের আরো কয়েকটি উদাহরণ দিই :

(i) বিদ্যুৎ বা তড়িৎ শক্তি

শক্তির রূপান্তরের উদাহরণ দিতে হলে আমরা সবার আগে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ শক্তির উদাহরণ দিই তার কারণ এই শক্তিকে সবচেয়ে সহজে অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। শুধু তাই নয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা সবচেয়ে সহজ। তাই আমাদের চারপাশে নানা ধরনের শক্তি থাকার পরও আমরা আমাদের বাসায় অন্য কোনো শক্তি সরবরাহ না করে সবার প্রথমে তড়িৎ শক্তি বা ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করে থাকি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বৈদ্যুতিক পাখা বা অন্যান্য মোটরে তড়িৎ বা বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি। (যদিও চৌম্বক শক্তি আসলে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ শক্তি থেকে ভিন্ন কিছু নয় তারপরেও আমরা মোটর বা বৈদ্যুতিক পাখার ভেতরে বিদ্যুৎ শক্তিকে প্রথমে চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তর করে সেখান থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর হতে দেখি।) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি বা হিটারে এটা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। লাইট বাল্ব, টিউবলাইট বা এল. ই. ডি. তে তড়িৎ শক্তি আলোতে রূপান্তরিত হয়। শব্দ শক্তি তৈরি করার জন্য সাধারণত কোনো কিছুকে কাঁপাতে হয়– সেটি এক ধরনের যান্ত্রিক শক্তি তারপরও আমরা বলতে পারি স্পিকারে বিদ্যুৎ শক্তি শব্দ শক্তি রূপান্তরিত হয়। আমরা সবাই আমাদের মোবাইলে টেলিফোনের ব্যাটারিকে বিদ্যুৎ দিয়ে চার্জ করি– যেখানে আসলে তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(ii) রাসায়নিক শক্তি

শক্তি রূপান্তরের উদাহরণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি নিশ্চয়ই রাসায়নিক শক্তি। আমরা আমাদের বাসায় রান্না করার জন্য যে গ্যাস ব্যবহার করি সেটা রাসায়নিক শক্তির তাপ শক্তিতে রূপান্তরের উদাহরণ। সে কারণে আমাদের বাসায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার সাথে সাথে গ্যাসও সরবরাহ করা হয়। রাসায়নিক শক্তিকে তাপে রূপান্তর করার কারণে আমরা আলোও পেয়ে থাকি– মোমবাতির আলো তার একটা উদাহরণ। গ্যাস পেট্রল ডিজেল বা এ ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করে আমরা নানারকম ইঞ্জিনে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি যদিও ভালো করে দেখলে আমরা দেখব রাসায়নিক শক্তি প্রথমে তাপ শক্তি এবং সেই তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে রাসায়নিক শক্তির রূপান্তরের সবচেয়ে বড় উদাহরণটি হচ্ছে ব্যাটারি যেখানে এই শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মোবাইল টেলিফোন থেকে শুরু করে গাড়ি কিংবা ঘড়ি থেকে মহাকাশযান এমন কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে ব্যাটারি ব্যবহার করে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়নি। রাসায়নিক শক্তির সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ অবশ্য আমাদের বা জীবন্ত প্রাণীর শরীর যেখানে খাদ্য থেকে রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক কিংবা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(iii) তাপ শক্তি

পরিমাণের দিক থেকে বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তির রূপান্তর হয় তাপ শক্তি থেকে। যাবতীয় যন্ত্রের যাবতীয় ইঞ্জিনে তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। থার্মোকাপলে (Thermocouple) (দুটি ভিন্ন ধাতব পদার্থের সংযোগ স্থলে তাপ প্রদান করা) সরাসরি তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদাহরণ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে প্রায় সবক্ষেত্রেই তাপ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা হয়। (পরিবেশ রক্ষা করার জন্য আমরা আজকাল শক্তির অপচয় করতে চাই না। তাই তাপ দিয়ে আলো তৈরি হয় সে রকম লাইট বাল্ব ব্যবহার না করে আজকাল বেশি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহার করা হয়।) আমরা মোমবাতি বা বাল্বের ফিলামেন্ট তাপকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি।

(iv) যান্ত্রিক শক্তি

জেনারেটরে যখন বিদ্যুৎ তৈরি হয় তখন আসলে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে তারের কুণ্ডলীকে চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। ঘর্ষণের কারণে সব সময়ই তাপ শক্তি তৈরি হচ্ছে, সেখানে আসলে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

(v) আলোক শক্তি

আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ এবং এই তরঙ্গের একটা নির্দিষ্ট মাত্রার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা চোখে দেখতে পাই সেটাকে আমরা আলো বলি। এর চাইতে বেশি এবং কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও প্রকৃতিতে রয়েছে এবং আমরা নানা ভাবে তৈরিও করছি। যেমন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে আমরা এই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর করি। আজকাল সোলার সেল ব্যবহার করে সরাসরি আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। এখন যদিও ফটোগ্রাফিক কাগজ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে কিন্তু আমরা সবাই জানি আলোক সংবেদী ফটোগ্রাফির ফিল্মে আলোর উপস্থিতি রাসায়নিক শক্তির জন্ম দেয়।

(vi) ভর

তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরনের শক্তির রূপান্তরের মাঝে হঠাৎ করে ভর শব্দটি দেখে চমকে উঠেছ। আমরা যখন শক্তিকে বোঝাই তখন কখনো সরাসরি ভরকে শক্তি হিসেবে কল্পনা করি না কিন্তু আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক সূত্র দিয়ে দেখিয়েছেন $E = mc^2$ এবং এই সূত্রটি দিয়ে ভরকে শক্তিতে রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। নিউক্লিয়ার বোমাতে ভর থেকে শক্তি রূপান্তর করা হয়েছিল, সেখানে প্রচণ্ড তাপ আলো এবং শব্দ শক্তি হিরোশিমা ও নাগাসিকি শহর ধ্বংস করে দিয়েছিল! শক্তির রূপান্তরের এই পদ্ধতিটি শুধু বোমাতে নয় নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রেও ব্যবহার করা হয়। সরাসরি তাপ শক্তি তৈরি হলেও সেই তাপকে ব্যবহার করে বাষ্প এবং বাষ্পকে ব্যবহার করে টারবাইন ঘুরিয়ে সেই টারবাইন দিয়ে জেনারেটরে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়।

শক্তির এই ধরনের রূপান্তর আমাদের চারপাশে ঘটতে থাকলেও আমাদের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা দরকার। শক্তি থাকলেই কিন্তু সব সময় সেই শক্তি ব্যবহার করা যায় না। পৃথিবীর সমুদ্রে বিশাল পরিমাণ তাপ শক্তি রয়েছে সেই শক্তি আমরা ব্যবহার করতে পারি না। (ঘূর্ণিঝড় মাঝে মাঝে সেই শক্তি নগর লোকালয় ধ্বংস করে দেয়!) আবার যখনই শক্তিকে একটি রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা হয় তখন খানিকটা হলেও শক্তির অপচয় হয়। মূলত এই অপচয়টা হয় তাপ শক্তিতে এবং সেটা আমরা ব্যবহার করার জন্য ফিরে পাই না। শক্তির এই অপচয়টি আসলে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা নয়– এটি পদার্থবিজ্ঞানের বেঁধে দেয়া নিয়ম!

বিজ্ঞান শেখার প্রথমিক পর্যায়ে অনেকেই এটা জানে না এবং তারা এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করে অনন্তকাল চলার উপযোগী একটা মেশিন তৈরি করার চেষ্টা করে (একটি মোটর জেনারেটরকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করছে সেই বিদ্যুৎ দিয়েই আবার মোটরটিকে ঘোরানো হচ্ছে– এটি অনন্তকাল চলার একটি মেশিনের উদাহরণ– যেটি কখনোই কাজ করবে না!)

4.6 ক্ষমতা (Power)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষমতা শব্দটা অনেক ব্যবহার হয় এবং সব সময়েই যে শব্দটা ভালো কিছু বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয় তা নয়! কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে ক্ষমতা শব্দটার সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, ক্ষমতা হচ্ছে কাজ করার হার। অর্থাৎ t সময়ে W কাজ করা হয়ে থাকলে ক্ষমতা P হচ্ছে :

$$P = \frac{W}{t}$$

আমরা আগেই দেখেছি কাজ করার অর্থ হচ্ছে শক্তির রূপান্তর। শক্তির যেহেতু ধ্বংস নেই তাই কাজ করার মাঝে দিয়ে শক্তির রূপান্তর করা হয় মাত্র তাই ইচ্ছে করলে আমরা বলতে পারি ক্ষমতা হচ্ছে শক্তির রূপান্তরের হার! কাজ বা শক্তি যেহেতু স্কেলার তাই ক্ষমতাও স্কেলার।

পদার্থবিজ্ঞান শিখতে দিয়ে আমরা নানা ধরনের রাশি সম্পর্কে জেনেছি তাদের এককের নাম জেনেছি এবং চেষ্টা করেছি প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই রাশিটির মাত্রা সম্পর্কে জানতে। ক্ষমতা রাশিটি আমরা প্রথম জানলেও এর একককটি আমাদের খুব পরিচিত। যদি প্রতি সেকেন্ডে 1 জুল কাজ করা হয় তাহলে আমরা বলি $1\,W$ (ওয়াট) কাজ করা হয়েছে বা শক্তির রূপান্তর হয়েছে। আমরা যদি 100 ওয়টের একটি বাতি জ্বালাই তার অর্থ এই বাতিতে প্রতি সেকেন্ডে $100\,W$ শক্তি ব্যয় হচ্ছে। যখন আমরা খবরের কাগজে পড়ি দেশে 1000 মেগাওয়াটের নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে তার অর্থ এখানে প্রতি সেকেন্ডে $1000 \times 10^6\,J$ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হবে।

উদাহরণ 4.18: তোমার ভর $20\,kg$ তোমার নাদুস নুদুস বন্ধুর ভর $30\,kg.$ ধরা যাক তোমার স্কুলের সিঁড়ি দিয়ে $10\,m$ উপরের ছাদে উঠতে তোমার সময় লেগেছে $50\,s$, তোমার বন্ধু তোমার থেকে $10\,s$ পরে ছাদে উঠেছে। তুমি আগে উঠেছ সত্যি কিন্তু কার ক্ষমতা বেশি?

উত্তর: তোমার ভর $20\,kg$, কাজেই ওজন $m_1 g = 20 \times 9.8\,N = 196\,N$
তোমার বন্ধুর ভর $30\,kg$ কাজেই তার ওজন $m_2 g = 30 \times 9.8\,N = 294\,N$

তোমরা দুজনেই $10\,m$ উপরে উঠেছ। কাজেই

তোমার কাজের পরিমাণ $W_1 = 196 \times 10\,Nm = 1960\,J$
তোমার বন্ধুর কাজের পরিমাণ $W_2 = 294 \times 10\,Nm = 2940\,J$

তোমার ক্ষমতা

$$P_1 = \frac{W_1}{t_1} = \frac{1960\,J}{50\,s} = 39.2\,W$$

তোমার বন্ধুর ক্ষমতা

$$P_2 = \frac{W_2}{t_2} = \frac{2940\,J}{(50+10)\,s} = 49\,W$$

কাজেই বন্ধুকে হারিয়ে দিয়েছ বলে তোমার আনন্দিত হবার কিছু নেই, তোমার বন্ধুর ক্ষমতা তোমার থেকে বেশি!

উদাহরণ 4.19: ক্ষমতা বলতে আমরা কী বোঝাই সেটা ভালো করে অনুভব করার জন্য আমরা একটা উদাহরণ নিই। ধরা যাক তুমি 1000 kg ভরের একটা বড় পাথরকে উপরে তোলার জন্য একটা ক্রেন ভাড়া করে এনেছ। এই ক্রেনটি যে কোনো বস্তুকে সেকেন্ডে $2m$ টেনে নিতে পারে। ধরা যাক ক্রেনটির ক্ষমতা $5\,kW$. তুমি কি পাথরটিকে উপরে তুলতে পারবে?

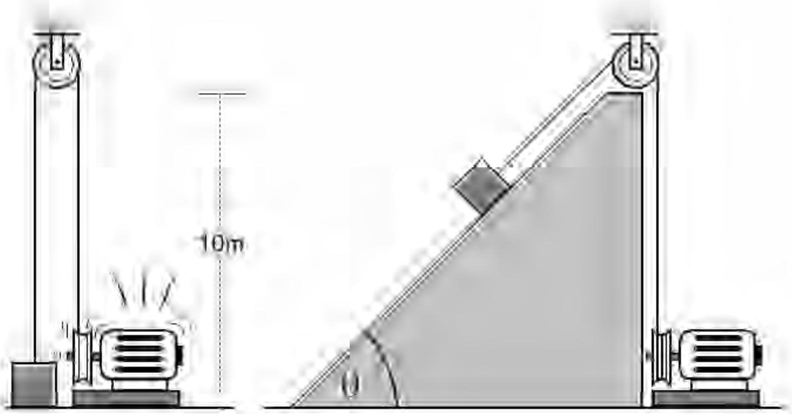

ছবি 4.11: একটি ক্রেন দিয়ে খাড়াভাবে এবং θ কোণে একটি বস্তুকে উপরে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

উত্তর: ক্ষমতা $P = W/t$

কিন্তু $W = Fs$ যেখানে F প্রয়োগ করা বল এবং s অতিক্রান্ত দূরত্ব কাজেই

$$P = \frac{Fs}{t} = Fv$$

যেখানে v ক্রেনের টেনে নেয়ার বেগ,

এই ক্ষেত্রে $1000\ kg$ ভরের একটি বস্তুকে $2\ m/s$ বেগে উপরে তুলতে ক্ষমতার প্রয়োজন।

$$P = 1000 \times 9.8 \times 2W = 1.96 \times 10^4 W$$

কিন্তু ক্রেনটির ক্ষমতা $5 \times 10^3 W$ যেটি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থেকে কম, কাজেই ক্রেনটি পাথরটিকে তুলতে পারবে না। কিন্তু পাথরটিকে যদি θ কোণের একটা ঢালু বেয়ে তোলা হয় তাহলে প্রযুক্ত বল F' এর মান হবে :

$$F' = 1000 \times 9.8 \times sin\theta\ N$$

কাজেই প্রয়োজনীয় ক্ষমতা :

$$P' = F'v = 1000 \times 9.8 \times 2 \times sin\theta\ W = 1.96 \times 10^4 sin\theta\ W$$

যদি $P' = 5 \times 10^3\ W$ হয়

$$5 \times 10^3\ W = 1.96 \times 10^4 sin\theta\ W$$

$$sin\theta = \frac{5 \times 10^3}{1.96 \times 10^4} = 0.255$$

$$\theta = 14.8^{\circ}$$

অর্থাৎ $\theta = 14.8^{\circ}$ কোণের একটা ঢালু বেয়ে পাথরটাকে একই ক্রেন দিয়ে টেনে তোলা সম্ভব।

4.7 কর্মদক্ষতা (Efficiency)

আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে শক্তিকে তার একটি রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করার বেলায় সব সময়েই খানিকটা শক্তির অপচয় হয়। কাজেই সব সময়েই আমরা যে পরিমাণ কাজ করতে চাই তার সমপরিমাণ শক্তি দিলে হয় না, একটু বেশি শক্তি দিতে হয়। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করি, নানা ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করি তার সব সময়েই দেখা যায় সেগুলোতে ঘর্ষণ বা অন্যান্য কারণে শক্তির অপচয় হয়। সে জন্য প্রায় সময়েই একটি যন্ত্র বা ইঞ্জিন কতটুকু দক্ষতার সাথে শক্তি ব্যবহার করছে আমাদেরকে তার পরিমাপ করতে হয়। সে জন্য আমরা কর্মদক্ষতা বলে একটি নূতন রাশি ব্যবহার করে থাকি। কর্মদক্ষতাকে শতকরা হিসাবে এভাবে লেখা যায় :

$$\text{কর্মদক্ষতা} = \frac{\text{প্রদত্ত শক্তি - শক্তির অপচয়}}{\text{প্রদত্ত শক্তি}} \times 100\%$$

উদাহরণ 4.20: $1000W$ এর একটি মোটর ব্যবহার করে $15s$ এ একটি $10kg$ ভরের বস্তুকে $10m$ উপরে তোলা হলো শক্তির অপচয় কত? কর্মদক্ষতা কত?

উত্তর: কাজের পরিমাণ : $10 \times 9.8 \times 10J = 9{,}800J$
প্রদত্ত শক্তি : $1000 \times 15 = 15{,}000\,J$
শক্তির অপচয় : $15{,}000\,J - 9{,}800\,J = 5{,}200\,J$

কর্মদক্ষতা :

$$\frac{9{,}800J}{15{,}000J} \times 100\% = 65.3\%$$

তোমরা শুনে অবাক হবে একটা বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সময় প্রতিটি ধাপেই শক্তির অপচয় হয় এবং সবগুলো অপচয় হিসেবে নেয়ার পর বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মদক্ষতা 30% এ নেমে আসতে পারে!

উদাহরণ 4.21: প্রত্যেকটি ধাপে 10% অপচয় হলে চার ধাপে কত কর্মদক্ষতা?

উত্তর: $(90\%)^4 = 65.6\%$

4.8 শক্তির বিভিন্ন উৎস (Sources of Energy)

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকে সহজভাবে বলা যায় শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস। মোটামুটিভাবে বলা যায় কোন দেশ কতটা উন্নত সেটা বোঝার একটা সহজ উপায় হচ্ছে মাথাপ্রতি তারা কতটুকু বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে তার একটা হিসাব নেয়া। পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের শক্তির রূপ 4.12 ছবিতে দেখানো হয়েছে।

4.8.1 অনবায়নযোগ্য শক্তি (Non-Renewable Energy)

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসটা যেহেতু শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস তাই আমরা দেখতে পাই সারা পৃথিবীতেই সব দেশ সব জাতির ভেতরেই শক্তির জন্যে এক ধরনের ক্ষুধা কাজ করছে। যে যেভাবে পারছে সেভাবে শক্তির অনুসন্ধান করছে, শক্তিকে ব্যবহার করছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে তেল, গ্যাস বা কয়লা। তেল গ্যাস বা কয়লা তিনটিই হচ্ছে ফসিল জ্বালানি, অর্থাৎ লক্ষ কোটি বছর আগে গাছপালা মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘদিনের তাপ আর চাপে এই রূপ নিয়েছে। তেল, গ্যাস আর কয়লা তিনটিতেই কার্বনের পরিমাণ বেশি আর এগুলো পুড়িয়ে যখন তাপ শক্তি তৈরি হয় তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় যেটি পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক। মাটির নিচ থেকে কয়লা, তেল আর গ্যাসকে তুলতে হয়। মাটির নিচ থেকে যে তেল তোলা হয় (crude oil) প্রাথমিক অবস্থায় সেগুলো অনেক ঘন থাকে, রিফাইনারিতে সেগুলো পরিশোধন করে পেট্রল, ডিজেল বা কেরোসিনে রূপান্তর করা হয় এবং সাথে সাথে আরো ব্যবহারযোগ্য পদার্থ বের হয়ে আসে। মাটির নিচ থেকে যে গ্যাস বের হয় সেটি মূলতঃ মিথেন (CH_4), এর সাথে জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য গ্যাস মেশানো থাকতে পারে এবং সেগুলো আলাদা করে নিতে হয়। আমাদের বাংলাদেশের গ্যাস তুলনামূলকভাবে অনেক পরিষ্কার এবং সরাসরি ব্যবহার করার উপযোগী।

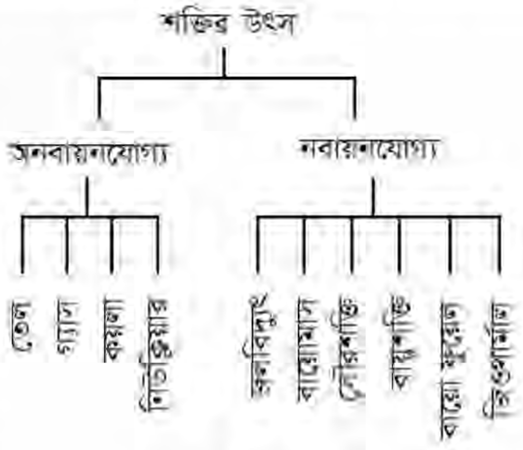

ছবি 4.12: শক্তির বিভিন্ন উৎস

অনেক দেশ নিউক্লিয়ার শক্তিকে ব্যবহার করছে সেখানেও এক ধরনের জ্বালানির দরকার হয়, সেই জ্বালানি হচ্ছে ইউরেনিয়াম। তেল, গ্যাস, কয়লা বা ইউরেনিয়াম, এই শক্তিগুলোর মাঝে একটা মিল রয়েছে, এগুলো ব্যবহার করলে খরচ হয়ে যায়। মাটির নিচে কতটুকু তেল, গ্যাস, কয়লা আছে কিংবা পৃথিবীতে কী পরিমাণ ইউরেনিয়াম আছে মানুষ এর মাঝে সেটা অনুমান করে বের করে ফেলেছে। দেখা গেছে পৃথিবীর মানুষ যে হারে শক্তি ব্যবহার করছে যদি সেই হারে শক্তি ব্যবহার করতে থাকে তাহলে পৃথিবীর শক্তির উৎস তেল, গ্যাস, কয়লা বা ইউরেনিয়াম দিয়ে টেনেটুনে বড় জোর দুইশত বৎসর চলবে। তারপর আমাদের পরিচিত উৎস যাবে ফুরিয়ে। তখন কী হবে পৃথিবীর মানুষ সেটা নিয়ে খুব বেশি

দুর্ভাবনায় নেই, তার কারণ মানুষ মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই জানে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর মাঝে অন্য কিছু বের করে ফেলা হবে– যেমন নিউক্লিয়ার ফিউসান, যেটা ব্যবহার করে সূর্য কিংবা নক্ষত্রেরা তাদের শক্তি তৈরি করে। ফিউসানের জন্য জ্বালানি আসে হাইড্রোজেনের একটা আইসোটপ থেকে, আর পানির প্রত্যেকটা অণুতে দুটো করে হাইড্রোজেন, কাজেই সেটা ফুরিয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই।

4.8.2 নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewable Energy)

শুধু যে ভবিষ্যতে নূতন ধরনের শক্তির ওপর মানুষ ভরসা করে আছে তা নয়, এই মুহূর্তেও তারা এমন শক্তির ওপর ভরসা করে আছে যেগুলো কখনো ফুরিয়ে যাবে না। সেই শক্তি আসে সূর্যের আলো থেকে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা কিংবা ঢেউ থেকে, উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাস থেকে, পৃথিবীর গভীরের উত্তপ্ত ম্যাগমা থেকে কিংবা নদীর বহমান পানি থেকে। আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে এই শক্তিগুলো বলতে গেলে অফুরন্ত। এগুলোকে বলা হয় নবায়নযোগ্য (Renewable Energy) শক্তি— অর্থাৎ যে শক্তিকে নবায়ন করা যায়, যে কারণে এটার ফুরিয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব মানুষ যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এই নবায়নযোগ্য শক্তি। যত দিন যাচ্ছে মানুষ ততই পরিবেশ সচেতন হচ্ছে তাই এ রকম শক্তির ব্যবহার আরো বেড়ে যাচ্ছে। বাতাস ব্যবহার করে যে শক্তি তৈরি করা হয় প্রতিবছর তার ব্যবহার বাড়ছে প্রায় তিরিশ শতাংশ, এই সংখ্যাটি কিন্তু কোনো ছোট সংখ্যা নয়।

পৃথিবীর পুরো শক্তির পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি। সেই এক ভাগের বেশির ভাগ হচ্ছে জলবিদ্যুৎ, নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা। নদীর পানি যেহেতু ফুরিয়ে যায় না তাই এ রকম বিদ্যুৎকেন্দ্রের শক্তির উৎসও ফুরিয়ে যায় না এটা হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। কিন্তু নদীতে বাঁধ দেয়া হলে পরিবেশের অনেক বড় ক্ষতি হয় সে কারণে পৃথিবীর মানুষ অনেক সতর্ক হয়ে গেছে। যাদের একটু দুরদৃষ্টি আছে তারা এ রকম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র আর তৈরি করে না। জলবিদ্যুতের পর সবচেয়ে বড় নবায়নযোগ্য শক্তি আসে বায়োমাস (Biomass) থেকে, বায়োমাস বলতে বোঝানো হয় লাকড়ি, খড়কুটো এসবকে। পৃথিবীর একটা বড় অংশের মানুষের কাছে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ নেই, তাদের দৈনন্দিন জীবন কাটে লাকড়ি, খড়কুটো জ্বালিয়ে। এই দরিদ্র মানুষগুলোর ব্যবহারী শক্তি পৃথিবীর পুরো শক্তির একটা বড় অংশ। যদিও শুকনো গাছ খড়কুটো পুড়িয়ে ফেললে সেটা শেষ হয়ে যায় তারপরও বায়োমাসকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলার কারণ নূতন করে আবার গাছপালা জন্মানো যায়। তেল, গ্যাস বা কয়লার মতো পৃথিবী থেকে এটা চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় না।

নবায়নযোগ্য শক্তির এই দুটি রূপ, জলবিদ্যুৎ আর বায়োমাসের পর গুরুত্বপূর্ণ শক্তির **উৎস**গুলো হচ্ছে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়ো ফুয়েল আর জিওথার্মাল।

শুনে অনেকেই অবাক হয়ে যাবে, মাত্র এক বর্গকিলোমিটার এলাকায় সূর্য থেকে আলো তাপ হিসেবে প্রায় হাজার মেগাওয়াট শক্তি পাওয়া যায় যেটা একটা নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের কাছাকাছি। সূর্য থেকে আসা আলো আর তাপের একটা অংশ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যায়, রাতের বেলা সেটা থাকে না, মেঘ বৃষ্টির কারণে সেটা অনিয়ন্ত্রিত। তা ছাড়াও শক্তিটা আসে তাপ কিংবা আলো হিসেবে বিদ্যুতে রূপান্তর করার একটা ধাপ অতিক্রম করতে হয়– তারপরও বলা যায় এটা আমাদের খুব নির্ভরশীল একটা শক্তির উৎস। সূর্যের তাপকে ব্যবহার করে সেটা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। তার চাইতে বেশি জনপ্রিয় পদ্ধতি

হচ্ছে সেটাকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তর করা। আজকাল পৃথিবীর একটা পরিচিত দৃশ্য হচ্ছে সোলার প্যানেল, বাসার ছাদে লাগিয়ে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ নিজের বাসায় তৈরি করে নেয়।

সৌরশক্তির পরই যেটি খুব দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ফেলছে সেটা হচ্ছে বায়ুশক্তি। আমাদের দেশে আমরা এখনো বায়ু বিদ্যুতের বিশাল টারবাইন দেখে অভ্যস্ত নই কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশেই সেটা খুব পরিচিত একটা দৃশ্য। যেখানে বায়ু বিদ্যুতের বিশাল টারবাইন বসানো হয় সেখান থেকে শুধু একটা খাম্বা উপরে উঠে যায়, তাই মোটেও জায়গা নষ্ট হয় না সে জন্য পরিবেশবাদীরা এটা খুব পছন্দ করেন একটা বায়ু টারবাইন থেকে কয়েক মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব! পৃথিবীর মানুষ বহুদিন থেকে পান করার জন্য অ্যালকোহল তৈরি করে আসছে—সেটা এক ধরনের জ্বালানি। ভুট্টা, আখ এ ধরনের খাবার থেকে জ্বালানির জন্য অ্যালকোহল তৈরি করা মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। রান্না করার জন্য আমরা যে তেল ব্যবহার করি সেটা ডিজেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। পৃথিবীতে অনেক ধরনের গাছপালা আছে যেখান থেকে সরাসরি জ্বালানি তেল পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, অনেক দেশই (যেমন ব্রাজিল) এ ধরনের বায়োফুয়েল বেশ বড় আকারে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। নবায়নযোগ্য শক্তির গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি হচ্ছে জিওথার্মাল (geothermal)| আমাদের পৃথিবীর ভেতরের অংশ উত্তপ্ত, অগ্নেয়গিরি দিয়ে যখন সেটা বের হয়ে আসে তখন আমরা সেটা টের পাই। তাই কেউ যদি কয়েক কিলোমিটার গর্ত করে যেতে পারে তাহলেই তাপশক্তির একটা বিশাল উৎস পেয়ে যায়। প্রক্রিয়াটা এখনো সহজ নয় তাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয়নি। কোনো কোনো জায়গায় তার ভূ-প্রকৃতির কারণে সেখানে এ ধরনের শক্তি সহজেই পাওয়া যায় সেখানে সেগুলো ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সারা পৃথিবীতেই এখন মানুষেরা পরিবেশ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠছে। উন্নতির জন্য দরকার শক্তি, কিন্তু শক্তির জন্য যদি পরিবেশকে ধ্বংস করে দেয়া হয় আধুনিক পৃথিবীর মানুষ কিন্তু সেটা মেনে নেয় না। পৃথিবীর মানুষ এখন যে কোনো শক্তি যে কোনোভাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়। পৃথিবীর সর্বনাশ না করে, প্রকৃতির সাথে বিরোধ না করে তারা পৃথিবীর মাঝে লুকানো শক্তিটুকু ব্যবহার করতে চায়।

অনুশীলনী

প্রশ্ন :

1. ঘর্ষণজনিত বল দিয়ে করা কাজ সব সময়েই নিগেটিভ হয় কেন?
2. একটা স্প্রিংকে কেটে দুটুকরো করলে টুকরোগুলোর স্প্রিং ধ্রুবক k কি বাড়বে না কমবে?
3. পৃথিবী সচল রাখতে কি শক্তির প্রয়োজন নাকি ক্ষমতার প্রয়োজন?
4. ভরকে কি শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায়?
5. বেগ 1 শতাংশ বাড়লে গতি শক্তি কত শতাংশ বাড়বে?

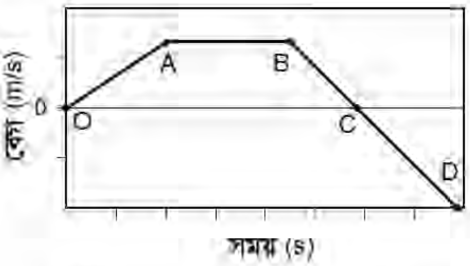

ছবি 4.13: বেগ এবং সময়ের লেখচিত্র।

গাণিতিক সমস্যা:

1. একটা বস্তুর ওপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বল প্রয়োগ করার কারণে তার বেগের পরিবর্তন হয় এবং সেটি 4.13 ছবিতে দেখানো হয়েছে। OA, AB, BC এবং CD এর মধ্যে কখন পজিটিভ কাজ কখন নিগেটিভ কাজ বা কখন শূন্য কাজ করা হয়েছে?
2. $50kg$ ভরের একটি মেয়ে $10s$ এ সিঁড়ি বেয়ে $5m$ উপরে উঠেছে। সে কতটুকু কাজ করেছে? তার ক্ষমতা কত?
3. $5kg$ ভরের একটা স্থির বস্তুর ওপর $10s$ একটি বল প্রয়োগ করার পর তার গতি শক্তি হল $500J$, কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছিল?
4. একটি কপিকলের একপাশে $10kg$ এবং অন্য পাশে $5kg$ ভরের দুটি বস্তুকে ঠিক $5m$ উপরে স্থির অবস্থায় ধরে রাখা হয়েছে। তুমি বস্তু দুটিকে ছেড়ে দিলে, তখন $10kg$ ভরটি নিচের দিকে এবং $5kg$ ভরটি উপরের দিকে উঠতে শুরু করবে। যখন $10kg$ ভরটি $1m$ $1m$ নিচে এবং $5kg$ ভরটি $1m$ উপরে উঠেছে তখন ভর দুটির বেগ কত?
5. $100m$ ওপর থেকে $5kg$ ভরের একটি বস্তু ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কোন উচ্চতায় বস্তুটির গতি শক্তি তার বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে?

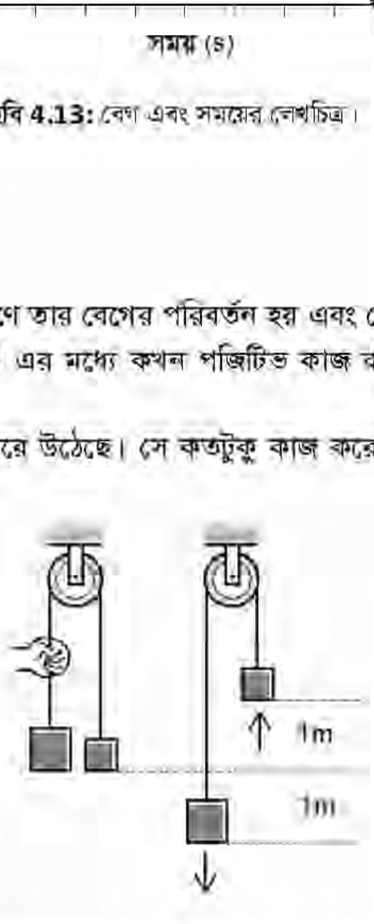

ছবি 4.14: দুটি ভিন্ন ভর কপিকল দিয়ে ঝোলানো।

পঞ্চম অধ্যায়

পদার্থের অবস্থা ও চাপ

(Pressure and States of Matter)

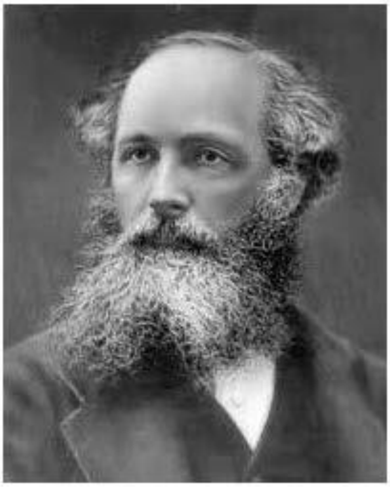

James Clerk Maxwell (1831-1879)

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল একজন স্কটিস পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক তত্ত্বের মতো আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বিষয়কে এক সূত্রের আওতায় নিয়ে আসা এবং বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে আলোকে ব্যাখ্যা করা। আণবিক গতি তত্ত্বেও তাঁর বড় অবদান আছে। তিনি সর্বপ্রথম রঙিন ফটো তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

5.1 চাপ (Pressure)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় চাপ শব্দটা নানাভাবে ব্যবহার করলেও পদার্থবিজ্ঞানে চাপ শব্দটার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে নানা সময় নানা ধরনের বল প্রয়োগ করার কথা বলেছি, তবে বলটি ঠিক কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, সেটি বলা হয়নি। যেমন তুমি একটা পাথরকে এক হাতে ঠেলতে পার, দুই হাতে ঠেলতে পার কিংবা তোমার সারা শরীর দিয়ে ঠেলতে পার (ছবি 5.1)। প্রত্যেকবার তুমি সমান পরিমাণ বল প্রয়োগ করলেও চাপ কিন্তু হবে ভিন্ন। প্রথমক্ষেত্রে তুমি তোমার হাতের তালুর ক্ষেত্রফলের ভেতর দিয়ে বল প্রয়োগ করেছ, যদি তোমার প্রয়োগ করা বল হয় F এবং হাতের তালুর ক্ষেত্রফল হয় A তাহলে চাপ P হচ্ছে

$$P = \frac{F}{A}$$

চাপের মাত্রা $ML^{-1}T^{-2}$

কাজেই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুই হাত ব্যবহার করায় বল প্রয়োগকারী ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ বেড়ে যাবে বলে চাপ অর্ধেক হয়ে যাবে, তৃতীয় ক্ষেত্রে সারা শরীর ব্যবহার করে বল প্রয়োগ করায় বল প্রয়োগকারী ক্ষেত্রফল আরো বেড়ে যাবে তাই চাপ আরো কমে যাবে।

বল একটি ভেক্টর, তাই তোমাদের ধারণা হতে পারে চাপ P বুঝি ভেক্টর! কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে চাপ P কিন্তু একটা স্কেলার রাশি এবং আমরা যদি সঠিক ভাবে লিখতে চাই তাহলে এটি লেখা উচিত এভাবে

$$\boldsymbol{F} = P\boldsymbol{A}$$

অর্থাৎ ক্ষেত্রফলকেই ভেক্টর হিসেবে ধরা হয়! ভেক্টরের পরিমাণ আর দিক থাকতে হয়, ক্ষেত্রফলের পরিমাণ টুকু হচ্ছে ভেক্টরের পরিমাণ, ক্ষেত্রফলের উপর লম্ব হচ্ছে ভেক্টরের দিক!

চাপ স্কেলার হওয়ার কারণে এর কোনো দিক নেই। এটি খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ চাপ ধারণাটি কঠিন পদার্থে থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় তরল কিংবা বায়বীয় পদার্থে। তরল বা বায়বীয় পদার্থে যখন চাপ প্রয়োগ করে তখন আসলে সেটি দিকের উপর নির্ভর করে না– এই বিষয়টি আমরা একটু পরেই দেখব।

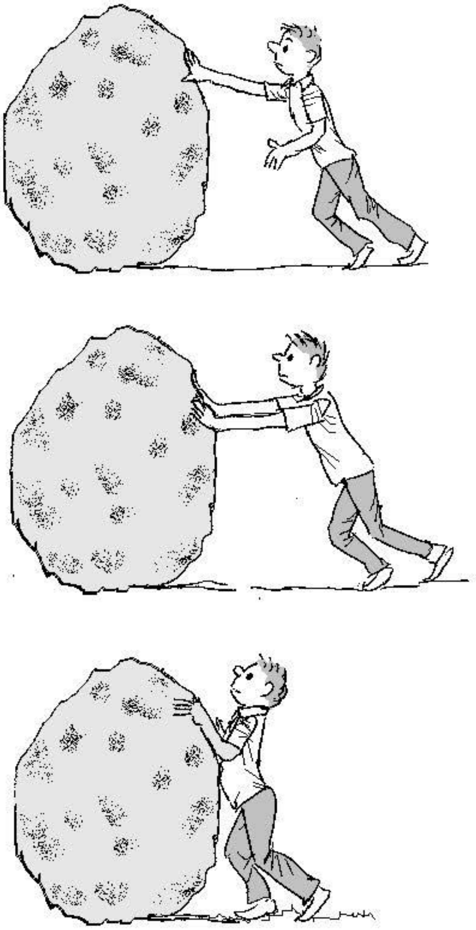

ছবি 5.1: কতটুকু জায়গায় বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তার উপরে চাপ নির্ভর করে।

উদাহরণ 5.1 : ধরা যাক তোমার ভর $50\ kg$, তোমার শরীরের এক পাশের ক্ষেত্রফল $0.5\ m^2$ এবং দুই পায়ের তলার ক্ষেত্রফল $0.03\ m^2$। তুমি চিত হয়ে শুয়ে থাকলে মেঝেতে কত চাপ প্রয়োগ করবে এবং দাঁড়িয়ে থাকলে মেঝেতে কত চাপ প্রয়োগ করবে?

উত্তর : ভর $50\ kg$ কাজেই ওজন $50\ \times 9.8\ N = 490\ N$

যখন শুয়ে থাক তখন চাপ

$$P = \frac{490\ N}{0.5\ m^2} = 980 \frac{N}{m^2}$$

যখন দাঁড়িয়ে থাক তখন চাপ

$$P = \frac{490\ N}{0.03\ m^2} = 16{,}333 \frac{N}{m^2}$$

দেখতেই পাচ্ছ শুয়ে পড়লে অনেক কম চাপ দেয়া হয়। এজন্য মানুষ যখন চোরাবালিতে পড়ে তখন নিজেকে বাঁচানোর জন্য সব সময় শুয়ে পড়তে হয় যেন সে অনেক কম চাপ দেয় এবং চোরাবালিতে সহজে ডুবে না যায়।

চাপের এককের আরেকটি নাম প্যাস্কেল (P)। $1\ N$ বল $1\ m^2$ ক্ষেত্রফলের উপর প্রয়োগ করলে $1\ P$ (প্যাস্কেল) চাপ প্রয়োগ করা হয়।

5.2 ঘনত্ব (Density)

টেবিল 5.1: বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্ব

পদার্থ	ঘনত্ব (gm/cc)
বাতাস	0.00127
কর্ক	0.25
কাঠ	0.4 - 0.5
মানব দেহ	0.995
পানি	1.00
কাচ	2.60
লোহা	7.80
পারদ	13.6
সোনা	19.30

তরল এবং বায়বীয় পদার্থের চাপ বোঝার আগে আমাদের ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণাটি অনেক স্পষ্ট থাকা দরকার। ঘনত্ব হচ্ছে একক আয়তনে ভরের পরিমাণ অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর যদি m এবং আয়তন V হয় তাহলে তার ঘনত্ব

$$\rho = \frac{m}{V}$$

টেবিল 5.1 এ তোমাদের পরিচিত কয়েকটি পদার্থের ঘনত্ব দেয়া হলো। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা ভালো, তাপমাত্রা বাড়লে কিংবা কমালে পদার্থের আয়তন বাড়বে কিংবা কমতে পারে। যেহেতু ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না তাই পদার্থের ঘনত্ব তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তন হতে পারে। সেজন্য পদার্থের ঘনত্বের কথা বলতে হলে সাধারণত সেটি কোন তাপমাত্রায় মাপা হয়েছে সেটিও বলে দিতে হয়।

উদাহরণ **5.2**: $1\ kg$ পানিতে $0.25\ kg$ লবণ গুলে নেয়ার পর তার আয়তন হলো $1200\ cc$ এই পানির ঘনত্ব কত?

উত্তর: $1cc$ হচ্ছে $1cm^3$ কাজেই

$$1cc = (10^{-2}m)^3 = 10^{-6}m^3$$

কাজেই লবন গোলা পানির ঘনত্ব

$$\rho = \frac{1\,kg + 0.25kg}{1200 \times 10^{-6}m^3} = 1.04\ kg/m^3$$

উদাহরণ 5.3: জর্ডানের ডেড সী (Dead sea) এর ঘনত্ব $1.24kg/liter$ এই সমুদ্রের $1\ kg$ পানির আয়তন কত?

উত্তর: $1\ litre$ হচ্ছে $1000\ cc$ বা $10^{-3}m^3$ কাজেই জর্ডানের ডেড সী এর পানির ঘনত্ব

$$\rho = 1.24\frac{kg}{liter} = \frac{1.24\ kg}{10^{-3}m^3} = 1.24 \times 10^3\ kg\ m^{-3}$$

কাজেই $1kg$ পানির আয়াতন:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{1kg}{1.24 \times 10^3\ kg\ m^{-3}} = 0.81 \times 10^{-3}\ m^3$$

কিংবা $0.81\ liter$

উদাহরণ 5.4: নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব কত? 1 চা চামুচ নিউক্লিয়াসের ভর কত?

উত্তর: নিউক্লিয়াস তৈরি হয় নিউট্রন আর প্রোটন দিয়ে। তাদের একটার ভর $1.67 \times 10^{-27}kg$, তাদের ব্যাসার্ধ আনুমানিক $1.25\ fm = 1.25 \times 10^{-15}m$ কাজেই যদি নিউট্রন কিংবা প্রোটনের ঘনত্ব বের করতে পারলে সেটাকেই নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব হিসেবে ধরতে পারি!

নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব

$$\rho = \frac{m}{\frac{4\pi}{3}r^3} = \frac{1.67 \times 10^{-27}kg}{\frac{4\pi}{3}(1.25 \times 10^{-15}m)^3} = 0.204 \times 10^{18}\ kg/m^3$$

এই সংখ্যাটি যে কত বিশাল সেটা তোমাদের অণুমান করা দরকার! এক চা চামচে মোটামুটি $1cc$ জিনিস আটে, কাজেই এক চা-চামচ নিউক্লিয়াসের ভর :

$$m = 0.204 \times 10^{18}\ kg/m^3 \times 10^{-6}m^3\ = 2 \times 10^{11}kg$$

এটা মোটামুটিভাবে পৃথিবীর সব মানুষের সম্মিলিত ভর!

আমার অন্যভাবেও এটা দেখতে পারি। একটা পরমাণুতে নিউক্লিয়াসে নিউটন-প্রোটন থাকে, বাইরে থাকে ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের ভর নিউট্রন প্রোটনের ভর থেকে প্রায় 1800 গুণ কম, কাজেই যে

কোনো জিনিষের ভরটা আসলে নিউক্লিয়াসের ভর–ইলেকট্রনগুলোকে না ধরলে খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু আমরা চারপাশে যেমন দেখি তার আকার কিন্তু নিউক্লিয়াসের আয়তন নয়– তার আয়তন এসেছে পরমাণুর আয়তন থেকে। খুব ছোট একটা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে তুলনামূলক ভাবে অনেক বড় একটা কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ থেকে পরমাণুর ব্যাসার্ধ প্রায় এক লক্ষ গুণ বড়।

কাজেই যদি কোনোভাবে চাপ দিয়ে তোমার শরীরের যে কয়টি পরমাণু আছে সেগুলো ভেঙে তোমার সমস্ত নিউক্লিয়াসগুলো একত্র করে ফেলা যায় তাহলে তোমার আয়তন কতটুকু হবে অনুমান করতে চাও? যেহেতু তখন তোমার ঘনত্ব হবে নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব তাই তোমার আয়তন হবে :

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{40 kg}{0.204 \times 10^{18}\, kg/m^3} = 2 \times 10^{-16}\, m^3$$

যদি ধরে নেই তোমাকে একটা ছোট গোলক তৈরি করা হয়েছে তাহলে তোমার ব্যাসার্ধ r হবে:

$$\frac{4\pi}{3} r^3 = 2 \times 10^{-16}\, m^3$$
$$r = 1.68 \times 10^{-3}\, mm$$

অর্থাৎ তোমাকে খালি চোখে দেখা যাবে না–মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে।

5.3 বাতাসের চাপ (Air Pressure)

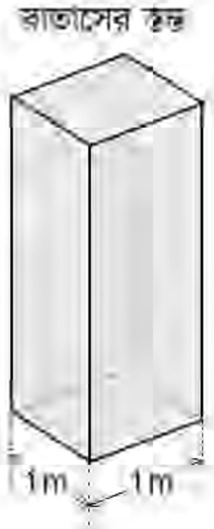

ছবি 5.2: বাতাসের চাপটি আসে বাতাসের স্তম্ভের ওজন থেকে।

বাতাসের একটা চাপ আছে। আমরা এই চাপ আলাদাভাবে অনুভব করি না কারণ আমাদের শরীরের ভেতর থেকেও বাইরে একটি চাপ দেয়া হচ্ছে তাই দুটো চাপ একটা আরেকটিকে কাটাকাটি করে দেয়। মহাকাশে বাতাস নেই তাই বাতাসের চাপও নেই, তাই সেখানে শরীরের ভেতরের চাপকে কাটাকাটি করার জন্য কিছু নেই এবং এ রকম পরিবেশে মুহূর্তের মাঝে মানুষের শরীর তার ভেতরকার চাপে বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। সে জন্য মহাকাশে মহাকাশচারীরা সব সময়েই চাপ নিরোধক স্পেস স্যুট পরে থাকেন। পৃথিবী পৃষ্ঠে বাতাসের এই চাপ $10^5 N/m^2$ যার অর্থ তুমি যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে $1 m^2$ ক্ষেত্রফলের খানিকটা জায়গা কল্পনা করে নাও তাহলে তার উপরে বাতাসের যে স্তম্ভটি রয়েছে তার ওজন $10^5 N$. এটা মোটামুটিভাবে একটা হাতির ওজন!

এখানে একটা বিষয় এখনই তোমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে. এটি সত্যি, ওজন হচ্ছে বল এবং এই বলটি নিচের দিকে কাজ

করে। বল হচ্ছে ভেক্টর তাই এর মান এবং দিক দুটোরই প্রয়োজন আছে। চাপ ভেক্টর নয় তার কোনো দিক নেই তাই যে কোনো জায়গায় চারিদিকে সমান। তুমি যেখানে এখন দাঁড়িয়ে কিংবা বসে আছ তোমার ওপর বাতাস যে চাপ প্রয়োগ করছে, সেটা তোমার উপরে ডানে বামে সামনে পিছনে বা নিচে চারিদিকেই সমান। বাতাস কিংবা তরল পদার্থের জন্য এটা সব সময়েই সত্যি।

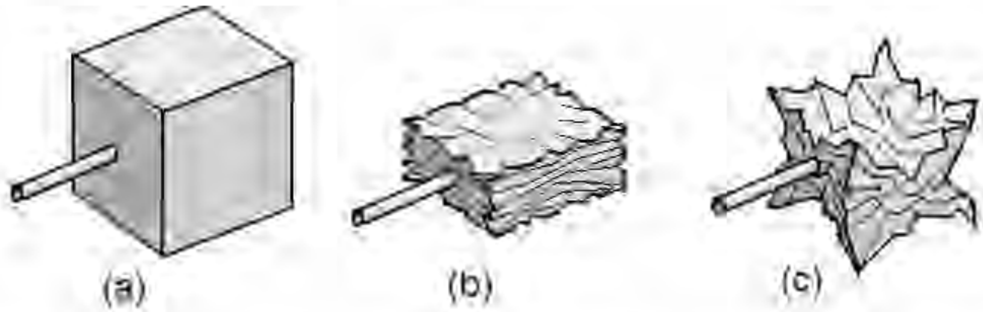

ছবি 5.3: (a) তে দেখানো কিউবটির ভেতর থেকে পাম্প করে বাতাস সরিয়ে নিয়ে যদি শুধু উপর থেকে চাপ দিতো তাহলে (b) ছবির মত চ্যাপ্টা হয়ে যেতো। কিন্তু যেহেতু চারিদিক থেকে চাপ আসে তাই (c) ছবির মত সংকুচিত হয়

পাতলা টিন বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কোনো নিশ্ছিদ্র টিন বা কৌটা যদি কোনোভাবে বায়ুশূন্য করা যায় তাহলে সেটা দুমড়েমুচড়ে যাবে, তার কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় বাইরের বাতাসের চাপকে কৌটার ভেতরের বাতাসের পাল্টা চাপ দিয়ে একটা সমতা বজায় রেখেছিল। ভেতরের বাতাস পাম্প করে সরিয়ে নেবার পর ভেতরে বাইরের বাতাসের চাপ প্রতিহত করার মতো কিছু নেই তাই বাইরের বাতাসের চাপ টিন বা কৌটাটাকে দুমড়েমুচড়ে দিবে (ছবি 5.3)। তোমরা যে জিনিসটা লক্ষ করবে সেটি হচ্ছে কৌটাটা শুধু উপর দিক থেকে দুমড়ে মুচড়ে যাবে না– চারিদিক থেকে দুমড়েমুচড়ে যাবে। চাপ যদি শুধু উপর থেকে আসত তাহলে টিনটা শুধু উপর থেকে দুমড়ে মুচড়ে যেত– চাপ যেহেতু চারিদিকেই সমান তাই টিনটা চারিদিক থেকেই আসছে এবং চারিদিক থেকে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। পৃথিবী পৃষ্ঠে বাতাসের চাপটি আসছে এর উপরের স্তম্ভটির ওজন থেকে। তাই আমরা যদি উপরে উঠি তাহলে আমাদের উপরের স্তম্ভের উচ্চতাটুকু কমে যাবে, ওজনটিও কমে যাবে এবং সেজন্য সেখানে বাতাসের চাপও কমে যাবে। বিষয়টি সত্যি এবং 5.3 ছবিতে তোমাদের দেখানো হয়েছে উচ্চতার সাথে সাথে বাতাসের চাপ কেমন করে কমে যায়। যে বিষয়টা তোমাদের আলাদা করে লক্ষ করার কথা সেটি হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছানোর পর বাতাসের চাপ অর্ধেক কমে গিয়েছে– সাধারণভাবে মনে হতে পারে তাহলে পরের পাঁচ কিলোমিটারে বাকি অর্ধেক কমে সেখানে বাতাসের চাপ শূন্য হয়ে যাচ্ছে না কেন? এর একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। বাতাস বা গ্যাসকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায় তাই পৃথিবীর পৃষ্ঠে, যেখানে বাতাসের চাপ সবচেয়ে বেশি সেখানে বাতাস সবচেয়ে বেশি সংকুচিত হয়ে আছে অর্থাৎ বাতাসের ঘনত্ব

সেখানে সবচেয়ে বেশি। আমরা যতই উপরে উঠতে থাকব বাতাসের চাপ যে রকম কমতে থাকবে তার ঘনত্বও সে রকম কমতে থাকবে।

উচ্চতার সাথে সাথে বাতাসের ঘনত্ব কমে যাওয়ার অনেকগুলো বাস্তব দিক আছে। আকাশে যখন প্লেন উড়ে তখন বাতাসের ঘর্ষণ প্লেনের জন্য অনেক বড় সমস্যা। যত উপরে ওঠা যাবে বাতাসের ঘনত্ব তত কমে যাবে এবং ঘর্ষণও কমে যাবে তাই সত্যি সত্যি বড় বড় যাত্রীবাহী প্লেনগুলো আকাশে অনেক ওপর দিয়ে উড়ার চেষ্টা করে। সাধারণভাবে মনে হতে পারে তাহলে প্লেনগুলো আরো উপর দিয়ে– একেবারে মহাকাশ দিয়ে উড়ে যায় না কেন, তাহলে তো ঘর্ষণ আরো কমে যাবে। তার কারণ প্লেনকে ওড়ানোর জন্য তার শক্তিশালী ইঞ্জিন দরকার আর সেই ইঞ্জিনে জ্বালানি জ্বালানোর জন্য অক্সিজেন দরকার। উপর যেখানে বাতাসের ঘনত্ব কম সেখানে অক্সিজেনও কম তাই বেশি উচ্চতায় অক্সিজেনের অভাব হয়ে যায় বলে প্লেনের ইঞ্জিন কাজ করবে না!

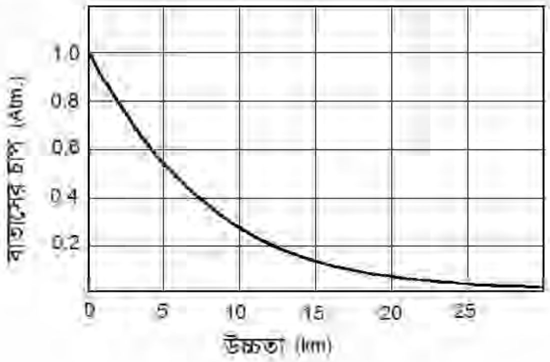

ছবি **5.4:** উচ্চতার সাথে বাতাসের চাপ কমে যায়

যারা পর্বতশৃঙ্গে ওঠে তাদের জন্যও সেই একই সমস্যা। যত উপরে উঠতে থাকে সেখানে বাতাসের চাপ কমে যাওয়ার সমস্যা থেকে অনেক বড় সমস্যা বাতাসের ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া। যারা পর্বতারোহণ করে সেজন্য তাদের অত্যন্ত কম অক্সিজেনে শুধু বেঁচে থাকা নয় পর্বতারোহণের মতো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ করা শিখতে হয়, সেজন্য তাদের শরীরকেও প্রস্তুত করতে হয়।

উদাহরণ 5.5: এভারেস্টের চূড়ায় $(29{,}029\ ft)$ বাতাসে কতটুকু অক্সিজেন আছে?

উত্তর: $29{,}029\ ft = 8{,}848m$

ছবির গ্রাফ থেকে দেখছি এই উচ্চতায় বাতসের চাপ পৃথিবী পৃষ্ঠে বাতাসের চাপের মাত্র 35% কাজেই সেখানে অক্সিজেনের পরিমাণও পৃথিবী পৃষ্ঠের অক্সিজেনের প্রায় $1/3$ বা এক-তৃতীয়াংশ।

5.3.1 টরিসেলির পরীক্ষা

তোমরা নিশ্চয়ই স্ট্র দিয়ে কখনো না কখনো কোল্ড ড্রিংকস খেয়েছ। কখনো কি চিন্তা করেছ স্ট্রতে চুমুক দিলে কেন কোল্ড ড্রিংকস তোমার মুখে চলে আসে? আসলে ব্যাপারটি ঘটে বাতাসের চাপের জন্য। ব্যাপারটি বোঝা খুব সহজ হতো যদি তুমি কখনো 34 ফুট লম্বা একটা স্ট্র দিয়ে কোল্ড ড্রিংকস খাওয়ার

চেষ্টা করতে। (ব্যাপারটি মোটেও বাস্তবসম্মত নয়— কিন্তু যুক্তির খাতিরে মেনে নাও!) তাহলে তুমি আবিষ্কার করতে ড্রিংকটা 32 ফুট পর্যন্ত উঠে হঠাৎ করে থেমে গেছে— আর যতই চুমুক দেওয়ার চেষ্টা কর ড্রিংকটা উপরে উঠছে না। (আমরা ধরে নিচ্ছি কোল্ড ড্রিংকের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের কাছাকাছি।)

পারদ মুখে নেয়ার মতো তরল নয় কিন্তু যুক্তির খাতিরে কল্পনা করো তুমি স্ট্র দিয়ে পারদ চুমুক দিয়ে মুখে আনার চেষ্টা করছ — যদি স্ট্রটি $76\ cm$ থেকে বেশি লম্বা হয় তাহলে তুমি আবিষ্কার করবে পারদ ঠিক $76\ cm$ উচ্চতায় এসে থেমে গেছে— তুমি যতই চুমুক দেওয়ার চেষ্টা কর পারদ আর উপর উঠবে না! পানির ঘনত্ব থেকে পারদের ঘনত্ব 13.6 গুণ বেশি, তাই পানি যেটুকু উচ্চতায় উঠেছে পারদ উঠেছে তার থেকে 13.6 গুণ কম।

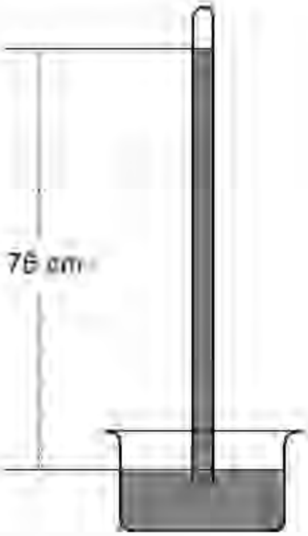

ছবি 5.5: বাতাসের চাপের কারণে পারদ ঠিক 76 cm উচ্চতায় স্থির হয়ে যায়।

এমনিতে একটি স্ট্র মুখে নিয়ে কোল্ড ড্রিংকসের বোতলে ধরে রাখলে কোল্ড ড্রিংকসটা উপরে উঠবে না— কারণ তোমার মুখের ভেতরে বাতাসের যে চাপ স্ট্র ডুবিয়ে রাখা তরলেও সেই একই বাতাসের চাপ— দুটো চাপই সমান, কাজেই এর ভেতরে কোনো কার্যকর বল নেই। এখন যদি তুমি চুমুক দাও— যার অর্থ তুমি মুখের ভেতরে শূন্যতা তৈরি করার চেষ্টা কর— তখন সেখানে বাতাসের চাপ কমে যায়। তখন তরলের উপরে বাতাসের চাপের জন্য তরলটা স্ট্র বেয়ে উপরে উঠে।

পারদ ব্যবহার করে বাতাসের চাপের এই পরীক্ষাটি বিজ্ঞানী টরিসেলি করেছিলেন 1643 সালে। তিনি অবশ্যি মুখ দিয়ে পারদকে একটি নল বেয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করেননি, তিনি এক মুখ বন্ধ একটা নলের ভেতর পারদ ভরে, নলটি পারদ ভরা একটা পাত্রে উল্টো করে রেখেছিলেন। পারদের উচ্চতা নামতে নামতে ঠিক $76\ cm$ এসে থেমে গেল। তুমি চুমুক দিয়ে খাবার সময় মুখের ভেতরে যে শূন্যতা তৈরি করার চেষ্টা কর কাচের নলের উপরে ঠিক সেই শূন্যতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাতাস পারদের উপরে চাপ দিচ্ছে এবং সেই চাপ তরলের সব জায়গায় সঞ্চালিত হয়ে নলের নিচেও এসেছে। নলের উপরে কোনো ফুটো নেই তাই সেদিকে দিয়ে বাতাস চাপ দিতে পারছে না। কাজেই সমতা আনার জন্য নলের নিচে এক মাত্র চাপ হচ্ছে $76\ cm$ স্তম্ভ পারদের ওজনের জন্য তৈরি হওয়া চাপ।

বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার (ছবি 5.5) এবং টরিসেলির এই পদ্ধতি দিয়ে তৈরি ব্যারোমিটারে এখনো বাতাসের চাপ মাপা হয়। বাতাসের চাপ বাড়লে পারদের উচ্চতা $76\ cm$ থেকে বেশি হয় চাপ কমলে উচ্চতা $76\ cm$ থেকে কমে যায়।

5.3.2 বাতাসের চাপ এবং আবহাওয়া

বাতাসের চাপের সাথে আবহাওয়ার খুব ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক আছে। তোমরা নিশ্চয়ই আবহাওয়ার খবরে অনেকবার সমুদ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার কথা শুনেছ, যার অর্থ সেখানে বাতাসের চাপ কমে গেছে। তখন চাপ সমান করার জন্য আশপাশের উচ্চ চাপ এলাকা থেকে বাতাস সেই নিম্নচাপের দিকে আসতে থাকে এবং মাঝে মাঝে একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, সেই ঘূর্ণিটি বিশেষ অবস্থায় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতার খবর তোমরা নিশ্চয়ই জান।

তোমরা যখন পরের অধ্যায়ে তাপ এবং তাপমাত্রা সম্পর্কে পড়বে তখন তোমরা জানতে পারবে যে বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সেটি প্রসারিত হয় বলে তার ঘনত্ব কমে যায় এবং চাপ কমে যায়। বাতাসের চাপ আরো কার্যকরভাবে কমে যদি তার মাঝে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। জলীয় বাষ্প হচ্ছে পানি যেখানে পানির অণুতে একটি অক্সিজেন এবং দুটি হাইড্রোজেন থাকে এবং পানির অণুর আণবিক ভর হচ্ছে $(16+1+1=)\,18$। বাতাসের মূল উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন (পারমাণবিক ভর 14) দুটো পরমাণু দিয়ে তৈরি হয় তাই তাদের আনবিক ভর $(14+14=)\,28$ এবং অক্সিজেন (পারমাণবিক ভর 16), এটিও দুটি পরমাণু দিয়ে তৈরি তাই আণবিক ভর $(16+16=)\,32$ যা পানির আণবিক ভর থেকে অনেক বেশি। তাই যখন বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে তখন বেশি আনবিক ভরের নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের বদলে কম আনবিক ভরের পানির অণু স্থান করে নেয় এবং বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়। বাতাসের ঘনত্ব কম হলে বাতাসের চাপও কমে যায়। কাজেই ব্যারোমিটারে বাতাসের চাপ দেখেই স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। ব্যারোমিটারে উচ্চ চাপ দেখালে বোঝা যায় বাতাস শুকনো এবং আবহাওয়া ভালো। চাপ কমতে থাকলে বোঝা যায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে। চাপ বেশি কম দেখালে বুঝতে হবে আশপাশের এলাকা থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে যাচ্ছে।

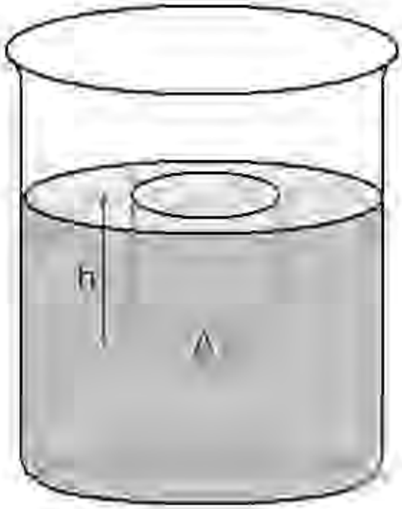

ছবি 5.6: তরলের উচ্চতার জন্যে নিচের পৃষ্ঠে চাপ সৃষ্টি হয়।

5.4 তরলের ভেতর চাপ (Pressure in Liquid)

যারা পানিতে ঝাপাঝাপি করেছে তারা সবাই জানে পানির গভীরে গেলে এক ধরণের চাপ অণুভব করা যায় (যদিও বায়ুমন্ডল আমাদের ওপর একটা চাপ দেয় কিন্তু আমরা সেটা অণুভব করি না– কারণ আমাদের শরীরও সমান পরিমাণ চাপ দেয়। পানি কিংবা অন্য কোনো তরলের গভীরে গেলে ঠিক কতটুকু চাপ অনুভব করা যাবে সেটি ইতোমধ্যে তোমাদের বলা হয়েছে– তোমার উপরে তরলের যে স্তম্ভটুকু থাকবে তার ওজন থেকেই তোমার উপরের চাপ নির্ণয় করতে হবে। ধরা যাক তুমি তরলের h গভীরতায় চাপ নির্ণয় করতে চাইছ। সেখানে A ক্ষেত্রফলের একটি পৃষ্ঠ কল্পনা করে নাও (5.6 ছবি)। তার উপরে তরলের যে স্তম্ভটুকু হবে সেখানকার তরলটুকুর ওজন A পৃষ্ঠে বল প্রয়োগ করবে।

A পৃষ্ঠের উপরের তরলটুকুর আয়তন Ah তরলের ঘনত্ব যদি ρ হয় তাহলে এই তরলের ওজন বা বল

$$F = mg = (Ah\rho)g$$

কাজেই চাপ :

$$P = \frac{F}{A} = \frac{Ah\rho g}{A} = h\rho g$$

অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘনত্বের তরলে গভীরতার সাথে সাথে চাপ বাড়তে থাকে। পানির বেলায় আনুমানিক প্রতি দশ মিটার গভীরতায় বাতাসের চাপের সমপরিমাণ চাপ বেড়ে যায়।

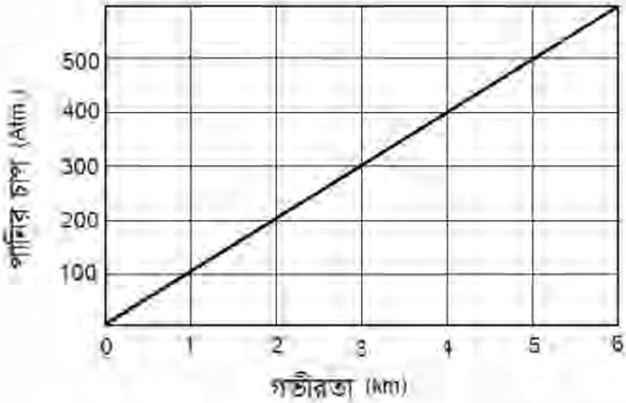

ছবি **5.7:** পানির গভীরতার সাথে সাথে পানির চাপ বেড়ে যায়।

বাতাস বা গ্যাসকে যে রকম চাপ দিয়ে সংকুচিত করে তার ঘনত্ব বাড়িয়ে ফেলা যায় তরলের বেলায় কিন্তু সেটি সত্যি নয় (কঠিনের বেলায় তো নয়ই!) তরলকে চাপ দিয়ে সে রকম সংকুচিত করা যায় না তাই তার ঘনত্ব বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না। 5.7 ছবিতে সমুদ্রের তলদেশ থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠে ওঠার সময় পানির চাপ কীভাবে কমতে থাকে সেটা দেখানো হয়েছে– যেহেতু পানির ঘনত্ব প্রায় সমান তাই চাপটা সমান হারে কমছে। সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপরে উঠতে উঠতে সমুদ্রপৃষ্ঠে পৌঁছানোর পর সেটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

উদাহরণ 5.6 : তিমি মাছ সমুদ্রেপৃষ্ঠ থেকে $2{,}100m$ গভীরতায় যেতে পারে সেটি কত চাপ সহ্য করতে পারে?

উত্তর : তিমি মাছ

$$P = \frac{2{,}100m}{10m/atm} = 210\ atm$$

চাপ সহ্য করতে পারে।

5.4.1 আর্কিমিডিসের সূত্র

তোমরা সবাই আর্কিমিডিসের সূত্র এবং সেই সূত্রের পেছনের গল্পটি জানা সূত্রটি সহজ, কোনো বস্তু তরলে নিমজ্জিত করলে বস্তুটি যে পরিমাণ তরল অপসারণ করে সেইটুকু তরলের ওজনের সমান ওজন হারায়। আমরা এখন এই সূত্রটি বের করব।

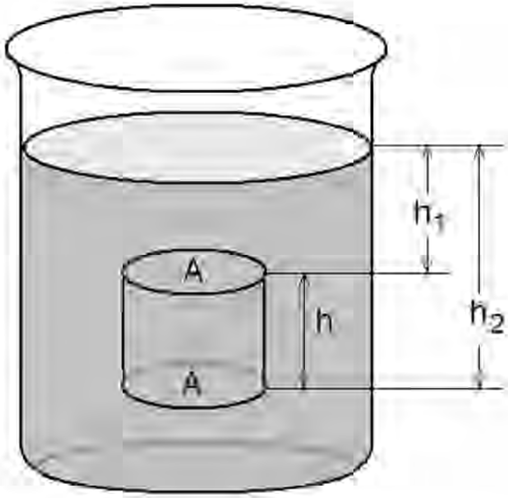

ছবি 5.8: একটি বস্তু যতটুকু তরল অপসারিত করে তার সমপরিমান ওজন হারায়।

পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে খানিকটা তরল পদার্থে একটা সিলিন্ডার ডোবানো রয়েছে। (এটি সিলিন্ডার না হয়ে অন্য যে কোনো আকৃতির বস্তু হতে পারত, আমরা হিসাবের সুবিধার জন্য সিলিন্ডার নিয়েছি।) ধরা যাক সিলিন্ডারের উচ্চতা h এবং উপরের ও নিচের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A আমরা কল্পনা করে নিই সিলিন্ডারটি এমনভাবে তরলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে যেন তার উপরের পৃষ্ঠটির গভীরতা h_1 এবং নিচের পৃষ্ঠের গভীরতা h_2.

আমরা অনেকবার তোমাদের বলেছি যে তরল (কিংবা বায়বীয়) পদার্থে চাপ কোনো নির্দিষ্ট দিকে কাজ করে না– এটি সব দিকে কাজ করে। কাজেই সিলিন্ডারের উপরের পৃষ্ঠে নিচের দিকে যে চাপ কাজ করে তার পরিমান

$$P_1 = h_1 \rho g$$

এবং নিচের পৃষ্ঠে উপরের দিকে যে চাপ কাজ করে তার পরিমাণ

$$P_2 = h_2 \rho g$$

কাজেই সিলিন্ডারে উপর পৃষ্ঠে নিচের দিকে এবং নিচের পৃষ্ঠে উপরের দিকে প্রয়োগ করা বল যথাক্রমে :

$$F_1 = AP_1 = Ah_1 \rho g$$

$$F_2 = AP_2 = Ah_2\rho g$$

পাশের পৃষ্ঠের বল নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না কারণ এক দিক থেকে যে বল অনুভব করে অন্যদিক থেকে ঠিক তার বিপরীত পরিমান বল অনুভব করে এবং একে অন্যকে কাটাকাটি করে দেয়। যেহেতু h_2 এর মান h_1 থেকে বেশি তাই দেখতে পাচ্ছি F_2 এর মান F_1 থেকে বেশি। কাজেই মোট বলটি হবে উপরের দিকে এবং তার পরিমাণ:

$$F = F_2 - F_1 = A(h_2 - h_1)\rho g$$
$$F = Ah\rho g$$

যেহেতু Ah হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তন, ρ তরলের ঘনত্ব এবং g মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ কাজেই উপরের দিকে প্রয়োগ করা বলের পরিমাণ হচ্ছে সিলিন্ডারের আয়তনের সমান তরলের ওজন– ঠিক যেটি আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত।

উদাহরণ 5.7 : পানির নিচে প্রতি $33\ ft\ (10m)$ গভীরতায় $1\ atm$ চাপ বেড়ে যায়। ডাইভাররা সর্বোচ্চ $1{,}000\ ft\ (330m)$ গভীর পর্যন্ত গিয়েছেন, সেখানে তাঁদের কতটুকু চাপ সহ্য করতে হয়েছে?

উত্তর : প্রতি $10m$ এ $1\ atm$ বা $1\ bar$ চাপ বেড়ে গেলে $330m$ গভীরতায়

$$\frac{330m}{10m/atm} = 33atm$$

$33\ atm$ চাপ সহ্য করতে হবে।

উদাহরণ 5.8: কেরোসিন (ঘনত্ব $800kg\ m^{-3}$) পানি (ঘনত্ব $1000kg\ m^{-3}$) এবং পারদ (ঘনত্ব $13{,}600kg\ m^{-3}$) এই তিনটি তরলের জন্য 50 cm নিচে চাপ বের কর।

উত্তর: চাপ $P = h\rho g$

কেরোসিনের জন্য

$$P = 0.50m \times 800kg\ m^{-3} \times 9.8\ Nkg^{-1} = 3{,}920\ Nm^{-2}$$

পানির জন্য

$$P = 0.50m \times 1000kg\ m^{-3} \times 9.8\ Nkg^{-1} = 4{,}900\ Nm^{-2}$$

পারদের জন্য

$$P = 0.50m \times 13{,}600kg\ m^{-3} \times 9.8\ Nkg^{-1} = 666{,}400\ Nm^{-2}$$

উদাহরণ 5.9: কেরোসিন পানি এবং পারদ এই তিনটি তরলের কতো গভীরতায় $1\ atm$ এর সমান চাপ হবে?

উত্তরঃ আমরা জানি পারদের জন্য $76\ cm$ গভীরতায় $1\ atm$ চাপ হয়। পানির ঘনত্ব পারদ থেকে 13.6 গুণ কম কাজেই পানির গভীরতা 13.6 গুণ বেশি হবে। অর্থাৎ পানির গভীরতা :

$$76\ cm \times 13.6 = 1034cm = 10.34m$$

কেরোসিনের ঘনত্ব পানির ঘনত্ব থেকে 0.8 গুণ কম কাজেই কেরোসিনের জন্য গভীরতা পানির গভীরতা থেকে $1/0.8 = 1.25$ গুণ বেশি হবে

$$10.34m \times 1.25 = 12.92m$$

5.4.2 বস্তুর ভেসে থাকা বা ডুবে যাওয়া

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কেন একটা বস্তু ভেসে থাকে আবার অন্য একটা বস্তু ডুবে যায়। পানিতে ডোবানো হলে সেটা যতটুকু পানি সরিয়েছে উপরের দিকে সেই পানির ওজনের সমান সমপরিমান বল অনুভব করে। সেই বলটি বস্তুটার ওজনের বেশি হলে বস্তুটা ভেসে থাকবে। ঠিক যে পরিমাণ ডুবে থাকলে বস্তুর সমান ওজনের পানি অপসারণ করবে– ততটুকুই ডুববে বাকি অংশটুকু পানিতে ডুবে যাবে না।

যদি বস্তুটার ওজন অপসারিত পানির ওজন থেকে বেশি হয় তাহলে সেটি পানিতে ডুবে যাবে। তবে পানিতে ডুবে থাকা অবস্থায় তার ওজন কিন্তু সত্যিকার ওজন থেকে কম মনে হবে।

যদি কোনোভাবে বস্তুটার ওজন অপসারিত পানির ওজনের ঠিক সমান করে ফেলা যায় তাহলে বস্তুটাকে পানির ভেতরে যেখানেই রাখা হবে সেটা সেখানেই থাকবে, উপরেও ভেসে উঠবে না, নিচেও ডুবে যাবে না। দৈনন্দিন জীবনে সে রকম কিছু চোখে না পড়লেও সাবমেরিনে এটি করা হয় পানির নিচে দিয়ে চলাচল করার জন্য।

উদাহরণ 5.10 : এক টুকরো কাঠ পানিতে ভাসিয়ে দিলে তার কত শতাংশ ডুবে থাকবে?

উত্তর : কাঠের ঘনত্ব $\rho = 0.5 \times 10^3 kg/m^3$ পানির ঘনত্ব $\rho_W = 10^3 kg/m^3$
কাঠকে ভেসে থাকতে হলে তার ডুবন্ত অংশের সমপরিমাণ পানির ভর কাঠের ভরের সমান হতে হবে। অর্থাৎ যদি কাঠের আয়তন V হয় এবং V_1 অংশ পানিতে ডুবে থাকে তাহলে,

$$V\rho = V_1 \rho_W$$

$$\frac{V_1}{V} = \frac{\rho}{\rho_W} = \frac{0.5 \times 10^3 kg/m^3}{10^3 kg/m^3} = 50\%$$

উদাহরণ 5.11: $10kg$ ভরের একটা কাঠ নদীর পানিতে ভেসে ভেসে সমুদ্রে গেল। নদীর পানিতে সেটি অর্ধেক ডুবেছিল, সমুদ্রে কতটুকু ডুববে? (সমুদ্রের পানির ঘনত্ব $\rho_S = 1.03 \times 10^3 kg/m^3$)

উত্তর : নদীর পানির ঘনত্ব $\rho_W = 10^3 kg/m^3$,
কাঠের আয়তন V ঘনত্ব ρ হলে কাঠের ওজন $V\rho$
নদীর পানিতে অর্ধেক ডুবে থাকে কাজেই

$$V\rho = \frac{1}{2} V\rho_W$$

কাঠের ঘনত্ব

$$\rho = \frac{1}{2}\rho_W = 0.5 \times 10^3 kg/m^3$$

সমুদ্রের পানিতে V_1 পরিমাণ ডুবে থাকলে

$$V\rho = V_1\rho_S$$

$$\frac{V_1}{V} = \frac{\rho}{\rho_S} = \frac{0.5 \times 10^3 kg/m^3}{1.03 \times 10^3 kg/m^3} = 48.5\%$$

উদাহরণ 5.12: ধরা যাক আর্কিমিডিসের সোনার মুকুটের ওজন বাতাসে $10\ kg$ এবং পানিতে ডুবিয়ে ওজন করলে $9.4\ kg$ হয়েছে। মুকুটের ঘনত্ব কত?

উত্তর: মুকুটের আয়তন V ঘনত্ব ρ হলে

$$V\rho = 10\ kg$$

এবং $V\rho - V\rho_W = 9.4\ kg$

$$V\rho_W = V\rho - 9.4kg = 10kg - 9.4kg = 0.6kg$$

$$V = \frac{0.6kg}{\rho_W} = \frac{0.6kg}{10^3 kg/m^3} = 0.6 \times 10^{-3} m^3$$

$$\rho = \frac{10kg}{V} = \frac{10kg}{0.6 \times 10^{-3} m^3} = 16{,}666\ kg/m^3$$

সোনার আসল ঘনত্ব $19{,}300\ kg/m^3$ কাজেই বোঝাই যাচ্ছে এই মুকুটে খাদ মেশানো আছে!!

5.4.3 প্যাস্কেলের সূত্র

এই অধ্যায়ে আমরা অনেকবার দেখিয়েছি যে তরল পদার্থের চাপ প্রয়োগ করলে সেটা চারিদিকে সঞ্চালিত হয়। তোমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। তার কারণ এই চাপটুকু যদি পুরো

তরল পদার্থে সঞ্চালিত না হয় তাহলে তরলের এক অংশে চাপ বেশি এবং অন্য অংশে চাপ কম থাকবে, কাজেই সেখানে একটা প্রস্থচ্ছেদ কল্পনা করে নিলে এক দিক থেকে আরোপিত বল অন্যদিক থেকে আরোপিত বল থেকে বেশি হবে এবং এই বলের কারণে তরলটি প্রবাহিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চাপ সমান হয়ে যায়। প্যাস্কেল এই বিষয়টি একটা সূত্র হিসেবে দিয়েছিলেন, সেটি এ রকম :

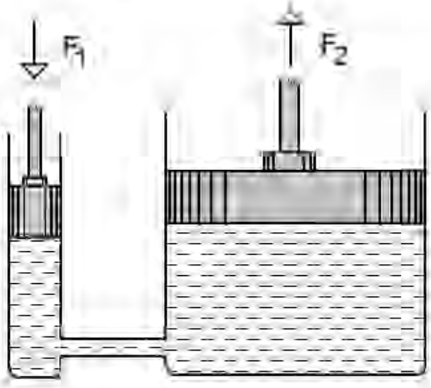

ছবি 5.9: F_1 বল প্রয়োগ করলে প্রস্থচ্ছেদের উপর নির্ভর করে অন্য দিকে F_2 বল পাওয়া যায়।

প্যাস্কেলের সূত্র: একটি আবদ্ধ পাত্রে তরল বা বায়বীয় পদার্থে বাইরে থেকে চাপ দেয়া হলে সেই চাপ সমানভাবে সঞ্চালিত হয়ে পাত্রের সংলগ্ন গায়ে লম্ব ভাবে কাজ করবে।

প্যাস্কেলের এই সূত্রটি ব্যবহার করে অত্যন্ত চমকপ্রদ কিছু যন্ত্র তৈরি করা যায়। 5.9 ছবিতে সে রকম একটি যন্ত্র দেখানো হয়েছে, এখানে পাশাপাশি দুটি সিলিন্ডার একটি নল দিয়ে সংযুক্ত। ধরা যাক একটি সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদ A_1 অন্যটির A_2 এবং তুমি A_1 প্রস্থচ্ছেদের সিলিন্ডারে F_1 বল প্রয়োগ করেছ তাহলে তোমার প্রয়োগ করা চাপ

$$P = \frac{F_1}{A_1}$$

এখন এই চাপ এই তরলের মাধ্যমে চারিদিকে সঞ্চালিত হবে এবং দ্বিতীয় সিলিন্ডারের প্রস্থচ্ছেদেও প্রয়োগ করবে।

কাজেই দ্বিতীয় সিলিন্ডারে প্রয়োগ করা বলের পরিমাণ হবে

$$F_2 = PA_2 = F_1\left(\frac{A_2}{A_1}\right)$$

কাজেই তুমি চমৎকৃত হয়ে দেখতে পাচ্ছ যদি $(\frac{A_2}{A_1})$ এর মান 100 হয় তাহলে তুমি প্রথম সিলিন্ডারে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছ দ্বিতীয় সিলিন্ডারে তার থেকে 100 গুণ বেশি বল পেয়ে যাচ্ছ!

এই পদ্ধতিটি খুব কার্যকর, বড় বড় কলকারখানা কিংবা বিমানের নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে তোমরা একটা জিনিষ জেনে রাখো এটি বলবৃদ্ধিকরণ নীতি– এই পদ্ধতিতে শক্তি কিন্তু মোটেও বাড়ানো যায় না– তুমি প্রথম সিলিন্ডারে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করবে দ্বিতীয় সিলিন্ডারে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ফিরে পাবে।

উদাহরণ 5.13: দেখাও যে বল বৃদ্ধি করা হলেও যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ফিরে পাচ্ছ।

উত্তর: ধরা যাক ছোট পিস্টনে F_1 বল প্রয়োগ করা হয়েছে এবং পিস্টনটি l_1 দূরত্ব অতিক্রম করেছে, কাজেই কাজের পরিমাণ

$$W_1 = F_1 l_1$$

বড় পিস্টনে বলের পরিমাণ

$$F_2 = F_1\left(\frac{A_2}{A_1}\right)$$

যেহেতু ছোট পিস্টন অপসারিত তরলটুকু বড় পিস্টনটিকে l_2 দূরত্ব ঠেলে নিয়ে যায়, কাজেই

$$l_1 A_1 = l_2 A_2$$

বড় পিস্টনের অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$l_2 = l_1\left(\frac{A_1}{A_2}\right)$$

কাজেই কাজের পরিমাণ

$$W_2 = F_2 l_2 = F_1\left(\frac{A_2}{A_1}\right) l_1\left(\frac{A_1}{A_2}\right) = F_1 l_1$$

অর্থাৎ দুটি পিস্টনেই সমান।

5.5 স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)

তোমরা সবাই কখনো না কখনো একটা স্প্রিং কিংবা একটা রবার ব্যান্ড টেনে লম্বা করে আবার ছেড়ে দিয়েছ। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ স্প্রিং কিংবা রবার ব্যান্ডকে টেনে ছেড়ে দেয়া হলে সেটি আবার আগের দৈর্ঘ্যে ফিরে এসেছে। টেনে ধরাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বল প্রয়োগ করা আর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হওয়াকে বলা হয় বিকৃতি ঘটা। দৈনন্দিন জীবনে বিকৃতি শব্দটি খুবই নেতিবাচক— কিন্তু এখানে এটিকে তোমরা নেতিবাচক হিসেবে দেখো না — এটি হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন মাত্র।

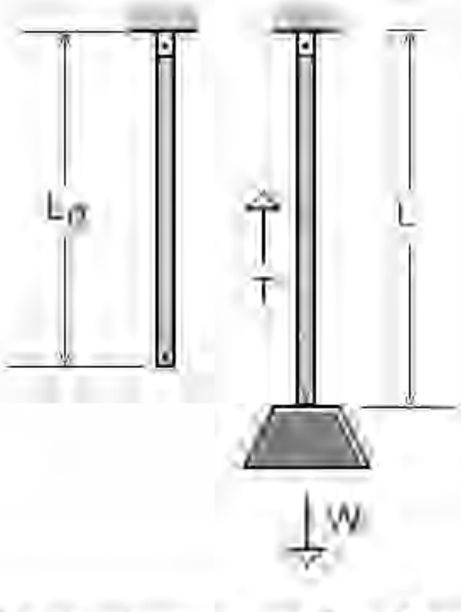

ছবি 5.10: বল প্রয়োগ করে পীড়ন সৃষ্টি করলে দৈর্ঘ্যের বিকৃতি হয়।

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছ যখন কোনো বস্তুকে বল প্রদান করা হয় তখন তার ভিতরে একটা বিকৃতি ঘটে। (এবং এই বিকৃতির জন্য একটা পাল্টা বলের তৈরি হয়) বলটি সরিয়ে নিলে বিকৃতির

অবসান ঘটে আর বস্তুটি আবার তার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। পদার্থের এই ধর্মের নাম স্থিতিস্থাপকতা। তবে মনে রাখতে হবে কতটুকু বল প্রয়োগ করা যাবে তার একটা সীমা আছে– এই সীমা অতিক্রম করে ফেললে পদার্থ তার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে না– তার মাঝে একটা স্থায়ী বিকৃতি ঘটে যেতে পারে। এই সীমাকে স্থিতিস্থাপক সীমা বলে। একটা রডকে অল্প একটু বাঁকা করে ছেড়ে দিলে সেটা সোজা হয়ে যায়– বেশি বাঁকা করলে বাঁকা হয়েই থাকে আর সোজা হয় না। কাজেই আমরা বিষয়টা এভাবে বলতে পারি :

বিকৃতি: বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করলে পদার্থের আকার বা দৈর্ঘ্যের যে আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে বিকৃতি। অর্থাৎ L_0 দৈর্ঘ্যের একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা হলে তার দৈর্ঘ্য যদি L হয় তাহলে বিকৃতি হচ্ছে

$$\frac{L - L_0}{L_0}$$

দেখাই যাচ্ছে বিকৃতির কোনো একক নেই, এটি একটি সংখ্যা মাত্র

পীড়ন: একক ক্ষেত্রফলে বিকৃতির কারণে পদার্থের ভেতর যে বল তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে পীড়ন। অর্থাৎ A প্রস্থচ্ছেদের একটা বস্তুতে বল প্রয়োগ করা হলে যদি তার বিকৃতি ঘটে সেই বিকৃতি যদি F প্রতিরোধ বল তৈরি করে তাহলে পীড়ন হচ্ছে

$$\frac{F}{A}$$

দেখতেই পাচ্ছ এটা চাপের মতো এবং এর একক P বা প্যাস্কেল। আমরা যদি পীড়ন এবং বিকৃতি বুঝে থাকি তাহলে হুকের সূত্রটি বোঝা খুব সহজ: পীড়ন এবং বিকৃতি সমানুপাতিক

পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

কাজেই পীড়ন $=$ ধ্রুবক $\times$ বিকৃতি

অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের পীড়ন এবং বিকৃতির সাথে সম্পর্ক যুক্ত একটা ধ্রুবক থাকে সেই ধ্রুবকটার নাম স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক।

টেবিল 5.2: বিভিন্ন পদার্থের ইয়াংস মডুলাস

পদার্থ	G-Pa
রবার	0.01-0.1
হাড়	9
কাঠ	10
কাচ	50 - 90
অ্যালুমিনিয়াম	69
তামা	117
লোহা	200
হীরা	1220

দুটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা বোঝা আরো সহজ হবে :

(i) ধরা যাক A প্রস্থচ্ছেদের একটা তারের দৈর্ঘ্য L_0, এর সাথে W ওজনের একটা ভর ঝুলিয়ে দেয়া হলো এই বলটি ঝোলানের কারণে L_0 দৈর্ঘ্যটি বেড়ে হলো L (ছবি 5.10) এই বর্ধিত দৈর্ঘ্য তারটির ভেতরে একটা পালটা বল তৈরি করেছে T

(এখানে T অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়ে টেনশন Tention শব্দটির জন্য। সাধারণত যখন কোনো তারকে টানা হয় তখন তার ভেতরে যে বল কাজ করে তার নাম টেনশন।) কাজেই পীড়ন হচ্ছে $\frac{T}{A}$ এবং বিকৃতি হচ্ছে

$$\frac{L-L_0}{L_0}$$

কাজেই

$$\frac{T}{A} \propto \frac{L-L_0}{L_0}$$

কিংবা

$$\frac{T}{A} = Y\left(\frac{L-L_0}{L_0}\right)$$

এখানে Y হচ্ছে একটা ধ্রুবক এই ধ্রুবকের নাম ইয়াংস মডুলাস (Young's Modulus)। যেহেতু বিকৃতির কোনো একক নেই তাই Y এর একক হচ্ছে Nm^{-2}. টেবিল 5.2 এ কয়েকটি পদার্থের ইয়াংস মডুলাস দেয়া হলো।

উদাহরণ 5.13: ইয়াংস মডুলাসের মান বেশি হলে পদার্থ কীভাবে দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে।

উত্তর: দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের হার

$$\frac{L-L_0}{L_0} = \frac{1}{Y}\left(\frac{T}{A}\right)$$

কাজেই T/A যদি সমান হয় Y যত বেশি হবে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন তত কম হবে।

(ii) ধরা যাক একটি সিলিন্ডারে সাধারণ অবস্থায় V_0 আয়তনের গ্যাস আছে। এই গ্যাসে P চাপ দেয়ার কারণে সিলিন্ডারের আয়তন কমে হয়ে গেল Y. এখানে পীড়ন হচ্ছে P এবং বিকৃতি হচ্ছে:

$$\frac{V-V_0}{V_0}$$

কাজেই আমরা লিখতে পারি

$$P \propto \left(\frac{V-V_0}{V_0}\right)$$

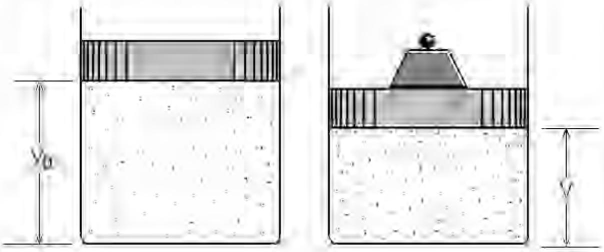

ছবি 5.11: আবদ্ধ বাতাসে চাপ প্রয়োগ করলে বাতাস সংকুচিত

$$P = B\left(\frac{V - V_0}{V_0}\right)$$

এখানে B হচ্ছে ধ্রুবক এবং এই ধ্রুবকের নাম বাল্ক মডুলাস (Bulk Modulus)। B এর একক হচ্ছে Nm^{-2} কিংবা প্যাস্কেল।

5.6 পদার্থের আণবিক গতিতত্ত্ব (Kinetic Theory of Molecule)

তোমরা নিশ্চয়ই জান বিশ্বের সবকিছু তৈরি হয়েছে অণু দিয়ে। (অবশ্যি অণু মৌলিক কণা নয়, অণু তৈরি হয়েছে পরমাণু দিয়ে, পরমাণু তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াস দিয়ে নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে, প্রোটন এবং নিউট্রন তৈরি হয়েছে কোয়ার্ক দিয়ে এবং বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন ইলেকট্রন কিংবা কোয়ার্ক তৈরি হয়েছে স্ট্রিং দিয়ে।) যেহেতু একটা পদার্থের ধর্ম তার অণুতে বজায় থাকে তাই আমরা অণুকেই পদার্থের সবচেয়ে ছোট একক হিসেবে ধরে নেই। যেমন পানির অণুতে পানির সব ধর্ম আছে কিন্তু পানিকে তার পরমাণুতে ভেঙ্গে দিলে সেটি আর পানি থাকে না– সেটা হয়ে যাবে একটা অক্সিজেন আর দুইটা হাইড্রোজেনের পরমাণুতে, দুটোই গ্যাস।

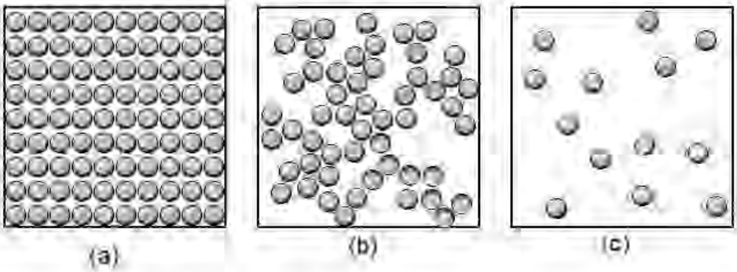

ছবি 5.12: (a) কঠিন, (b) তরল এবং (c) গ্যাস।

একটা পদার্থে তার অণুগুলো কীভাবে আছে তার ওপর নির্ভর করে সেটি কি কঠিন তরল নাকি গ্যাস। এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে পানি, এটি কঠিন তরল কিংবা গ্যাস তিন রূপেই থাকতে পারে– তার অণুগুলো কীভাবে আছে তার উপর নির্ভর করছে এটি কি বরফ, পানি নাকি জলীয় বাষ্প। যখন কোনো পদার্থ গ্যাস অবস্থায় থাকে তখন তার অণুগুলো থাকে মুক্ত অবস্থায় একটি থেকে অন্যটির মাঝে দূরত্ব অনেক বেশি। যখন তরল অবস্থায় থাকে তখন অণুগুলো তুলনামূলক ভাবে কাছে হলেও একটার সাপেক্ষে অন্যটি নড়তে পারে। কঠিন অবস্থায় অণুগুলো কাছাকাছি থাকে কিন্তু একটি অণু অন্য অণুর সাপেক্ষে নড়তে পারে না।

একটা গ্যাসের অণুগুলোর মাঝে দূরত্ব অনেক বেশি সেগুলোর কোনো নির্দিষ্ট আয়তন বা আকার নেই। তরল পদার্থের গ্যাসগুলো কাছাকাছি, তাদের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও কোনো নির্দিষ্ট

আকার নেই। কঠিন পদার্থের অণুগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকে তাই তাদের নির্দিষ্ট আয়তন এবং নিয়মিত আকার আছে।

গ্যাসে অণুগুলো মুক্তভাবে ছোটাছুটি করতে পারে, তরলে অণুগুলো কাঁপে এবং একটার পাশ দিয়ে অন্যটি চলে যেতে পারে, কঠিন পদার্থে অণুগুলো নিজ অবস্থানে থেকে কাঁপলেও স্থান পরিবর্তন করতে পারে না।

এমনিতে আমরা কঠিন তরল বা গ্যাস কোনোটিরই অণুকে দেখতে পাই না, এটাকে কঠিন তরল বা গ্যাস হিসেবে দেখি। উপরে অণুগুলোর যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তাদের কঠিন তরল বা গ্যাসীয় অবস্থাতেও সেটা প্রকাশ পায়। যেমন :

গ্যাস:

আনবিক ধর্ম	গ্যাসে তার প্রতিফলন
অনুগুলো একটা আরেকটার পাশে ছুটতে পারে	যে পাত্রে রাখা হয় তার পুরো আয়াতনে ছড়িয়ে পড়ে।
অনুগুলোর মাঝে দূরত্ব বেশি ফাঁকা জায়গা রয়েছে	গ্যাসকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায়।
একটু অণু অন্য অণুর সাপেক্ষে ছুটতে পারে	গ্যাস সহজে প্রবাহিত হয়।

তরল:

আনবিক ধর্ম	তরল পদার্থে তার প্রতিফলন
অণুগুলো একটা আরেকটার পাশে দিয়ে যেতে পারে	সহজে প্রবাহিত হয়, যে পাত্রে রাখা হয় তার আকার ধারণ করে।
অণুগুলো কাছাকাছি বলে ফাঁকা জায়গা নেই	তরলকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায় না।

কঠিন:

আনবিক ধর্ম	কঠিন পদার্থে তার প্রতিফলন
অণুগুলো নিজ অবস্থানে দৃঢ়	নির্দিষ্ট আকার থাকে
অণুগুলোর মাঝে দূরত্ব নেই	চাপ দিয়ে সংকুচিত করা যায় না।
অণুগুলো নিজ অবস্থানে আটকা পড়ে থাকে	ঢেলে প্রবাহিত করা যায় না।

5.6.1 পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

কঠিন তরল এবং গ্যাস এই তিনটি ভিন্ন অবস্থার বাইরেও পদার্থের চতুর্থ আরেকটি অবস্থা হতে পারে– এর নাম প্লাজমা। আমরা জানি অণু কিংবা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টি পজিটিভ চার্জের প্রোটন থাকে তার বাইরে ঠিক সেই কয়টি নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন থাকে। সে কারণে একটা অণু কিংবা পরমাণুর সম্মিলিত চার্জ শূন্য। বিশেষ অবস্থায় অণু কিংবা পরমাণুকে আয়নিত করে ফেলা যায় কিছু পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে মুক্ত করে ফেলা যায় তখন আলাদা আলাদাভাবে পরমাণুগুলো আর চার্জ নিরপেক্ষ থাকে না– ইলেকট্রন এবং আয়নের এক ধরনের মিশ্রনে তৈরি হয়। এটি যদিও গ্যাসের মতো থাকে কিন্তু গ্যাসের সব ধর্ম এর জন্য সত্যি নয়। যেমন আমরা জানি গ্যাসের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে প্লাজমার নির্দিষ্ট আকার তৈরি করে ফেলা যায়।

প্রচণ্ড তাপ দিয়ে গ্যাসকে প্লাজমা করা যায়, শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করেও প্লাজমা করা যায়। আমাদের ঘরে টিউবলাইটের ভেতর প্লাজমা তৈরি হয়, নিওন সাইনের যে উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন দেখা যায় সেগুলোর ভেতরেও প্লাজমা থাকে। বজ্রপাত হলে যে বিজলীর আলো দেখা যায় সেটিও প্লাজমা আবার দূর নক্ষত্রের মাঝেও যে পদার্থ সেটিও প্লাজমা অবস্থায় আছে। আমরা বর্তমানে ফিউশান পদ্ধতিতে ভারী নিউক্লিয়াসকে ভেঙে নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহার করি। হালকা নিউক্লিয়াসকে একত্র করে ফিউশান পদ্ধতিতে শক্তি তৈরি করার জন্য প্লাজমা ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় এবং এটি এখন পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

ছবি **5.13:** একজন সাধু পেরেকের বিছানায় শুয়ে আছে।

1. এক গ্লাস পানিতে এক টুকরো বরফ ভাসছে, বরফটি গলে যাবার পর গ্লাসে পানির উচ্চতা কি বেড়ে যাবে নাকি সমান থাকবে?
2. একটি অতি বিশাল জাহাজকে মাত্র কয়েক বালতি পানির মাঝে ভাসিয়ে রাখা সম্ভব। কীভাবে?
3. একটি সুইমিংপুলে একটা ছোট নৌকার মাঝে তুমি একটা বড় পাথর নিয়ে বসে আছ। পাথরটি নৌকার ভেতর থেকে নিয়ে সুইমিংপুলের পানিতে ফেলে দিলে। সুইমিংপুলে পানির উচ্চতা কি বেড়ে যাবে, সমান থাকবে নাকি কমে যাবে?
4. সাধুরা পেরেকের বিছানায় শুয়ে থাকে। চাইলে তুমিও পারবে। কেন?
5. টরিসেলির পারদের তৈরি ব্যারোমিটারের কাচের নলটি যদি সোজা না হয়ে আঁকাবাঁকা হয় তাহলে কী কাজ করবে?

গাণিতিক সমস্যা :

1. বাতাসের ঘনত্ব $0.0012gm/cm^3$, সোনার ঘনত্ব $19.30gm/cm^3$, একটা নিক্তিতে $1\,kg$ সোনা মাপা হলে তার প্রকৃত ভর কত?
2. পারদের পরিবর্তে কেরোসিন দিয়ে ব্যারোমিটার তৈরি করলে তার উচ্চতা কত হবে? কেরোসিনের ঘনত্ব $0.8gm/cm^3$)
3. সোনার মুকুট এবং তার ওজনের সমান খাটি সোনা একটি দণ্ডের দুই পাশে ঝুলিয়ে সেটা পানিতে ডোবানো হলে (ছবি 5.14) যদি দেখা যায় পানির নিচে সোনার মুকুটের ওজন কম তাহলে তুমি মুকুটটি সম্পর্কে কী বলবে? খাঁটি না খাদ মেশানো? কেন?

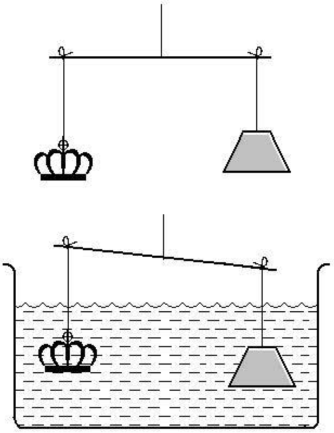

ছবি 5.14: সোনার মুকুট ও খাঁটি সোনা পানিতে ডুবানো হচ্ছে।

4. পানিভর্তি দুটি সিলিন্ডার একটি নল দিয়ে লাগানো। সিলিন্ডার দুটির প্রস্থচ্ছেদ $1cm^2$ এবং $1m^2$ এবং নিচ্ছিদ্রভাবে দুটি পিস্টন লাগানের আছে। বড় পিস্টনের উপর $70kg$ ওজনের একজন মানুষ বসে আছে, তাকে ওপরে তুলতে ছোট পিস্টনে তোমাকে কত বল প্রয়োগ করতে হবে?
5. উপর থেকে ঝোলানো $0.5m$ লম্বা এবং $0.01m^2$ প্রস্থচ্ছেদের একটা ধাতব দণ্ডের নিচে একটি $10kg$ ভর ঝোলানোর পর তার দৈর্ঘ্য হয়েছে $0.501m$. এই ধাতব দণ্ডটির ইয়াংস মডুলাস কত?

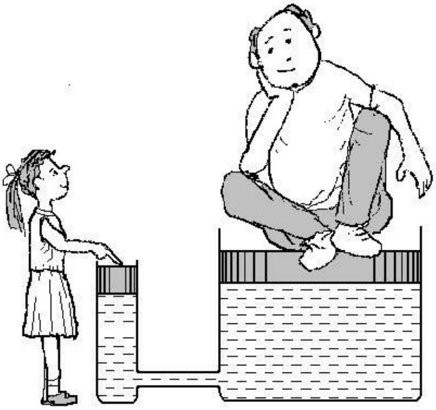

ছবি 5.15: হাইড্রোলিক প্রেসে চাপ দিয়ে একটি মানুষকে উপরে তোলা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বস্তুর উপর তাপের প্রভাব

(Effect of Heat on Matter)

Ludwig Boltzman(1844-1906)

লুডউইগ বোল্টজম্যান

লুডউইগ বোল্টজম্যান ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। তাঁকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের জনক বলা যায় যেখানে অণু-পরমাণুর গতিবিধি থেকে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র বের করে নিয়ে আসা যায়। তিনি একই সাথে বড় দার্শনিক ছিলেন এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন বক্তা ছিলেন। তাঁর এক ধরনের মানসিক সমস্যা ছিল এবং তাঁর কারণেই আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন।

6.1 তাপ ও তাপমাত্রা (Heat and Temperature)

তাপ এক ধরনের শক্তি। আমরা দেখেছি শক্তি কাজ করতে পারে অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে বস্তুকে বলের দিকে সরাতে পারে, যেমন ট্রেন বা গাড়িতে আসলে জ্বালানি তেল জ্বালিয়ে তাপ তৈরি করা হয় যেটা ট্রেন গাড়িকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। সেজন্য আলো, বিদ্যুৎ বা গতিশক্তির মতো আমরা নূতন ধরনের এই শক্তির নাম দিয়েছি তাপ শক্তি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা যদি আণবিক পর্যায়ে দেখতে পেতাম অর্থাৎ যে কোনো পদার্থের দিকে তাকালেই তার অণুগুলোকে দেখতে পেতাম তাহলে সম্ভবত তাপ শক্তি নামে একটা নূতন নাম না দিয়ে এটাকে "গতি শক্তি" নামেই রেখে দিতাম। তার কারণ তাপ শক্তি বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেটা আসলে পদার্থের অণুগুলোর সম্মিলিত গতিশক্তি ছাড়া কিছু নয়। একটা কঠিন পদার্থে অণুগুলো যখন উত্তপ্ত হয় তখন অণুগুলো নিজের নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে কাঁপতে থাকে। যতবেশি উত্তপ্ত হবে অণুগুলোর কাঁপুনী তত বেড়ে যাবে। যদি অনেক বেশি উত্তপ্ত হয় তাহলে অণুগুলোর নিজেদের ভেতরে যে

আন্তঃআণবিক বল রয়েছে অণুগুলো সেই বলকে ছাড়িয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আমরা সেটাকে বলি তরল। তখন অণুগুলো এলোমেলোভাবে একে অন্যের ভেতর দিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে– তাদের একটা গতি থাকে, কাজেই গতি শক্তি থাকে। যত উত্তপ্ত করা হয় অণুগুলো তত জোরে ছোটাছুটি করে। যদি আরো উত্তপ্ত করা হয় তখন অণুগুলো আণবিক বন্ধন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যেতে পারে– আমরা তখন সেটাকে বলি গ্যাস। একটা গ্যাসকে যত উত্তপ্ত করা হবে অণুগুলো তত জোরে ছোটাছুটি করবে। গতি যত বেশি হবে গতি শক্তি তত বেশি হবে।

যেহেতু খালি চোখে আমরা অণুগুলোকে দেখি না তাদের ছোটাছুটি দেখি না তাই আমরা পরোক্ষভাবে পুরো জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি, আমরা সেটাকে তাপ শক্তি নাম দিই এবং তাপমাত্রা বলে পদার্থের অবস্থা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। কাজেই আমরা বলতে পারি পদার্থের অণুগুলোর কম্পন বা গতির কারণে যে শক্তি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে তাপ। যেহেতু এটা শক্তি তাই স্বাভাবিকভাবে অন্য শক্তির মতোই তার একক হচ্ছে জুল (J). তাপের আরো একটি একক আছে, তার নাম ক্যালোরি (cal) $1\ gm$ পানির তাপমাত্রা $1\ ℃$ বাড়তে হলে যে পরিমাণ তাপের দরকার সেটা হচ্ছে 1 ক্যালোরি। 1 ক্যালোরি হচ্ছে $4.2J$ এর সমান।

তোমরা হয়তো খাবারের জন্য ক্যালোরি শব্দটি ব্যবহার করতে শুনেছ –ফুড ক্যালোরি বলতে আসলে বোঝানো হয় মানুষ নির্দিষ্ট খাবার থেকে কী পরিমাণ শক্তি পায় এবং এটার জন্য একক আসলে $k\ cal$ বা 1000 ক্যালোরি। তবে সেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না – এখানে আমরা খাবার থেকে পাওয়া শক্তি নয় তাপ শক্তি নিয়েই আলোচনা করব।

6.2 আভ্যন্তরীণ শক্তি (Internal Energy)

আমরা যদি তাপকে একটা শক্তি হিসেবে মেনে নিই, তাহলে সাথে সাথে এর পরের যে বিষয়টা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে কীভাবে তাপ শক্তি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। সাধারণ ভাবে আমাদের ধারণা সব সময়েই শক্তির প্রবাহ হয় বুঝি বেশি শক্তি থেকে কম শক্তিতে। ছোট একটা গরম আলপিনে যে পরিমাণ তাপ শক্তি রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি তাপ শক্তি রয়েছে এক গ্লাস পানিতে। কিন্তু গরম আলপিনটা আমরা যদি পানিতে ডুবিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আলপিনের অল্প তাপ শক্তি থেকেই খানিকটা চলে যাবে গ্লাসের পানিতে। তার কারণ তাপ শক্তির প্রবাহটা তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে তাপমাত্রার উপরে। দুটো ভিন্ন তাপমাত্রার জিনিস যদি একে অন্যের সংস্পর্শে আসে তাহলে সব সময়ই বেশি তাপমাত্রা থেকে তাপ কম তাপমাত্রার জিনিসে যেতে থাকবে যতক্ষণ না দুটোর তাপমাত্রা সমান হচ্ছে।

আমরা এখনো কিন্তু "তাপমাত্রা" নামের রাশিটি সংজ্ঞায়িত করিনি– কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এটি এত ব্যবহার হয় যে বিষয়টি কী বুঝতে কারোই সমস্যা হয় না। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি এটা হচ্ছে পদার্থের ভেতরকার অণুগুলোর গড় গতিশক্তির একটা পরিমাপ। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, তাপমাত্রা হচ্ছে সেই তাপীয় অবস্থা যেটি ঠিক করে একটা বস্তু অন্য বস্তুর সংস্পর্শে এলে সেটি কি তাপ দেবে নাকি তাপ নেবে। বিষয়টা বোঝানের জন্য আমরা পানির পৃষ্ঠদেশের উচ্চতার সাথে তুলনা করতে পারি (ছবি 6.1)। যদি পানির দুটি পাত্রে পানির পৃষ্ঠ দেশের উচ্চতা ভিন্ন হয়– তাহলে পাত্র দুটিকে একটি নল দিয়ে একত্র করার পর কোন পাত্রে পানি বেশি কোন পাত্রে পানি কম সেটি পানির প্রবাহ ঠিক করবে না। কোন পাত্র থেকে কোন পাত্রে পানি যাবে সেটা নির্ভর করবে– কোন পাত্রের পানির পৃষ্ঠ দেশের উচ্চতা কত তার ওপর। সব সময়েই বেশি উচ্চতা থেকে পানি কম উচ্চতায় প্রবাহিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটি উচ্চতা সমান হয়ে যাচ্ছে। এখানে পানির পরিমাণটাকে তাপ শক্তির সাথে তুলনা করতে পারি, পানির পৃষ্ঠ দেশের উচ্চতাকে তুলনা করতে পারি তাপমাত্রার সাথে। তাপমাত্রার বেলাতেও এটা সত্যি যে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটি বস্তুর তাপমাত্রা সমান না হচ্ছে ততক্ষণ তাপ প্রবাহিত হতে থাকবে।

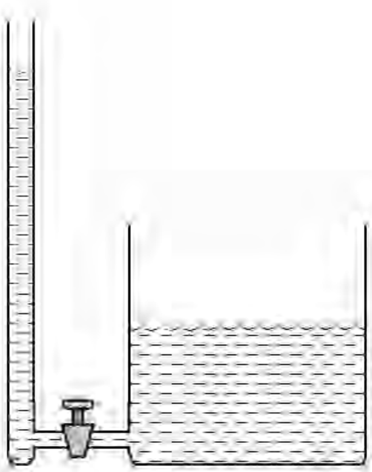

ছবি 6.1: তাপমাত্রা তরলের উচ্চতার মত, তাপ তরলের আয়তনের মত

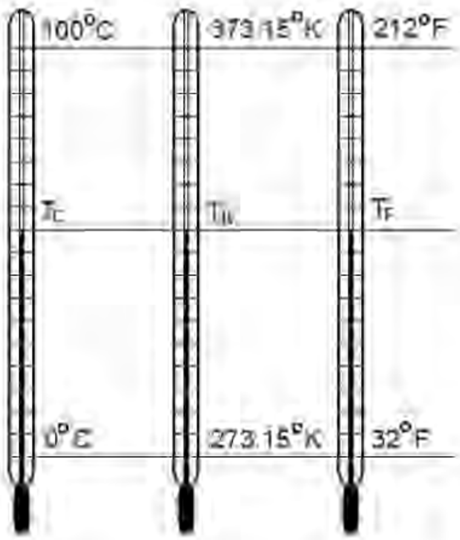

ছবি 6.2: সেলসিয়াস কেলভিন এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার স্কেল।

আমরা যদি তাপমাত্রার ধারণাটুকু ঠিক করে পেয়ে যাই তাহলে এর পরেই আমাদের জানতে হবে এর একক কী কিংবা তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আমরা কেমন করে তাপমাত্রা মাপব। তাপমাত্রার প্রচলিত একক হচ্ছে সেলসিয়াস ($^\circ C$) সাধারণভাবে বলা যায় এই স্কেলে এক এটমস্ফিয়ার বাতাসের চাপের যে তাপমাত্রায় বরফ গলে পানিতে পরিণত হয় সেটাকে $0^\circ C$ এবং যে তাপমাত্রায় পানি ফুটতে থাকে সেটাকে $100^\circ C$ ধরা হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হল বিজ্ঞানী

সেলসিয়াস যখন তাপমাত্রার স্কেল তৈরি করেছিলেন তখন শূন্য ডিগ্রি ধরেছিলেন ফুটন্ত পানির তাপমাত্র, 100 ডিগ্রি ধরেছিলেন বরফ গলনের তাপমাত্রা– বর্তমান স্কেলের ঠিক উল্টো!

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সাধারণত সেলসিয়াস স্কেল ব্যবহার করলেও আন্তর্জাতিক এককটির নাম হচ্ছে কেলভিন (K)। সেলসিয়াস স্কেলের সাথে $273.15\,℃$ যোগ করলেই কেলভিন স্কেল পাওযা যায়। যদি শুধুমাত্র তাপমাত্রার পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাই তাহলে সেলসিয়াস স্কেল আর কেলভিন স্কেলে কোনো পার্থক্য নেই– অর্থাৎ তাপমাত্রা $10\,℃$ বেড়েছে বলা যে কথা তাপমাত্রা $10K$ বেড়েছে বলা সেই একই কথা। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই ঘরের তাপমাত্রা কত, তাহলে যদি সেটা হয় $30\,℃$ তাহলে কেলভিন স্কেলে সেটা হবে $(30 + 273.5 =)\ 303.15\,K$ তোমাদের মনে হতে পারে দুটো স্কেল হুবহু একই রকম শুধুমাত্র $273.15\,^{o}$ পার্থক্য এর পিছনে কারণটি কী?

এটি করার পিছনের কারণটি খুবই চমকপ্রদ। সাধারণভাবে আমাদের মনে হতে পারে আমরা বুঝি যত বেশি বা যত কম তাপমাত্রা কল্পনা করতে পারব, কিন্তু আসলে সেটি সত্যি নয়। তাপমাত্র যত ইচ্ছে বেশি কল্পনা করতে সমস্যা নেই কিন্তু যত ইচ্ছে কম কল্পনা করা সম্ভব নয়, সবচেয়ে কম একটা তাপমাত্রা আছে এবং তাপমাত্রা এর থেকে কম হওয়া যায় না। শুধু তাই নয় আমরা এই তাপমাত্রার কাছাকাছি যেতে পারি কিন্তু কখনোই এই তাপমাত্রায় পৌছাতে পারব না। এই তাপমাত্রাকে পরম শূন্য বা absolute zero বলা হয়। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রার মান $-273.15\,℃$ কাজেই কেলভিন স্কেলে এর মান হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি। অন্যভাবে বলা যায় কেলভিন স্কেলটি তৈরি হয়েছে চরম শূন্য তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে।

তাপমাত্রার যে কোনো স্কেল তৈরি করতে হলে দুটো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (বা স্থিরাঙ্ক) দরকার। কেলভিন স্কেলে একটি হচ্ছে চরম শূন্য– যেটাকে শূন্য ডিগ্রি ধরা হয়েছে। অন্যটি হচ্ছে পানির ত্রৈধ বিন্দু বা triple point. এই তাপমাত্রায় একটা নির্দিষ্ট চাপে $(0.0060373\ atm)$ বরফ পানি এবং জলীয় বাষ্প এক সাথে থাকতে পারে বলে তাপমাত্রাকে অনেক বেশি সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। ℃ সেলসিয়াস স্কেলে এর মান $0.01\,℃$, এবং এই স্কেলের সাথে মিল রাখার জন্য কেলভিন স্কেলে এর মান $273.16\,^{o}$.

কেলভিন এবং সেলসিয়াস স্কেলের পাশাপাশি ফারেনহাইট স্কেল বলেও একটা স্কেল আছে যেখানে বরফ গলন এবং পানির বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা যথাক্রমে $32\,℉$ এবং $212\,℉$, 6.2 ছবিতে তিনটি স্কেলকে তুলনা করার জন্য দেখানো হলো, কেলভিন স্কেলে $0\,℃$ তাপমাত্রা $273.15\,K$ হলেও আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময়েই এটাকে $273\,K$ ধরে নিই– দৈনন্দিন হিসেবে সেটা কোনো গুরুত্র সমস্যা করে না।

6.2.1 ভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক

যদি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সেলসিয়াস, কেলভিন এবং ফারেনহাইট স্কেলে যথাক্রমে T_C, T_K আর T_F দেখায় তাহলে আমরা লিখতে পারি :

$$\frac{T_C - 0}{100 - 0} = \frac{T_K - 273.15}{373.15 - 273.15} = \frac{T_F - 32}{212 - 32}$$

কিংবা

$$\frac{T_C}{100} = \frac{T_K - 273.15}{100} = \frac{T_F - 32}{180}$$

T_Cএর সাপেক্ষে কেলভিন স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল যথাক্রমে :

$$T_C = T_K - 273.15\,°K$$

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32)$$

উদাহরণ 6.1: কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেল সমান?

উত্তর: সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার সম্পর্কটি এ রকম:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32°)$$

$$9T_C = 5T_F - 5 \times 32°$$

T_Cএবং T_f সমান হলে:

$$4T_C = -5 \times 32° = -160°$$

$$T_C = -40°$$

অর্থাৎ যে তাপমাত্রা $-40\,°C$ দেখায় সেই একই তাপমাত্রা $-40\,°F$ দেখায়।

উদাহরণ 6.2: কোন তাপমাত্রায় কেলভিন এবং ফারেনহাইট স্কেল সমান।

উত্তর: কেলভিন এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার সম্পর্কটি এ রকম:

$$T_K - 273.15° = \frac{5}{9}(T_F - 32°)$$

$$9T_K - 9 \times 273.15° = 5T_F - 5 \times 32°$$

যদি T_K এবং T_F সমান হয়:

$$4T_K = 9 \times 273.15^{\circ} - 5 \times 32^{\circ}$$
$$T_K = 574.59^{\circ}$$

উদাহরণ 6.3: সুস্থ দেহের তাপমাত্রা $98.4\,℉$, সেলসিয়াসে সেটা কত?

উত্তর: সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার সম্পর্কটি এ রকম:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32^{\circ})$$

কাজেই $T_F = 98.4^{\circ}$ হলে

$$T_C = \frac{5}{9}(98.4^{\circ} - 32^{\circ}) = 36.89^{\circ}$$

(অর্থাৎ $37\,℃$ এর কাছাকাছি)

উদাহরণ 6.4: কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেল সমান?

উত্তর: কখনোই না।

6.3 পদার্থের তাপীয় প্রসারণ (Thermal Expansion of Matter)

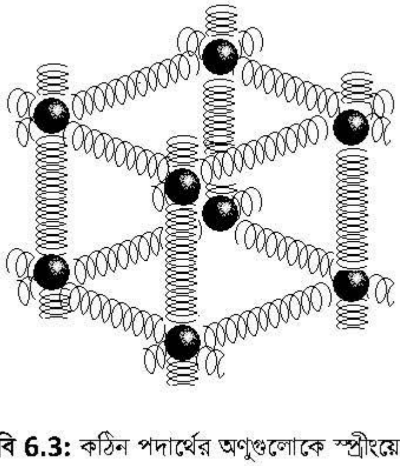

ছবি 6.3: কঠিন পদার্থের অণুগুলোকে স্প্রীংয়ের সাহায্যে একটি অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত কল্পনা করা যায়।

তাপ দিলে প্রায় সব পদার্থের আয়তনই একটু বেড়ে যায়। তাপ তাপমাত্রা এই বিষয়গুলো যদি আমরা আমাদের আণবিক মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করি তাহলে এর কারণটা বোঝা কঠিন নয়। একটা কঠিন পদার্থকে আমরা অনেকগুলো অণু হিসেবে কল্পনা করতে পারি তাদের ভেতর যে আণবিক বল সেটাকে আমরা স্প্রিংয়ের সাথে তুলনা করতে পারি। কঠিন পদার্থে অণুগুলো কীভাবে থাকে সেটা দেখানোর জন্য আমরা অণুগুলোর মাঝে একটা স্প্রিং কল্পনা করেছি এবং 6.3 ছবিতে সেটা দেখানো হয়েছে। কঠিন পদার্থটিকে উত্তপ্ত করলে অণুগুলো কাঁপতে থাকবে– তাপমাত্রা যত বেশি হবে অণুগুলো তত বেশি কাঁপবে। সত্যিকারের কঠিন পদার্থের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের এই স্প্রিং মডেলটাকে একটুখানি উন্নত করতে হবে। স্প্রিংয়ের বেলায় আমরা দেখেছি একটা স্প্রিংকে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রসারিত করলে সেটি যে পরিমাণ বলে টানতে থাকে সেই একই দূরত্বে সংকুচিত করলে এটি ঠিক একই বলে ঠেলতে থাকে। কঠিন পদার্থের অণুগুলোর জন্য এটি পুরোটুরি সত্যি নয়– অণুগুলোকে একটি বেশি দূরত্বে সরিয়ে নিলে এটা যে পরিমাণ বলে টানতে থাকে সেই একই দূরত্বে কাছাকাছি আনলে

অনেক বেশি বলে ঠেলতে থাকে। অর্থাৎ স্প্রিংটি যেন একটি বিশেষ ধরনের স্প্রিং এটা প্রসারিত করতে কম বল প্রয়োগ করতে হয় কিন্তু সংকুচিত করতে বেশি বল প্রয়োগ করতে হয়।

এখন তুমি কল্পনা করে নাও একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় থাকার কারণে অণুগুলো কাঁপছে। বিশেষ ধরণের স্প্রিং হওয়ার কারনে কাঁপার সময় অণুগুলো কাছাকাছি যায় কম কিন্তু দূরে সরে যায় বেশি। এবারে কঠিন পদার্থটিকে আরো উত্তপ্ত করা হল, অণুগুলো আরো বেশি কাঁপতে থাকবে এবং তোমরা বুঝতেই পারছ অণুগুলো এই বিশেষ ধরনের স্প্রিংয়ের জন্য যেহেতু বেশি কাছে যেতে পারে না কিন্তু সহজেই বেশি দূরে যেতে পারে তাই সব অণুগুলোই একে অন্যের থেকে একটু দূরে সরে নূতন একটা সাম্য অবস্থা তৈরি করবে। সব অণু যখন একে অন্য থেকে দূরে সরে যাবে তখন আমাদের কাছে পুরো কঠিন বস্তুটাই একটু প্রসারিত হয়ে গেছে বলে মনে হবে।

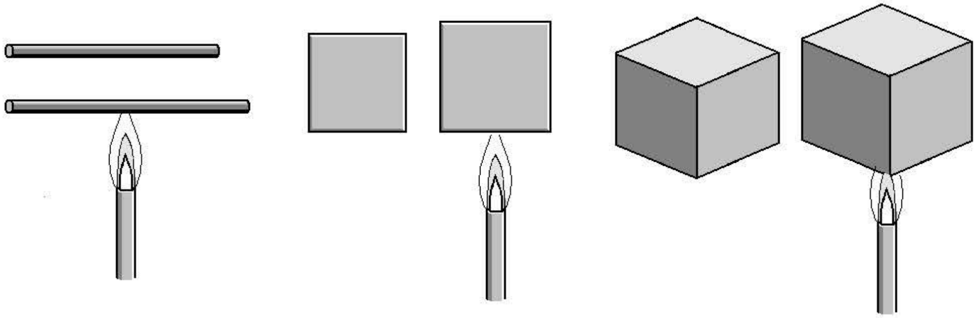

ছবি 6.4: তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ, প্রস্থচ্ছেদ এবং আয়তন বেড়ে যায়।

তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা তিন দিকেই সমানভাবে প্রসারিত হয়। পদার্থের এই প্রসারণকে বিশ্লেষণ করার জন্য দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল আর আয়তন প্রসারণ সহগ নামে তিনটি রাশি তৈরি করা হয়েছে।

T_1 তাপমাত্রায় কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য যদি L_1 হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে সেটি T_2 করার পর যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে সেটি L_2 হয় তাহলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ α হচ্ছে:

$$\alpha = \frac{(L_2 - L_1)/L_1}{T_2 - T_1}$$

কাজেই

$$L_2 = L_1 + \alpha L_1 (T_2 - T_1)$$

একইভাবে T_1 তাপমাত্রায় কোনো বস্তুর ক্ষেত্রফল যদি A_1 হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে T_2 করার পর ক্ষেত্রফলও যদি বেড়ে A_1 হয় তাহলে ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগ β হচ্ছে:

$$\beta = \frac{(A_2 - A_1)/A_1}{T_2 - T_1}$$

কাজেই

$$A_2 = A_1 + \beta A_1(T_2 - T_1)$$

ঠিক একইভাবে T_1 তাপমাত্রায় যদি আয়তন V_1 হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে T_2 করার পর যদি আয়তন বেড়ে V_2 হয় তাহলে আয়তন প্রসারণ সহগ γ হচ্ছে:

$$\gamma = \frac{(V_2 - V_1)/V_1}{T_2 - T_1}$$

কাজেই

$$V_2 = V_1 + \gamma V_1(T_2 - T_1)$$

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ α, β এবং γ তিনটি রাশির এককই হচ্ছে T^{-1}

উদাহরণ 6.4: $20\,℃$ তাপমাত্রায় তামার দণ্ডের দৈর্ঘ্য $10m$, $120\,℃$ তাপমাত্রার দণ্ডটির দৈর্ঘ্য $10.0167m$ এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ কত?

উত্তর: দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ

$$\alpha = \frac{L_2 - L_1}{L_1(T_2 - T_1)}$$

এখানে $L_1 = 10m$

$$L_2 = 10.0167m$$
$$T_2 = 120\,℃$$
$$T_1 = 20\,℃$$

$$\alpha = \frac{10.0167m - 10m}{10m(120\,℃ - 100\,℃)} = 16.7 \times 10^{-6}\,℃^{-1}$$

তোমরা উপরের উদাহরণ গুলো থেকে দেখেছ কঠিন পদার্থের প্রসারণ সহগের মান আসলে খুবই কম। সে কারনে α, β এবং γ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সহগের কিন্তু প্রয়োজন ছিল না আমরা কাজ চালানোর জন্য শুধু দৈর্ঘ্য সহগটি ব্যাখ্যা করে নিলেই পারতাম। যেমন ধরা যাক ক্ষেত্রফল প্রসারণের ব্যাপারটি। আমরা দেখেছি:

$$A_2 = A_1 + \beta A_1(T_2 - T_1)$$

কিন্তু ক্ষেত্রফল A_1 আসলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের গুণফল যদি এবং আমরা বর্গাকৃতির ক্ষেত্রফল ধরে নিই যার বাহুর দৈর্ঘ্য L_1 তাহলে

$$A_2 = L_2^2 = [L_1 + \alpha L_1(T_2 - T_1)]^2$$

কিংবা

$$A_2 = L_1^2 + 2\alpha L_1^2(T_2 - T_1) + \alpha^2 L_1^2(T_2 - T_1)^2$$

কিন্তু

$$A_1 = L_1^2$$

কাজেই

$$A_2 = A_1 + 2\alpha A_1(T_2 - T_1) + \alpha^2 A_1(T_2 - T_1)^2$$

আমরা দেখেছি α এর মান খুবই ছোট, কাজেই α^2 এর মান আরও ছোট, সত্যি কথা বলতে কী এটি এত ছোট যে উপরের সমীকরণে α^2 সহ পুরো অংশটুকু আমরা যদি পুরোপুরি বাদ দিই আমাদের বিশ্লেষণ বা হিসাবে এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। তাই আমরা লিখতে পারি:

$$A_2 = A_1 + 2\alpha A_1(T_2 - T_1)$$

কিন্তু আমরা জানি

$$A_2 = A_1 + \beta A_1(T_2 - T_1)$$

কাজেই নিশ্চয়ই:

$$\beta = 2\alpha$$

ঠিক একইভাবে আমরা L_1 দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা নিয়ে একটা কিউব কল্পনা করতে পারি T_1 তাপমাত্রায় যার আয়তন V_1 এবং তাপ মাত্রা বাড়িয়ে T_2 করার পর যার আয়তন হয়েছে V_2 , কাজেই

$$V_2 = [L_1 + \alpha L_1(T_2 - T_1)]^3$$

একই যুক্তিতে এখানেও যদি α^2 এবং α^3 সহ অংশগুলোকে বাদ দিই আমাদের বিশ্লেষণ বা হিসাবের এমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। কাজেই শুধু প্রথম দুটি অংশ থাকবে অর্থাৎ

$$V_2 = L_1^3 + 3\alpha L_1^3(T_2 - T_1) \ldots$$

কিন্তু আমরা জানি

$$V_1 = L_1^3$$

অর্থাৎ

$$V_2 = V_1 + 3\alpha V_1(T_2 - T_1)$$

কাজেই

$$V_2 = V_1 + \gamma V_1(T_2 - T_1)$$

কাজেই নিশ্চয়ই:

$$\gamma = 3\alpha$$

বাস্তব জীবনে আমাদের কঠিন পদার্থের প্রসারণের বিষয়টা সব সময়েই মনে রাখতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই রেললাইনের মাঝে ফাঁকাটি দেখেছ– তাপমাত্রার প্রসারণকে মনে রেখে এটা করা হয়েছে প্রসারণের এই সুযোগটি না দিলে উত্তপ্ত দিনে রেললাইন আঁকা বাঁকা হয়ে যেতে পারত! বেশি মিষ্টি খেয়ে এবং নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করে তোমাদের যাদের দাঁতে কেভিটি হয়েছে তারা যখন ডেন্টিস্টের কাছে গিয়েছ তারা হয়তো লক্ষ করেছ একটা বিশেষ পদার্থ দিয়ে দাঁতের গর্তটি বুঁজে দেয়া হয়েছে। এই পদার্থটির প্রসারণ সহগ অনেক যত্ন করে দাঁতের প্রসারণ সহগের সমান করা হয়েছে। যদি প্রসারণ সহগ দাঁত থেকে কম হতো তাহলে গরম কিছু খাওয়ার সময় এটা দাঁতের সমান প্রসারিত না হয়ে খুলে আসত। আবার প্রসারণ সহগ বেশি হলে ঠাণ্ডা কিছু খাওয়ার সময় বেশি ছোট হয়ে দাঁত থেকে খুলে আসত! পদার্থবিজ্ঞান না পড়েও অনেক সাধারণ মানুষও তাপমাত্রায় প্রসারণের বিষয়টা জানে। তোমরা লক্ষ করে দেখবে কোনো কৌটার মুখ আটকে গেলে সেটাতে গরম পানি ঢালা হয়– যেন এটা প্রসারিত হয়ে সহজে খুলে আসে।

উদাহরণ 6.5: কাচের গ্লাসে গরম পানি ঢাললে গ্লাস ফেটে যায় কেন?

উত্তর: কোনো কোনো অংশে হঠাৎ করে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় কোথাও প্রসারণ বেশি হয়, সে কারণে গ্লাস ফেটে যায়।

উদাহরণ 6.6: সোনার ঘনত্ব $19.30\ gm/cc$, এর দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $14 \times 10^{-6}\ ℃^{-1}$এর তাপমাত্রা $100\ ℃$ বাড়ালে ঘনত্ব কত হবে?

উত্তর: ঘনত্ব

$$\rho = \frac{m}{V}$$

যেখানে V হচ্ছে আয়তন এবং m হচ্ছে ভর তাপমাত্র বাড়ালে ভর এক থাকলেও আয়তন বেড়ে যায়। কাজেই $100\ ℃$ তাপমাত্রা বাড়ালে তার আয়তন V' হবে:

$$V' = V + \gamma V(T_2 - T_1) = V(1 + 3\alpha \times 100)$$

$$\alpha = 14 \times 10^{-6}\ ℃^{-1}$$

$$V' = V(1 + 4.2 \times 10^{-3})$$

$$\rho' = \frac{m}{V'} = \frac{m}{V(1 + 4.2 \times 10^{-3})} = \frac{m}{V} \times 0.9958 = 0.9958\rho$$

$$\rho' = 0.9958 \times 19.30\ gm/cc = 19.22\ gm/cc$$

উদাহরণ 6.7: তাপমাত্রা যদি আরো $1000°C$ বাড়ানো হয় তাহলে ঘনত্ব কত হবে?

উত্তর: সোনার গলনাংক $1064°C$ কাজেই এই তাপমাত্রায় সোনা গলে যাবে।

6.3.2 তরল পদার্থের প্রসারণ

তরল পদার্থের দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্রফল বলে কিছু নেই– তরল পদার্থের শুধু আয়তন আছে। কাজেই তরল পদার্থের প্রসারণ বলতে তার আয়তন প্রসারণকেই বোঝায়। তরল পদার্থের প্রসারণ মাপার সময় একটু সতর্ক থাকতে হয় কারণ তরল পদার্থকে সব সময়েই কোনো পাত্রে রাখতে হয় কাজেই প্রসারণ সহগ মাপতে চাইলে যখন তরলটিকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হয় তখন স্বাভাবিক ভাবে পাত্রটিও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পাত্রটিরও একটি প্রসারণ হয়। কাজেই পাত্রে তরল যে প্রসারণ দেখা যায় সেটা সত্যিকারের প্রসারণ না, সেটা হচ্ছে আপাত প্রসারণ। কাজেই প্রকৃত প্রসারণ বের করতে হলে পাত্রের প্রসারণের ব্যাপারটা সব সময়েই মনে রাখতে হবে। সাধারণত তরলের প্রসারণ কঠিন পদার্থের প্রসারণ থেকে বেশি হয় যদি তা না হতো তাহলে আমরা আপাত প্রসারণটি হয়তো দেখতেই পেতাম না– মনে হতো আপাত সংকোচন!

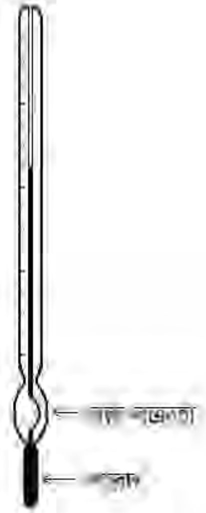

ছবি 6.5: জ্বর মাপার থার্মোমিটারে পারদ যেন নেমে যেতে না পারে সেজন্যে টিউবে সূক্ষ্ম বক্রতা তৈরী করা হয়।

তরল পদার্থের প্রসারণের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হচ্ছে থার্মোমিটার! নানা রকম থার্মোমিটার রয়েছে তার জ্বর মাপার থার্মোমিটার (ছবি 6.5) সম্ভবত তোমাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত। থার্মোমিটারের গোড়ায় একটা কাচের টিউবে পারদ থাকে। তাপ দেয়া হলে পারদের আয়তন বেড়ে যায় এবং একটা খুব সরু নল বেয়ে উঠতে থাকে, কতদূর উঠেছে সেটা হচ্ছে তাপমাত্রার পরিমাপ। জ্বর মাপার সময় যেহেতু থার্মোমিটারকে বগল থেকে কিংবা মুখ থেকে বের করে তাপমাত্রা দেখতে হয় তখন যেন পারদের কলামটুকু কমে না যায় সেজন্য সরু নলটির গোড়ায় নলটিকে একটা খুব সরু বক্রতা রাখা হয়– এ কারনে একবার প্রসারিত হয়ে উপরে উঠে গেলে তাপমাত্রা কমে যাবার পরও নেমে আসতে পারে না। ঝাঁকিয়ে নামাতে হয়!

6.3.3 গ্যাসের প্রসারণ

কঠিন পদার্থের আকার আর আয়তন দুটিই আছে তাই তার প্রসারণ বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি। তরলের নির্দিষ্ট আকার না থাকলেও তার আয়তন আছে তাই তার প্রসারণও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কিংবা মাপতে পারি। গ্যাসের বেলায় বিষয়টা বেশ মজার– তার কারণ তার নির্দিষ্ট আকার তো নেইই– তার নির্দিষ্ট আয়তনও নেই, গ্যাসকে যে পাত্রে ঢোকানো হবে গ্যাসটি সাথে সাথে সেই পাত্রের আয়তন

নিয়ে নেবে! একই পরিমাণ গ্যাস ভিন্ন ভিন্ন আয়াতনের পাত্রে ঢোকানো হলে তার চাপ হয় ভিন্ন– কাজেই আমরা ঠিক করে নিতে পারি আমরা যদি গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি মাপতে চাই তাহলে লক্ষ রাখতে হবে তার চাপের যেন পরিবর্তন না হয়– 6.6 ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে। একটা সিলিন্ডারের পিস্টনের ওপর নির্দিষ্ট ওজনের কিছু একটা রাখা হয়েছে যেন এটা সব সময়েই সিলিন্ডারের আবদ্ধ গ্যাসকে সমান চাপ দেয়।

তরল কিংবা কঠিন পদার্থকে চাপ দিয়ে খুব বেশি সংকুচিত করা যায় না– কিন্তু গ্যাসকে খুব সহজে সংকুচিত করা যায় তাই প্রথমেই আমাদের গ্যাসের চাপ আর আয়াতনের মাঝে সম্পর্কটা জানা দরকার– এটাকে বলে আদর্শ গ্যাসের সূত্র এবং এটা হচ্ছে

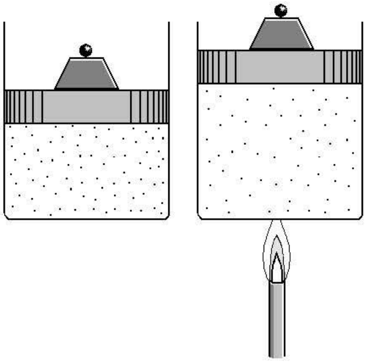

ছবি 6.6: তাপ প্রয়োগ করলে বাতাসের আয়তন বেড়ে যায়।

$$PV = nRT$$

এখানে P হচ্ছে চাপ, V হচ্ছে আয়তন, n হচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ (মোলে মাপা) R একটি ধ্রুবক $(8.314\,J\,K^{-1}mol)$ এবং T হচ্ছে কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা।

এখন আমরা গ্যাসের জন্য প্রসারণ সহগ বের করতে পারি। একটা নির্দিষ্ট চাপে যদি T_1 তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন হয় V_1 এবং T_2 তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন হয় V_2 তাহলে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সহগ β_P হচ্ছে:

$$\beta_P = \frac{(V_2 - V_1)/V_1}{T_2 - T_1}$$

আমরা জানি

$$PV_1 = nRT_1$$
$$PV_2 = nRT_2$$

কাজেই

$$P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$$

বাম পাশে PV_1 এবং ডান পাশে nRT_1 দিয়ে ভাগ দিয়ে:

$$\frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$

কাজেই

$$\frac{(V_2 - V_1)/V_1}{T_2 - T_1} = \frac{1}{T_1}$$

অর্থাৎ

$$\beta_P = \frac{1}{T_1}$$

কাজেই দেখতেই পাচ্ছ গ্যাসের প্রসারণের সহগ মোটেই কোনো ধ্রুব সংখ্যা নয়– এটা তাপমাত্রার বিপরীত অর্থাৎ তাপমাত্রা যত কম হবে গ্যাসের প্রসারণ হবে তত বেশি! অন্যভাবে বলা যায় তাপমাত্রা যত কম হবে গ্যাসকে তত বেশি সংকুচিত করা যাবে।

তোমরা যারা গাড়ির ড্রাইভারদের সি.এন.জি. স্টেশন থেকে সিলিন্ডারে গ্যাস ভরতে দেখেছ তারা হয়তো জেনে থাকবে শীতকালে তাপমাত্রা কম বলে গ্যাসের প্রসারণ এবং সংকোচন বেশি তাই তখন তারা একই চাপে গ্যাস নিয়েও বেশি গ্যাস ভরতে পারে।

6.4 পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব (Effect of Temperature on Change of State)

তোমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছ সব পদার্থ অণু দিয়ে তৈরি এবং কঠিন পদার্থে অণুগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে একে অন্যকে আটকে রাখে। তাপ দেয়া হলে এগুলোর কম্পন বেড়ে যায় এবং আণবিক বন্ধন শিথিল হয়ে একে অন্যের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে নড়তে শুরু করে এবং এটাকে আমরা বলি তরল। তাপমাত্রা যদি আরো বেড়ে যায় তখন অণুগুলো মুক্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে তাকে আমরা বলি গ্যাস। এই ব্যাপারটি আমরা এখন আরেকটু গভীর ভাবে দেখব এবং পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক আছে এ রকম বিভিন্ন রাশির সাথে পরিচিত হব।

একটা কঠিন পদার্থকে যখন তাপ দেয়া হয় তখন তার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। (কী হারে তাপমাত্রা বাড়বে এবং সেটা কিসের ওপর নির্ভর করে সেটা আমরা একটু পড়েই জেনে যাব।) তাপমাত্রা (একটা নির্দিষ্ট চাপে) একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছালে কঠিন পদার্থটি গলতে শুরু করে– এই প্রক্রিয়াটার নাম গলন এবং যে তাপমাত্রায় গলন শুরু হয় সেটাকে বলে গলনাঙ্ক। আমরা যদি কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা মাপতে থাকি তাহলে একটু অবাক হয়ে লক্ষ করব যখন গলন শুরু হয়েছে তখন তাপ দেয়া সত্ত্বেও খানিকটা কঠিন খানিকটা তরলের এই মিশ্রণের তাপমাত্রা আর বাড়ছে না, (6.7 ছবিতে যে রকম

দেখানো হয়েছে) এই সময়টিতে তাপ কঠিন পদার্থের অণুগুলার ভেতরকার আন্তঃআণবিক বন্ধনকে শিথিল করতে ব্যয় হয় তাই অণুগুলোকে আরো গতিশীল করতে পারে না বলে তাপমাত্রা বাড়তে পারে না। গলন চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট গলনাংকে যে পরিমাণ তাপ দিয়ে পুরো কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তর করতে হয় সেই তাপকে বলা হয় গলনের সুপ্ততাপ।

একবার পুরো কঠিন পদার্থটি তরলে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করে (6.8 ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে) তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এক সময় তরল পদার্থটি গ্যাসে পরিবর্তন হতে শুরু করে এই প্রক্রিয়াটির নাম বাষ্পীভবন এবং যে তাপমাত্রায় বাষ্পীভবন ঘটে সেটাকে বলে স্ফুটানাঙ্ক। আবার সবাইকে মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে এই স্ফুটনাঙ্ক চাপের ওপর নির্ভর করে।

যখন বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন তরলের অণুগুলো তাপ শক্তি নিয়ে পরস্পরের সাথে যে আণবিক বন্ধন আছে সেটা থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। গলনের মতো এখানেও যদিও তাপ দেয়া হচ্ছে কিন্তু তরলের তাপমাত্রা কিন্তু বাড়ে না। তরলকে বাষ্পীভূত করার সময় যে পরিমাণ তাপ দিয়ে পুরো তরল পদার্থকে গ্যাসে পরিণত করা হয় সেই তাপকে বলা হয় বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ।

পুরো তরলটা গ্যাসে রূপান্তর করার পর তাপ দিতে থাকলে গ্যাসের তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা মোটামুটি অচিন্ত্যনীয় পযায়ে নিতে পারলে অণুগুলো আয়নিত হতে শুরু করবে এবাং প্লাজমা নামে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা শুরু হবে– কিন্তু সেটি অন্য ব্যাপার!

তাপ দিয়ে কঠিন থেকে তরল এবং তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া অন্তত একটি উদাহরণটি আমরা সবাই দেখেছি সেটি হচ্ছে বরফ পানি এবং বাষ্প। আমরা যদিও সরাসরি গলনের সুপ্ততাপ কিংবা বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ দেখি না– কিন্তু তার একটা প্রভাব অনেক সময় অনুভব করেছি। অনেক ভিড়ে কিংবা আবদ্ধ জায়গায় গরমে ছটফট করে আমরা যদি হঠাৎ খোলা জায়গায় কিংবা বাতাসে আসি তখন শরীর শীতল হয়ে জুড়িয়ে যায়। তার কারণ খোলা জায়গায় আসার পর শরীর থেকে ঘাম বাষ্পীভূত হওয়ার সময় বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপটুকু শরীর থেকে নিয়ে নেয়– এবং শরীরটাকে শীতল করে দেয়।

তাপ দিয়ে কঠিন থেকে তরল, তরল থেকে গ্যাসে যে রকম রূপান্তর করা হয় তার উল্টো প্রক্রিয়াটিও কিন্তু ঘটে। তাপ সরিয়ে নিলে একটা গ্যাস প্রথমে তরল, তারপর কঠিন হতে পারে।

আমরা পদার্থের অবস্থানের পরিবর্তনের সময় বলেছি কঠিন থেকে তরল কিংবা তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরের জন্য একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছাতে হয়। কিন্তু সেই তাপমাত্রায় না পৌঁছেও কিন্তু কঠিন থেকে তরল, তরল থেকে গ্যাস কিংবা সরাসরি কঠিন থেকে গ্যাসে রূপান্তর হতে পারে। আমরা যদি পদার্থের আণবিক মডেলে ফিরে যাই তাহলে বিষয়টা বোঝা মোটেও কঠিন নয়। একটা অণু যদি কোনোভাবে যথেষ্ট শক্তি পেয়ে যায় এবং তার কারণে যদি তার গতিশক্তি যথেষ্ট বেড়ে যায় যে সেটি কঠিন পদার্থ কিংবা তরল পদার্থের পৃষ্ঠদেশে থেকে বের হয়ে আসতে পারে। কঠিন কিংবা তরলের পৃষ্ঠদেশে যেহেতু বাইরের বাতাস থেকে অসংখ্য অণু ক্রমাগত আঘাত করছে তাই তাদের আঘাতে কখনো কখনো কঠিন কিংবা তরলের কোনো কোনো অণুমুক্ত হয়ে যাবার মতো শক্তি পেয়ে যেতে পারে। তাই

পৃষ্ঠদেশ যত বিস্তৃত হবে এই প্রক্রিয়াটি তত বেশি কাজ করবে। আমরা সবাই এই প্রক্রিয়াটি দেখেছি– একটা ভিজে জিনিস এমনিতেই শুকিয়ে যায়– এর জন্য এটাকে স্ফুটনাংকের তাপমাত্রায় নিতে হয় না। শুকিয়ে যাওয়া মানেই তরল পদার্থের অণুর বাষ্পায়িত হয়ে যাওয়া– যে কোনো তাপমাত্রায় এই প্রক্রিয়া ঘটতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াটার নাম বাষ্পায়ন (evaporation) ।

একটা তরলের পৃষ্ঠদেশ বিস্তৃত হওয়া ছাড়াও, তাপমাত্রা কম স্ফুটনাংক, বাতাসের প্রবাহ, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাতাসের চাপ, এই বিষয়গুলোর ওপর বাষ্পায়ন নির্ভর করে।

পানির বাষ্পায়নের সময় পানি যে রকম তার বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপটুকু নিয়ে নেয়– এর উল্টোটাও সত্যি। যদি কোনো প্রক্রিয়ায় বাষ্প পানিতে রূপান্তরিত হয় তখন সেটি তাপ সরবরাহ করে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রের জলীয় বাষ্পে ভরা বাতাস উপরে উঠে যখন জলকণায় রূপান্তরিত হয় তখন বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপটা শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে– এই শক্তিটা ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড শক্তি হিসেবে কাজ করে।

6.5 আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat)

তাপ তাপমাত্রা এবং এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে এ রকম অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও, একটা বস্তুর তাপমাত্রা কতটুকু বাড়তে হলে সেখানে কতটুকু তাপ দিতে হবে সেটি এখানো আলোচনা করা হয়নি। তোমরা হয়তো লক্ষ করে থাকবে খানিকটা পানিকে উত্তপ্ত করতে বেশ অনেক্ষণ চুলার ওপর রেখে সেটাতে তাপ দিতে হয়। প্রায় সম পরিমাণ ধাতব কোনো বস্তুকে সেই একই তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে কিন্তু মোটেও বেশি সময় উত্তপ্ত করতে হয় না। এর কারণ পানির আপেক্ষিক তাপ বেশি সেই তুলনায় ধাতব পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অনেক কম। $1\ kg$ পদার্থের তাপমাত্রা 1° বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ। অর্থাৎ যদি m ভরের কোনো পদার্থকে T_1 থেকে T_2 তাপমাত্রায় নিতে Q তাপের প্রয়োজন হয় তাহলে আপেক্ষিক তাপ s হচ্ছে:

$$s = \frac{Q}{m(T_2 - T_1)}$$

আপেক্ষিক তাপের একক $Jkg^{-1}K^{-1}$

তাপ ধারণ ক্ষমতা C বলতে বোঝানো হয় একটা বস্তুর তাপমাত্রা 1° বাড়াতে কত তাপের প্রয়োজন। আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে $1\ kg$ ভরের 1° বাড়াতে কত তাপের প্রয়োজন তাই বস্তুর আপেক্ষিক তাপ

জেনে নিলে আমরা খুব সহজেই যে কোনো বস্তুর তাপ ধারণক্ষমতা C বের করতে পারব। কারণ বস্তুর ভর যদি m হয়, আপেক্ষিক তাপ s হয় তাহলে

$$C = ms$$

$10\ kg$ সোনার তাপ ধারণক্ষমতা হচ্ছে

$$C = 10 \times 230\, JK^{-1} = 2300\, JK^{-1}$$

সে তুলনায় পানির তাপ ধারণক্ষমতা

$$C = 10 \times 4200\, JK^{-1} = 42{,}000\, JK^{-1}$$ প্রায় 20 গুণ বেশি।

তার অর্থ সোনা কিংবা অন্য কোনো ধাতুকে চট করে উত্তপ্ত করা যায় কিন্তু পানিকে এত সহজে উত্তপ্ত করা যায় না।

6.6 ক্যালোরিমিতির মূলনীতি (Fundaamental principle of Calorimetry)

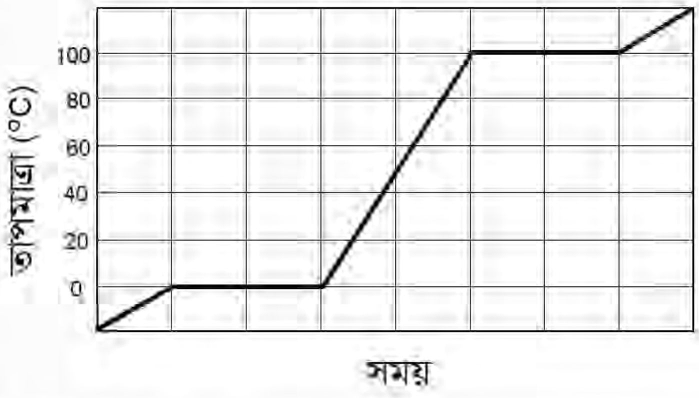

ছবি **6.7:** তাপ প্রয়োগ করার সময় গলনাংক এবং স্ফুটনাংকের তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না।

শীতকালে গোসল করার সময় অনেক সময়েই আমরা বালতির ঠান্ডা পানিতে খানিকটা প্রায় ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দিই। ফুটন্ত গরম পানি বালতির শীতল পানিকে তাপ দিতে দিতে ঠান্ডা হতে থাকে। বালতির শীতল পানিও গরম ফুটন্ত পানি থেকে তাপ নিতে নিতে উত্তপ্ত হতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝে দেখা যায় উত্তপ্ত পানির তাপমাত্রা কমে এবং শীতল পানির তাপমাত্রা বেড়ে পুরো পানিটুকুই একটা আরামদায়ক উষ্ণতায় চলে এসেছে।

আমরা ইচ্ছে করলেই কোন পদার্থের কোন তাপমাত্রার বস্তুর সাথে অন্য কোন তাপমাত্রার কোন বস্তু মেশালে কে কতটুকু তাপ দেবে বা নেবে এবং শেষ পর্যন্ত কত তাপমাত্রায় পৌঁছাবে এই বিষয়গুলো বের করে ফেলতে পারব। তা করতে হলে আমাদের শুধু কয়েকটা নিয়ম মনে রাখতে হবে:

(i) বেশি তাপমাত্রার বস্তু কম তাপমাত্রার বস্তুর কাছে তাপ দিতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না দুটো তাপমাত্রাই সমান হয়। (ii) উত্তপ্ত বস্তু যতটুকু তাপ পরিত্যাগ করবে, শীতল বস্তু ঠিক ততটুকু তাপ গ্রহণ করবে। (আমরা ধরে নিয়েছি এই প্রক্রিয়াতে অন্য কোনোভাবে কোনো তাপ নষ্ট হচ্ছে না।)

উদাহরণ 6.8: $30\,℃$ তাপমাত্রায় $1\,liter$ পানিতে $100gm$ ওজনের এক টুকরো বরফ ছেড়ে দেয়া হল। পুরো বরফটি গলে যাবার পর মোট পানির তাপমাত্রা কত হবে? (বরফের সুপ্ত তাপ $L = 334\ kJ/kg$)

উত্তর : বরফের তাপমাত্রা $0\,℃$ ধরে নিই।
বরফের ভর $m_1 = 100gm = 0.1kg$
$1\,liter$ পানির ভর $m_2 = 1kg$
পানির আপেক্ষিক তাপ $s = 4.2 \times 10^3\ J/℃$

বরফটুকু গলতে যে এবং বরফ গলা পানির চূড়ান্ত তাপমাত্রায় পৌঁছাতে যে তাপের প্রয়োজন হবে সেই তাপটুকু $1kg$ পানিকে সরবরাহ করতে হবে। ধরা যাক পানির চূড়ান্ত তাপমাত্রা T, তাহলে বরফ যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে সেগুলো হলো :

গলার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ: $m_1 L$
গলার পর $0\,℃$ থেকে T পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়ার জন্য তাপ: $m_1 s(T-0)$

এই তাপগুলো সরবরাহ করবে বাকি m_2 পানি, কাজেই তার তাপমাত্রা কমে যাবে। অর্থাৎ:

তাপ সরবরাহ করা হবে: $m_2 s(30\,℃ - T)$

দুটো তাপ সমান হতে হবে। কাজেই:

$$m_1 L + m_1 sT = m_2 s(30\,℃ - T)$$

$$T = \frac{30\,℃ \times m_2 s - m_1 L}{(m_1 + m_2)s}$$

$$T = \frac{30 \times 1 \times 4.2 \times 10^3 - 0.1 \times 334 \times 10^3}{(1 + 0.1)4.2 \times 10^3} = 20\,℃$$

উদাহরণ 6.9: $75\,℃$ তাপমাত্রার $2\,liter$ পানিতে $20\,℃$ তাপমাত্রার $1\,liter$ পানি যোগ করা হলে চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত?

উত্তর : ধরা যাক চূড়ান্ত তাপমাত্রা T তাহলে $2\,liter$ পানির তাপমাত্রা $75\,℃$ থেকে কমে সেটি T তে পৌঁছাবে। এই তাপটুকু গ্রহণ করে $2\,liter$ পানির তাপমাত্রা $20\,℃$ থেকে বেড়ে T তে পৌঁছাবে। কাজেই

$1\,liter$ পানির ভর $m_1 = 1kg$

$2\ liter$ পানির ভর $m_2 = 2kg$
পানির আপেক্ষিক তাপ $s = 4.2 \times 10^3\ J/℃$

$$m_1 s(75℃ - T) = m_2 s(T - 20℃)$$

$$T = \frac{(75m_1 + 20m_2)s}{(m_1 + m_2)s}℃ = \frac{75 \times 2 + 20}{2 + 1}℃ = 56.6℃$$

উদাহরণ 6.10: $120℃$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত $10gm$ ওজনের এক টুকরো লোহা একটা পাত্রে রাখা $30℃$ তাপমাত্রার $1kg$ পানিতে ছেড়ে দেয়া হলো। পানির তাপমাত্রা কত হবে?

উত্তর: লোহার ভর $m_1 = 0.01kg$
পানির ভর $m_2 = 1kg$
লোহার আপেক্ষিক তাপ $s_1 = 0.45 \times 10^3 J/℃$
পানির আপেক্ষিক তাপ $s_2 = 4.2 \times 10^3\ J/℃$

লোহার টুকরো যতটুকু তাপ হারাবে পানি ঠিক ততটুকু তাপ গ্রহণ করবে। কাজেই লোহার চূড়ান্ত তাপমাত্রা T হলো

$$m_1 s_1(120℃ - T) = m_2 s_2(T - 30℃)$$

$$T = \frac{120m_1 s_1 + 30m_2 s_2}{m_1 s_1 + m_2 s_2}$$
$$= \frac{120 \times 0.01 \times 0.45 \times 10^3 + 30 \times 1 \times 4.2 \times 10^3}{0.01 \times 0.45 \times 10^3 + 1 \times 4.2 \times 10^3}℃$$

$$T = 30.1℃$$

6.7 গলনাংক এবং স্ফুটনাংকের ওপর চাপের প্রভাব (Effect of Pressure on Melting Point and Boiling Point)

চাপ দেয়া হলে পদার্থের গলনাংক কমে যায়, তাই দুই টুকরা বরফকে চাপ দিয়ে এক টুকরো বরফে পরিণত করে ফেলা যায়। বরফের যেখানে চাপ পড়েছে সেখানে

ছবি 6.8: একটি বরফ খণ্ডকে সুক্ষ্ম তারের চাপ দিয়ে কাটা সম্ভব।

গলনাংক কমে যায় বলে বরফের তাপমাত্রাতেই সেখানকার বরফ গলে যায়, চাপ সরিয়ে নিলে গলনাংক আগের মান ফিরে পায় তখন গলে যাওয়া পানি আবার বরফে পাল্টে গিয়ে একটা বরফ খণ্ড হয়ে যায়। একটা বরফের ওপর একটা তার এবং তারের দুই পাশে দুটি ওজন ঝুলিয়ে দিলে মনে হবে তারটি বরফকে কেটে দুই টুকরো করে ফেলেছে, কিন্তু বরফটি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেটি অখণ্ড এক টুকরো বরফই আছে (ছবি 6.8:)।

চাপের কারণে স্ফুটানাংকের পরিবর্তন হয়। চাপ কম হলে স্ফুটানাংক কমে যায়, চাপ বেশি হলে স্ফুটানাংক বেড়ে যায়। এজন্য যারা পর্বতারোহন করে অনেক উচ্চতায় যায় তাদের কিছু রান্না করতে সময় বেশি নেয়– বাতাসের চাপ কম বলে সেখানে পানি তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে তাই তাপমাত্রা বাড়ানো যায় না সেজন্য রান্না করতে সময় বেশি লাগে। একই কারণে প্রেশার কুকার তৈরি হয়েছে, এটি আসলে একটি নিচ্ছিদ্র পাত্র, তাই রান্না করার সময় বাষ্প আবদ্ধ হয়ে চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং সে কারনে পানির স্ফুটানাংক বেড়ে যায় বলে বেশি তাপমাত্রায় পানি ফুটতে থাকে। তাপমাত্রা বেশি বলে রান্নাও করা যায় তাড়াতাড়ি।

গ্যাসকে চাপ দিলে তার গলনাংক বেড়ে যায়– তাই খুব বেশি শীতল না করেই চাপ বাড়িয়ে গ্যাসকে তরল করা যায়। তখন অবশ্যি অনেক তাপের সৃষ্টি হয়– সেই তাপকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

অনুশীলনী

প্রশ্ন :

1. একটি কাচের পাত্রে পারদ রেখে উত্তপ্ত করা হলে প্রথমে পারদের উচ্চতা কমে তারপর বাড়তে থাকবে। কেন?
2. মহাশূন্য– যেখানে কোনো অণু-পরমাণু নেই সেখানে কি তাপমাত্রার অস্তিত্ব আছে?
3. অনেক ভিড়ের ভেতরে ভ্যাপসা গরম থেকে খোলা জায়গায় এলে শীতল অনুভব করি কেন?
4. কাচের গ্লাসে পানিতে বরফ দিলে গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমে কেন?
5. প্রেশার কুকারে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় কেন?

গাণিতিক প্রশ্ন :

1. বিজ্ঞানী সেলসিয়াস যে থার্মোমিটার প্রবর্তন করেছিলেন সেই থার্মোমিটারে বরফের গলনাংক ছিল $100\,℃$, পানির বাষ্পীভবন ছিল $0\,℃$! সেই থার্মোমিটারের কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রার সমান?
2. কোন তাপমাত্রায় সোনার ঘনত্ব 0.001% কমে যাবে?
3. একটা উত্তপ্ত $1gm$ ওজনের লোহার টুকরা $30\,℃$ তাপমাত্রায় $1\ liter$ পানিতে ছেড়ে দেয়ার পর পানির তাপমাত্রা $15\,℃$ বেড়ে গেল। লোহার টুকরোটির তাপমাত্রা কত ছিল?
4. $0\,℃$ তাপমাত্রার $1gm$ বরফে প্রতি সেকেন্ড $10J$ করে তাপ প্রদান করা হলে কতক্ষণ পর পুরোটি বাষ্পীভূত হবে?
5. একটি নিচ্ছিদ্র সিলিন্ডারে আবদ্ধ গ্যাসের তাপমাত্রা $30\,℃$ থেকে বাড়িয়ে $100\,℃$ করা হলে গ্যাসের চাপ কত শতাংশ বেড়ে যাবে?

সপ্তম অধ্যায়

তরঙ্গ ও শব্দ

(Waves and Sound)

Marie Curie (1867-1934)

মেরী কুরি

মেরী কুরি একজন পোলিশ পদার্থবিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদ ছিলেন। তাঁর খুব শখ নিজ দেশে কাজ করবেন কিন্তু মহিলা বলে নিজ দেশে কোনো কাজ খুঁজে পাননি তাই ফ্রান্সে তার স্বামী পিয়ারে কুরির সাথে কর্মজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। তেজস্ক্রিয়তার ওপর তাঁর কাজ তাঁকে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নে দুটি নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। তিনি একই সাথে ছিলেন প্রথম মহিলা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। তার জীবন ছিল ঘটনাবহুল এবং ধর্মান্ধ মানুষেরা তাকে নাস্তিক বলেও নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়েছিল। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করার কারণে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

7.1 সরল স্পন্দন গতি (Simple Harmonic Motion)

একটা স্প্রিংয়ের নিচে একটা ভর লাগিয়ে সেটা টেনে ছেড়ে দিলে এটা উপরে নিচে করতে থাকে। (তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা এই গতিটি ব্যাখ্যা করেছি।) আমরা দেখেছি ঘর্ষণের জন্য বা অন্যান্যভাবে শক্তিক্ষয় হয়ে বলে এটা একসময় থেমে যায়– তা না হলে এটা অনন্তকাল ওপর নিচ করতে থাকত। আমরা এটাও দেখেছি সরল স্পন্দন গতিতে স্প্রিংয়ের সাথে লাগানো ভরটির শক্তি গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির মাঝে বিনিময় করে এবং এ সবগুলো ঘটে কারণ স্প্রিংয়ের বলটি হুক এর সূত্র মেনে চলে। হুকের সূত্রটি আবার মনে করিয়ে দেয়া যায়, স্প্রিংয়ের ধ্রুব যদি হয় k, ভর যদি হয় m এবং অবস্থান যদি হয় x তাহলে তার ওপর আরোপিত বল F হচ্ছে

$$F = -kx$$

হুকের সূত্রের কারণে যে ছন্দিত বা স্পন্দন গতি হয় সেটাকে বলে সবল স্পন্দন গতি। পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গতিগুলোর একটি হচ্ছে এই গতি।

তোমাদের এই বইয়ে এটা বের করে দেখানোর সুযোগ নেই কিন্তু জানিয়ে রাখতে ক্ষতি কী? যদি একটা স্প্রিংয়ের ধ্রুব হয় k এবং ভর হয় m তাহলে ভরটির দোলনকাল হবে

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$$

যদি এটা স্প্রিং না হয়ে একটা সুতোয় ঝুলানো পেন্ডুলাম হতো এবং সুতোর দৈর্ঘ্য হতে l আর মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ হতো g তাহলে দোলন কাল হতো :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

(না কোনো ভুল হয়নি তুমি একটা হালকা ভরই ঝোলাও আর ভারী ভরই ঝোলাও দোলন কাল একই থাকবে এটা ভরের ওপর নির্ভর করে না।) তার চেয়ে বড় কথা একটা সুতায় একটা ভর ঝুলিয়ে দুলিয়ে দিয়েছি তার দোলন কালে অন্য সব কিছু আসতে পারে কিন্তু π কোথা থেকে চলে এল? কেন এল?

উদাহরণ 5.1: $1\ m$ লম্বা একটা সুতা দিয়ে $10gm$ ভরের একটা পাথর ঝুলিয়ে দাও। তার দোলন কাল কত?

উত্তর:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.8}}s = 2.0s$$

পাথরটার ওজন $10gm$ না হয়ে অন্য কিছু হলেও দোলনকাল একই থাকত। ইচ্ছে করলে তুমি এখনই দোলন কাল মেপে তুমি সেখান থেকে g এর মান বের করতে পারবে– চেষ্টা করে দেখো!

একটা স্প্রিংয়ের নিচে একটা ভর লাগিয়ে রেখে দিলে ভরটা স্প্রিংটাকে টেনে একটু লম্বা করে সেই অবস্থানে স্থির হয়ে থাকে। স্প্রিংয়ের এই দৈর্ঘ্যটাকে বলা যায় সাম্য অবস্থা (ছবি 7.1- 0)।

এখন যদি ভরটাকে টেনে একটু নিচে a দূরত্ব নামিয়ে এনে ছেড়ে দিই (ছবি 7.1-1) তাহলে ভরটা উপরের দিকে উঠতে থাকবে, সাম্য অবস্থা পার হয়ে এটা উপরে a দূরত্ব উঠে যাবে তারপর আবার নিচে নামতে থাকবে সাম্য অবস্থা পার হয়ে নিচে নেমে যাবে এবং এটা চলতেই থাকবে।

ভরটা যখন $2-3-4-1$ অবস্থান শেষ করে যে অবস্থান শুরু করেছিল ঠিক একই অবস্থানে (2) একইভাবে (উপরের দিকে v বেগে গতিশীল) ফিরে আসে তখন আমরা বলি একটা পূর্ণ

স্পন্দন হয়েছে। মনে রাখতে হবে $2-3-4$ হলেও কিন্তু যে অবস্থান থেকে শুরু করেছে সেই অবস্থানে ফিরে আসলে কিন্তু এটা পূর্ণ স্পন্দন নয় কারণ প্রথম 2 টিতে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং পরের 4 টিতে নিচের দিকে যাচ্ছে, কাজেই এক অবস্থানে একইভাবে ফিরে আসা হলো না।

সরল স্পন্দিত গতি বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের কয়েকটা রাশি ব্যাখ্যা করে নেয়া ভালো। প্রথমটি হতে পারে পর্যায় কাল বা দোলন কাল T। একটা পূর্ণ স্পন্দন হতে যে সময় নেয় সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল বা দোলন কাল T। কম্পাঙ্ক f হচ্ছে প্রতি সেকেন্ড পূর্ণ স্পন্দনের সংখ্যা অর্থাৎ $f = \frac{1}{T}$

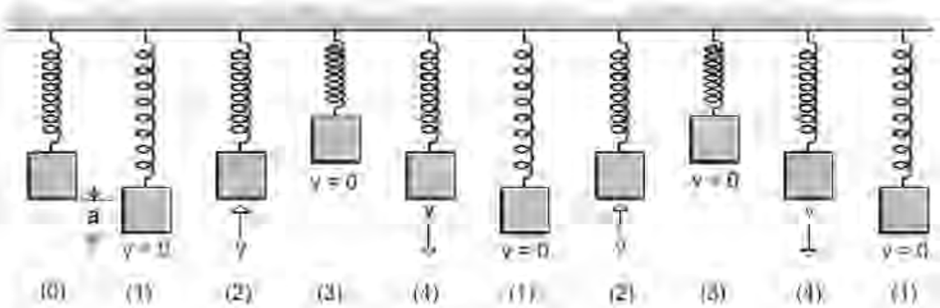

ছবি 7.1: (0) হচ্ছে সাম্য অবস্থা। টেনে (1) অবস্থানে নিয়ে ছেড়ে দেবার পর স্প্রিংটি সরল স্পন্দিত হয়ে দুলছে।

পর্যায়কাল T যদি সেকেন্ডে প্রকাশ করি তাহলে f এর একক হচ্ছে হার্টজ (Hz)

সরল স্পন্দিত গতিতে বিস্তার হচ্ছে সাম্যাবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি উপরে ওঠা (কিংবা নিচে নামা) দূরত্ব। 7.1 ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেখানে বিস্তার হচ্ছে a.

এর পরের রাশিটি হচ্ছে দশা (Phase). স্প্রিংয়ে লাগানো ভরটি যখন ওঠানামা করছে, তখন কোনো এক মুহূর্তে যদি ভরটির দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব সেটি সাম্যাবস্থা থেকে কোনো একটি দূরত্বে থাকবে সেই অবস্থানটি হচ্ছে তার দশা। সরল স্পন্দন গতিতে ভর এবং স্প্রিংয়ের এই নির্দিষ্ট অবস্থাটি হুবহু একইভাবে ফিরে আসবে আবার ঠিক এক পর্যায় কাল পরে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় সরল স্পন্দিত গতিতে কোনো এক মুহূর্তে যে দশা হয় এক দোলন কাল পর আবার সেই দশা ফিরে আসে।

7.2 তরঙ্গ (Wave)

আমরা সবাই তরঙ্গ দেখেছি, একটা পানিতে ঢিল ছুড়ে দিলে সেই বিন্দু থেকে পানির তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরে বাতি জ্বালালে যে আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে সেটাও তরঙ্গ। আমরা যখন কথা বলি আর শব্দটা যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যায় সেটাও তরঙ্গ। একটা স্প্রিংকে সংকুচিত করে ছেড়ে দিলে তার ভেতর দিয়ে যে বিচ্যুতিটি ছুটে যায় সেটাও তরঙ্গ, একটা টান করে রাখা দড়ির মাঝে ঝাঁকুনি দিলে যে বিচ্যুতিটি দড়ি দিয়ে ছুটে যায় সেটাও তরঙ্গ। এক কথায় বলা যায় তরঙ্গটি কী আমরা সেটা অনুভব করতে পারি, কিন্তু যদি তার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় একটা সুন্দর সংজ্ঞা দিতে চাই তাহলে কী বলব?

সহজ ভাষায় বলা যায় তরঙ্গ হচ্ছে, একটা মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শক্তি পাঠানোর একটা প্রক্রিয়া, যেখানে মাধ্যমের কণাগুলো তার নিজের অবস্থানে স্পন্দিত হতে পারে– কিন্তু সেখান থেকে সরে যাবে না।

আমরা এবারে যাচাই করে দেখতে পারি আমাদের এই সংজ্ঞাটি আমাদের অভিজ্ঞতার সাথে মেলে কি না। নদীর মাঝখান দিয়ে একটা লঞ্চ যাবার সময় যে ঢেউ তৈরি করে সেই ঢেউ নদীর কূলে এসে আঘাত করে, কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শক্তি পাঠানো হয়েছে। সেই সময়ে নদীর পানিতে ভাসমান কোনো কচুরি পানার দিকে তাকালে আমরা দেখব যখন ঢেউটি যাচ্ছে সেই মুহূর্তে কচুরি পানাটি উপরে উঠেছে এবং নিচে নেমেছে এবং ঢেউ চলে যাবার পর আবার আগের মতো স্থির হয়ে গেছে এবং মোটেও ঢেউয়ের সাথে সাথে তীরে এসে আছড়ে পড়েনি।

সরল স্পন্দন গতির সাথে তরঙ্গের সম্পর্কটা এখন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ। একটা মাধ্যমের কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে যদি আমরা তাকিয়ে থাকি তাহলে যখন তার ভেতর দিয়ে একটা তরঙ্গ যেতে থাকে তখন সেই বিন্দুটির সরল স্পন্দন গতি হয়। কচুরি পানার বেলায় যেটা ঘটেছিল, যতক্ষণ তার ভেতর দিয়ে পানির তরঙ্গটা গিয়েছে ততক্ষণ সেখানে সরল স্পন্দন গতি হয়েছে। সরল স্পন্দন গতির মাঝে তরঙ্গ নেই, কিন্তু তরঙ্গের প্রত্যেকটা বিন্দু একটা একটা সরল স্পন্দন গতি।

কাজেই তরঙ্গের জন্য আমাদের দেয়া সংজ্ঞাটি সঠিক। তবে মনে রাখতে হবে আরো অনেক ধরনের তরঙ্গ আছে যার জন্য এই সংজ্ঞাটি পুরোপুরি সঠিক নাও হতে পারে। আমরা তরঙ্গে যাবার জন্য একটা মাধ্যমের কথা বলেছি কিন্তু সূর্য থেকে আলো যখন পৃথিবীতে পৌঁছায় তখন তার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ– সেটা নিয়ে নবম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। গ্র্যাভিটি ওয়েভ নামে এক ধরনের তরঙ্গের কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন, সেটি এখনো দেখা সম্ভব হয়নি কিন্তু তার জন্যও কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। পদার্থবিজ্ঞানের চমকপ্রদ শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ওয়েভ ফাংশন বলে অন্য এক ধরনের তরঙ্গের কথা বলা হয় সেটি আরো বিচিত্র, সেখানে সরাসরি তরঙ্গটি দেখা যায় না শুধু তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায়।

কাজেই আমরা আপাতত আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব শুধু সেই সব তরঙ্গের মাঝে যার জন্য কঠিন তরল বা গ্যাসের মতো মাধ্যমের দরকার হয়। এই ধরনের তরঙ্গের নাম যান্ত্রিক তরঙ্গ।

7.2.1 তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার সময় তার কয়েক ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে এসেছে, এখানে আমরা তরঙ্গের, বিশেষ করে যান্ত্রিক তরঙ্গের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

(i) যান্ত্রিক তরঙ্গের জন্য মাধ্যমের দরকার হয়। পানিতে ঢেউ হয়, একটা স্প্রিংয়ে তরঙ্গ পাঠানো যায় একটা দড়িতে তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। আমরা যে শব্দ শুনি সেটাও একটা তরঙ্গ এবং তার মাধ্যম হচ্ছে বাতাস।

(ii) একটা মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যখন তরঙ্গ যেতে থাকে তখন কণাগুলো নিজ অবস্থানে থেকে স্পন্দিত হয় (কাঁপে কিংবা ওপর-নীচে যায়) কিন্তু কণাগুলো নিজে তরঙ্গের সাথে সাথে সরে যায় না।

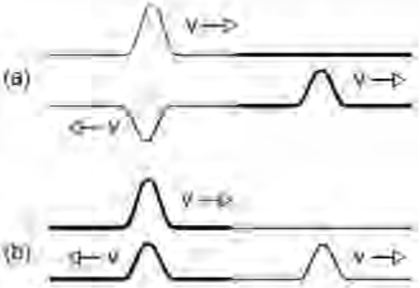

ছবি 7.2: ভিন্ন প্রস্থচ্ছেদের তারের ভেতর একটি তরঙ্গ প্রতিফলিত এবং প্রতিসরিত হচ্ছে। সরু তার থেকে মোটা তারে গেলে এক ধরনের প্রতিফলন হয় (a) আবার মোটা তার থেকে সরু তারে গেলে অন্য ধরনের প্রতিফলন হয় (b)

(iii) তরঙ্গের ভেতর দিয়ে শক্তি একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। শক্তি যত বেশি হয় তরঙ্গের বিস্তার তত বেশি হয়। শক্তি তরঙ্গের বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক– অর্থাৎ বিস্তার যদি দ্বিগুণ হয় শক্তি হয় চার গুণ।

(iv) সব তরঙ্গেরই একটা বেগ থাকে সেই বেগ তার মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। বাতাসে শব্দের বেগ $330\ m/s$ পানিতে এই বেগ $1430\ m/s$। ঢিলে একটা দড়িতে একটা তরঙ্গের যত বেগ হবে টান টান করে বাঁধা দড়িতে হবে তার থেকে বেশি।

(v) তরঙ্গের প্রতিফলন কিংবা প্রতিসরণ হয়, পরের অধ্যায়ে আলোর জন্য এটি অনেক বড় করে আলোচনা করা হয়েছে– আপাতত জেনে রাখ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় তরঙ্গের খানিকটা যদি প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে সেটা হচ্ছে প্রতিফলন। (ছবি 7.2) তরঙ্গ যখন প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে যায় সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ। আমরা যখন শব্দের প্রতিধ্বনি শুনি সেটা হচ্ছে শব্দের প্রতিফলন। পানিতে ডুবে থাকা অবস্থায় যদি বাইরের শব্দ শুনি সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ।

(vi) তরঙ্গের যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপরিপাতন, যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেটা আমাদের খুব বেশি চোখে পড়েনা। ধরা যাক দুটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গা

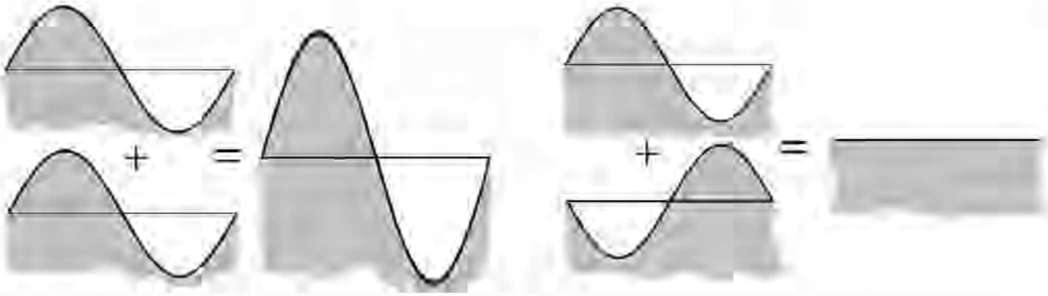

ছবি 7.3: দুটি তরঙ্গ যোগ হয়ে আরো বড় তরঙ্গ হতে পারে, আবার একটি অন্যটিকে নিঃশেষও করে দিতে পারে।

থেকে এক জায়গায় দুটি তরঙ্গ এসে হাজির হয়েছে– একটি তরঙ্গ যখন মাধ্যমটিকে উপরে তুলতে চেষ্টা করছে অন্যটি তখন তাকে নামানোর চেষ্টা করছে, তখন কী হবে? এই গুলো হচ্ছে উপরিপাতনের বিষয়, যখন তরঙ্গের আরো গভীরে যাবে তখন বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে জেনে যাবে, আপাতত শুধুমাত্র সহজ দুটি বিষয় ছবি 7.3 এ দেখানো হয়েছে। দুটো তরঙ্গ একটি আরেকটিকে ধ্বংসও করে দিতে পারে আবার একটি আরেকটিকে আরো বড়ও করে দিতে পারে।

7.2.2 তরঙ্গের প্রকার ভেদ

একটা স্প্রিংয়ের ভেতর দিয়ে একটা তরঙ্গ যাবার সময় তরঙ্গটি স্প্রিংকে সংকুচিত এবং প্রসারিত করে এগিয়ে যায়। আবার একটা দড়ির এক প্রান্তে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে একটা তরঙ্গ তৈরি করে দড়ির মাঝে দিয়ে পাঠানো যায়। দুটি তরঙ্গের মাঝে কিছু একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। স্প্রিংয়ে তরঙ্গটি ছিল সংকোচন এবং প্রসারণের, স্প্রিংটির সংকোচন এবং প্রসারণের দিক এবং তরঙ্গের বেগ একই দিকে– এই ধরনের তরঙ্গের নাম অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। শব্দ হচ্ছে এ রকম অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (longitudinal wave)। (ছবি 7.4)

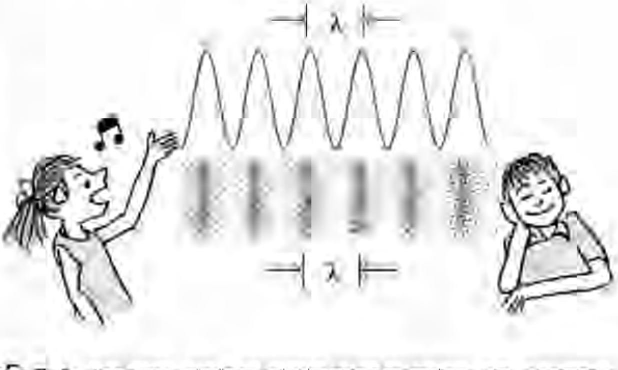

ছবি 7.4: শব্দ হচ্ছে বাতাসের চাপের কারণে সংকোচন এবং প্রসারণের একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। এখানে λ হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

দড়ির বেলায় আমরা যখন দড়িটিতে ঝাঁকুনি দিয়ে তরঙ্গ তৈরি করেছি সেখানে দড়ির কম্পনটি কিন্তু তরঙ্গের বেগের দিকে ঘটে না। কম্পনের দিক অর্থাৎ দড়ির ওঠা এবং নামা তরঙ্গের বেগের সাথে

সব। এরকম তরঙ্গের নাম অনুপ্রস্থ তরঙ্গ (Transverse wave)। পানির ঢেউ হচ্ছে এর একটা উদাহরণ।

7.2.3 তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট রাশি

সরল স্পন্দিত গতিতে আমরা যে সকল রাশির কথা বলেছি তার সবগুলোই আসলে তরঙ্গের বেলায় ব্যবহার করতে পারব। একটা তরঙ্গেরও পূর্ণ স্পন্দন হয়, তার পর্যায়কাল আছে, কম্পাঙ্ক আছে এবং বিস্তার আছে। আমরা দেখেছি কোনো একটা তরঙ্গ যাবার সময় আমরা যদি মাধ্যমের কোনো একটা কণার দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে দেখব সেই কণাটির সরল স্পন্দিত কম্পন হচ্ছে। তরঙ্গের বেলায় আমরা নূতন দুটি রাশির কথা বলতে পারি যার একটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তরঙ্গের যে কোনো একটি দশা থেকে তার পরবর্তী একই দশার মাঝে দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। (ছবি 7.4) অর্থাৎ এক পর্যায় কালে একটা তরঙ্গ যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

তরঙ্গের মাঝে দ্বিতীয় আরো একটি রাশি রয়েছে যেটা সরল স্পন্দিত কম্পনে নেই, সেটি হচ্ছে তরঙ্গের বেগ। প্রতি সেকেন্ডে একটা তরঙ্গ যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গের বেগ। প্রতি সেকেন্ডে যে কয়টি পর্যায় কাল থাকে সেটি হচ্ছে কম্পাংক, কম্পাঙ্ক যদি f এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি λ হয় তাহলে বেগ v:

$$v = f\lambda$$

একটা তরঙ্গ যখন একটা মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখন তার বেগের পরিবর্তন হয় যেহেতু কম্পাঙ্ক সব সময় সমান থাকে তাই তরঙ্গ যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখন তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ তরঙ্গ বিভিন্ন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যাবার সময় তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিংবা বেগের পরিবর্তন হয় কিন্তু কম্পাঙ্কের বা পর্যায়কালের কখনো পরিবর্তন হয় না।

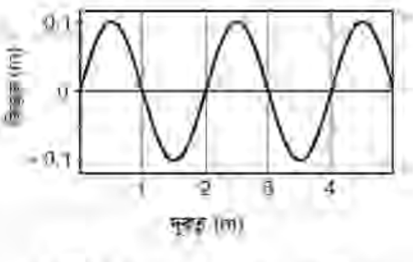

ছবি 7.5: অবস্থানের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ।

উদাহরণ 7.2: ছবি 7.5 এ একটি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে এর বিস্তার, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, দোলন কাল কম্পাঙ্ক এবং বেগ বের করো।

উত্তর: তরঙ্গটির বিস্তার $0.1 m$ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $2 m$. এই ছবিটিতে যে তথ্য দেয়া আছে সেখান থেকে পর্যায় কাল, কম্পাঙ্ক বা বেগ বের করা সম্ভব নয়। উপরের তরঙ্গটি অনেকটা একটা তরঙ্গের আলোক চিত্রের মতো। এখান থেকে আর অন্য কিছু বের করা সম্ভব নয়—এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে তরঙ্গের অবস্থা। সময়ের সাথে অবস্থানের কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে এখানে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

উদাহরণ 7.3: ছবিতে অন্য একটি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে এর বিস্তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পর্যায় কাল কম্পন এবং বেগ বের করো।

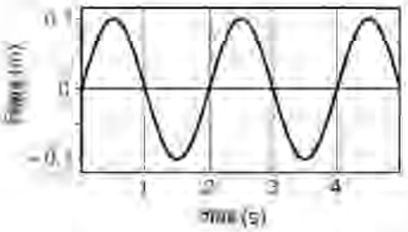

ছবি 7.6: সময়ের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ

উত্তর: এই তরঙ্গের বিস্তার $0.1m$, পর্যায় কাল $2s$, এই ছবি থেকে অন্য কোনো তথ্য বের করা সম্ভব না। এই ছবিটিতে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সময়ের সাথে সাথে তরঙ্গটি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেটি দেখানো হয়েছে কাজেই এখান থেকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত বলা সম্ভব নয়।

উদাহরণ 7.4: 7.7 ছবিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন অবস্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে বিভিন্ন সময়ে একটি তরঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হয়েছে। এর বিস্তার, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, দোলনকাল কম্পন এবং বেগ বের করো।

উত্তর: প্রথম ছবি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তরঙ্গটির

বিস্তার $a = 1m$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $\lambda = 1m$

দ্বিতীয় ছবি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তরঙ্গটির

বিস্তার $a = 1m$

দোলন কাল $T = 0.2s$

দোলন কাল থেকে কম্পন f বের করতে পারি

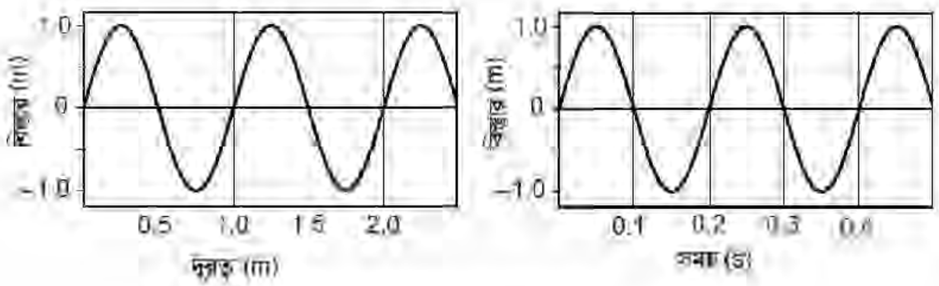

ছবি 7.7: অবস্থান এবং সময়ের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ

$$f = \frac{1}{T} = 5s^{-1} = 5Hz$$

কাজেই দুটি ছবির তথ্য ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি

তরঙ্গটির বেগ v

$$v = \lambda f = 1m \times 5m/s^{-1}$$

উদাহরণ 7.5: ছবি 7.8 এ একটি তরঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হয়েছে, কোন কোন অবস্থানে দশা এক?

উত্তর: A এবং C তে দশা এক

A এবং B তে তরঙ্গের মান সমান হলেও দশা বিপরীত

D এবং E তে মান সমান হলেও দশা এক নয়।

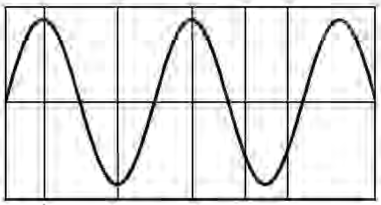

ছবি **7.8:** ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে একটি তরঙ্গের দশা

7.3 শব্দ তরঙ্গ (Sound Wave)

শব্দ তরঙ্গ তৈরি করতে তার একটা উৎসের দরকার, সেটাকে পাঠানোর জন্য একটা মাধ্যমের দরকার এবং সেই শব্দ গ্রহণ করার জন্য কোনো এক ধরনের রিসিভার দরকার। আমাদের চারপাশে অসংখ্য শব্দের উৎস রয়েছে। অবশ্যই সবচেয়ে পরিচিত উৎস আমাদের কণ্ঠ, সেখানে যে ভোকাল কর্ড আছে আমরা তার ভেতর দিয়ে বাতাস বের করার সময় সেখানে যে কম্পন হয় সেটা দিয়ে শব্দ তৈরি হয়। কথা বলার সময় আমরা যদি গলায় স্পর্শ করি তাহলে আমরা সেই কম্পনটা অনুভব করতে পারব। আমাদের কণ্ঠ ছাড়াও স্পিকার শব্দের উৎস হিসেবে কাজ করে, সেখানে যে পাতলা ডায়াফ্রাম রয়েছে সেটিকে সুনির্দিষ্টভাবে কাঁপিয়ে শব্দ তৈরি করা হয়। স্কুলের ঘণ্টার মাঝে আঘাত করলে সেটি কাঁপতে শুরু করে শব্দ তৈরি করে এবং তখন হাত দিয়ে সেটাকে চেপে ধরে কম্পন বন্ধ করে ফেলা যায় সাথে সাথে শব্দও বন্ধ হয়ে যাবে। গিটারের তারে টোকা দিলে সেটি কাঁপতে থাকে এবং শব্দ তৈরি করে। ল্যাবরেটরিতে সুর শলাকা দিয়ে নির্দিষ্ট কম্পনে শব্দ তৈরি করা যায়।

কম্পন দিয়ে শব্দ তৈরি করার পর সেটিকে এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর জন্য একটা মাধ্যমের দরকার হয়। শব্দ তরল কিংবা কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়েও পাঠানো যায় কিন্তু আমরা বাতাসকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেই শব্দ শুনে অভ্যস্ত। মাধ্যম ছাড়া যে শব্দ যেতে পারে না সেটি দেখানোর জন্য ল্যাবরেটরিতে 7.9 ছবিতে দেখানো উপায়ে একটা কলিং বেল রেখে সেটাকে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বাজানো যেতে পারে। তারপর একটা পাম্প দিয়ে ধীরে ধীরে বায়ুশূন্য করা শুরু করলে কলিং বেলের শব্দ মৃদু হতে শুরু করবে। বেলজারটি পুরোপুরি বায়ুশূন্য করা হলে ভেতরে কলিং বেলটি বাজতে থাকলেও বাইরে থেকে মনে হবে সেটি কোনো শব্দ তৈরি করছে না।

আমরা আমাদের কান দিয়ে শব্দ শুনতে পাই। শব্দের কম্পন যদি $20\,Hz$ থেকে $20{,}000\,Hz$ এর মাঝখানে থাকে তাহলে সেই শব্দ শোনা যায়। (তবে কানে হেডফোন লাগিয়ে অবিরত গান শুনে কিংবা প্রচণ্ড শব্দ দূষণে থাকলে অনেক সময় শোনার ক্ষমতা কমে যায়।) শব্দের কম্পন $20\,Hz$ থেকে কম হলে সেটাকে ইনফ্রা সাউন্ড এবং $20\,Hz$ থেকে বেশি হলে আলট্রা সাউন্ড বলে। $20\,Hz$ থেকে কম কিংবা $20{,}000\,Hz$ থেকে বেশি কম্পন তৈরি করা হলে সেটি বাতাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে আমরা সেটি শুনতে পারব না। তবে এ ধরনের শব্দের অস্তিত্ব বুঝতে হলে আমরা বিশেষ ধরনের মাইক্রোফোন বা রিসিভার ব্যবহার করতে পারি। অনেক পশুপাখি কম কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। ভূমিকম্পের আগে আগে এ ধরনের কম কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি হয় এবং অনেক সময় পশুপাখি সেই শব্দ শুনে আতংকে ছোটাছুটি করেছে সে ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

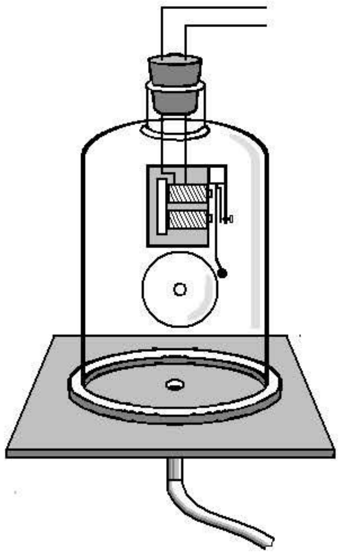

ছবি 7.9: বেলজার থেকে বাতাস পাম্প করে সরিয়ে নিলে কলিং বেলে শব্দটি আর শোনা যাবে না

উদাহরণ 7.6: $1kHz$ কম্পনের একটি সুর শলাকা বা টিউনিং ফর্ক দিয়ে শব্দ তৈরি করে সেটি বাতাসে পানিতে এবং লোহার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে দিয়ে তার বেগ নির্ণয় করে দেখা গেছে শব্দের বেগ বাতাসে $334m/s$, পানিতে $1493m/s$ এবং লোহার ভেতরে $5130m/s$ কোন মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?

উত্তরঃ তরঙ্গের বেগ $v = \lambda f$ যেখানে λ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং f কম্পন। এখানে কম্পন $1kHz$ বা $1000\,Hz.$ কাজেই

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

বাতাসে

$$\lambda = \frac{334ms^{-1}}{10^3 s^{-1}} = 0.3m$$

পানিতে

$$\lambda = \frac{1493ms^{-1}}{10^3 s^{-1}} = 1.49m$$

লোহায়

$$\lambda = \frac{5130ms^{-1}}{10^3 s^{-1}} = 5.13m$$

7.3.1 প্রতিধ্বনি

শব্দ যেহেতু এক ধরনের তরঙ্গ তাই তার প্রতিফলন হতে পারে। সাধারণত বড় ফাঁকা দালানের ভেতর কথা বললে এক ধরনের গমগম আওয়াজ হয় সেটি প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। দালানের ভেতর দূরত্ব বেশি নয় বলে শব্দটা আলাদাভাবে শুনতে পাই না। আমরা যখন কিছু শুনি তার অনুভূতিটা $0.1\ s$ পর্যন্ত থেকে যায় তাই দুটি শব্দ আলাদাভাবে শুনতে হলে দুটি শব্দের মাঝে কমপক্ষে $0.1\ s$ এর একটা ব্যবধান থাকা দরকার। শব্দের বেগ $330\ m/s$ কাজেই $0.1\ s$ এর ব্যবধান তৈরি করতে শব্দকে কমপক্ষে $33\ m$ দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। একটি বড় দেয়াল, দালান কিংবা খাড়া পাহাড়ের সামনে কমপক্ষে এই দূরত্বের অর্ধেক দূরত্বে ($16.5\ m$) দাঁড়ালে শব্দটি গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে $0.1\ s$ সময় লাগবে এবং আমরা শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাব।

বাদুড়ের চোখ আছে এবং সেই চোখে বেশ ভালো দেখতে পায় তারপরও তারা ওড়ার সময় শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে। বাদুর ওড়ার সময় তার কণ্ঠ থেকে শব্দ তৈরি করে, সামনে কোনো কিছু থাকলে শব্দটি সেখানে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে, কতক্ষণ পর শব্দটি ফিরে এসেছে সেখান থেকে বাদুর দূরত্বটা অনুমান করতে পারে। এ জন্য অন্ধকারেও বাদুর কোথাও ধাক্কা না খেয়ে উড়ে যেতে পারে। বাদুরের তৈরি এই শব্দ আমরা শুনতে পাই না কারণ শব্দটি আলট্রা-সাউন্ড অর্থাৎ আমাদের শোনার বাইরের কম্পাঙ্কের শব্দ।

7.3.2 শব্দের বেগের পার্থক্য :

বাতাসে শব্দের বেগ তাপমাত্রার বর্গমূলের সাথে আনুপাতিক। অর্থাৎ

$$v \propto \sqrt{T}$$

এখানে তাপমাত্রা কিন্তু সেলসিয়াস তাপমাত্রা নয়– কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা।

শব্দের বেগ বাতাসের চাপের ওপর নির্ভর করে না তবে বাতাসের ঘনত্বের বর্গমূলের ওপর ব্যস্তানুপাতিক ভাবে নির্ভর করে। তাই বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে বাতাসের ঘনত্ব কমে যায় সে জন্য শব্দের বেগ বেড়ে যায়।

টেবিল 7.1 বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ

মাধ্যম	m/s
বাতাস	330
হাইড্রোজেন	1,284
পারদ	1,450
পানি	1,493
লোহা	5,130
হীরা	12,000

শব্দ একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ। এটি মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতার ওপর নির্ভর করে। তরল এবং কঠিন পদার্থের প্রকৃতি বাতাস থেকে ভিন্ন এবং স্বাভাবিক কারণেই শব্দের বেগ সেখানে ভিন্ন। তরলে শব্দের বেগ

বাতাস থেকে বেশি এবং কঠিন পদার্থে শব্দের বেগ তরল থেকেও বেশি। টেবিল 5.1 এ বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ 7.7: কোনো জায়গায় শীতকালে তাপমাত্রা $10\,^{\circ}C$ এবং শব্দের বেগ $332\,m/s$। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেড়ে $30\,^{\circ}C$ হলে শব্দের বেগ কত?

উত্তর: $v \propto \sqrt{T}$

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$$

$$v_1 = v_2\sqrt{\frac{T_1}{T_2}} = 332\sqrt{\frac{273+30}{273+10}}\,m/s = 343.5\,m/s$$

7.3.3 শব্দের ব্যবহার

আলট্রাসনোগ্রাফি: শব্দের প্রচলিত ব্যবহারের কথা নিশ্চয়ই আর কাউকে আলাদা করে বলতে হবে না, আমরা কথা বলি, গান শুনি, ডাক্তারেরা হৃদস্পন্দন শোনেন, ইঞ্জিনিয়াররা যন্ত্রপাতির শব্দ শোনেন ইত্যাদি ইত্যাদি। শব্দের আরো কিছু ব্যবহার আছে, যার কথা তোমরা হয়তো শোনোনি। সন্তানসম্ভবা মায়ের গর্ভে যে নবজাতকটি বড় হয় বাইরে থেকে তাকে দেখার কোনো উপায় ছিল না, এখন আলট্রা সনোগ্রাফি নামে একটি প্রক্রিয়ায় মায়ের গর্ভে আলট্রাসাউন্ড পাঠানো হয়, শিশুর শরীর থেকে প্রতিফলিত হয়ে যেটুকু ফিরে আসে সেটাকে ব্যবহার করে শিশুর শরীরের একটা রূপ বের করে আনা হয়। শুধু সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য নয় শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও এটি ব্যবহার করে দেখা সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক আলট্রাসনোগ্রাফির অনেক উন্নতি হয়েছে এবং একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে আলট্রাসাউন্ড পাঠিয়ে সেটাকে ধারণ (Detect) করে একটা নিখুঁত ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে(ছবি 7.10)।

ছবি 7.10: মায়ের গর্ভে নিখুঁত আলট্রাসাউন্ড ত্রিমাত্রিক ছবি

ত্রিমাত্রিক সিসমিক সার্ভে: মাটির নিচে গ্যাস বা তেল আছে কি না দেখার জন্য সিসমিক সার্ভে করা হয়। এটি করার জন্য মাটির খানিকটা নিচে ছোট বিস্ফোরণ করা হয়, বিস্ফোরণের শব্দ মাটির নিচের বিভিন্ন

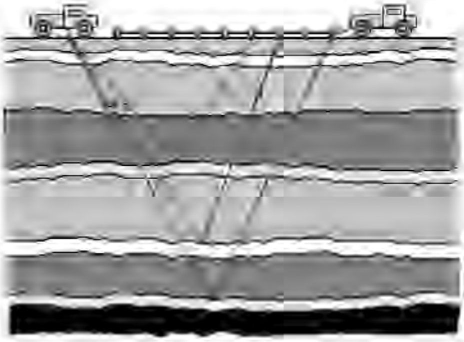

ছবি 7.11: শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন থেকে ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সম্পর্কে তথ্য জানা যায়।

স্তরে আঘাত করে প্রতিফলিত হয়ে উপরে ফিরে আসে। জিওফোন (Geophone) নামে বিশেষ এক ধরনের রিসিভারে সেই প্রতিফলিত তরঙ্গকে শনাক্ত (Detect) করা হয়। সমস্ত তথ্য-বিশ্লেষণ করে মাটির নিচের নিখুঁত ত্রিমাত্রিক ছবি বের করে কোথায় গ্যাস বা কোথায় তেল আছে বের করে নেয়া হয়। শব্দের উৎসটি কোথায় আছে এবং জিওফোন কোথায় আছে দুটিই জানা থাকার কারণে উৎস থেকে জিওফোনে শব্দ আসতে কতটুকু সময় লেগেছে জানতে পারলেই বিভিন্ন স্তরের দূরত্ব নিখুঁতভাবে বের করা যায়।

আলট্রাসাউন্ড ক্লিনার: ল্যাবরেটরিতে যখন ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করতে হয় তখন আলট্রাসাউন্ড ক্লিনার ব্যবহার করা হয়। এখানে কোনো একটি তরলে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ডুবিয়ে রেখে তার ভেতর আল্ট্রাসাউন্ড পাঠানো হয়, তার কম্পনে যন্ত্রপাতির সব ময়লা বের হয়ে আসে।

7.3.4 সুরযুক্ত শব্দ

আমাদের চারপাশে নানা ধরনের শব্দ রয়েছে তার মাঝে কিছু কিছু শব্দ শুনতে আমাদের ভালো লাগে আবার কিছু কিছু শুনতে আমাদের বিরক্তি হয়। যে সকল শব্দ শুনতে আমাদের ভালো লাগে তার মাঝে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। 7.12 ছবিতে বেশ কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের শব্দের তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর সবগুলোই পর্যাবৃত্ত কম্পন। সুরশলাকা বা টিউনিংফর্ক থেকে নিখুঁত একটি কম্পনের শব্দ বের হয়— কিন্তু সুরযুক্ত শব্দে শুধু একটি তরঙ্গ থাকে না একাধিক তরঙ্গ পরস্পরের উপরে উপস্থাপন করে শব্দটিকে সুরেলা করে তোলে। সুরেলা শব্দকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

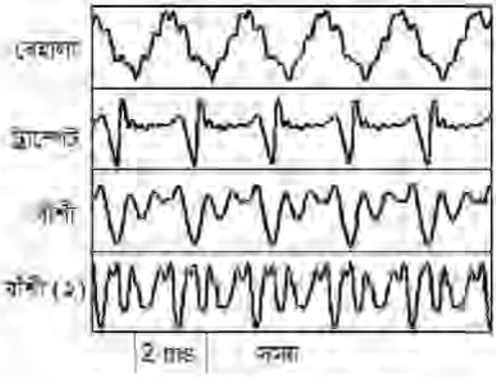

ছবি 7.12: ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ তরঙ্গ।

টোন (Tone): আলাদাভাবে শোনা সম্ভব সে রকম সুরেলা শব্দ (সা রে গা মা পা ধা নি সা)
পিচ (Pitch): কম্পাঙ্ক
রিদম (Rhythm): তাল
টেম্পো (Tempo): কত দ্রুত
কন্টুর (Contour): সুরের তারতম্য
টিম্বার (Timbre): ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের থেকে আসা শব্দের মাঝে পার্থক্য যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে বোঝা যায় সেটি হচ্ছে সুরের গুণ বা জাত
প্রাবল্য (Loudness): সুরেলা শব্দের প্রাবল্য কত জোরে শোনা যাচ্ছে
অবস্থান (Spatial location): সুরেলা শব্দ কোথা থেকে আসে তার অবস্থান
রিভারবেরাশেন (Reverberation): প্রতিধ্বানর পরিমাপ

সুরেলা শব্দ তৈরি করার জন্য নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

তার দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র: একতারা, বেহালা, সেতার
বাতাসের প্রবাহ দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র: বাঁশি, হারমোনিয়ামক
আঘাত (Percussion) দিয়ে শব্দ তৈরি করার বাদ্যযন্ত্র: ঢোল, তবলা

আজকাল ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে সুরেলা শব্দ তৈরি করা হয়।

টেবিল 7.2: বিভিন্ন ধরনের শব্দের পরিমান

জেট ইঞ্জিন	$110 - 140\ dB$
ট্রাফিক	$80 - 90\ dB$
গাড়ী	$60 - 80\ dB$
টেলিভিশন	$50 - 60\ dB$
কথাবার্তা	$40 - 60\ dB$
নিঃশ্বাস	$10\ dB$
মশার পাখার শব্দ	$0\ dB$

7.3.5 শব্দের দূষণ

শব্দ আমাদের জীবনের খুব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়, কিন্তু এর বাড়াবাড়ি আমাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলতে পারে। আমরা যারা শহরে থাকি, বিশেষ করে যারা বড় একটি রাস্তার পাশে থাকি তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছি রাস্তায় বাস, গাড়ি ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ এবং অনবরত হর্নের শব্দ প্রায় সময়েই সহনশীল সহ্য সীমার বাইরে চলে যায়। দীর্ঘদিন এই শব্দ দূষণে থাকতে থাকতে আমরা অনেক সময় তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাই তখন যদি শব্দ দূষণ নেই সে রকম কোনো নিরিবিলি জায়গায় যাওয়ার

সৌভাগ্য হয় তখন হঠাৎ করে শব্দ দূষণ ছাড়া জীবনের অনেকটুকুর গুরুত্বটুকু ধরতে পারি। বিভিন্ন ধরনের শব্দের পরিমাণ 7.2 টেবিলে দেখানো হয়েছে।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না শব্দ দূষণের কারণে আমাদের শোনার ক্ষমতার অনেক ক্ষতি হয়। সমস্যাটিকে বাড়িয়ে তোলার জন্য আমাদের অনেকে অপ্রয়োজনেও কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শোনে।

শব্দ দূষণ কমানোর জন্য প্রথম প্রয়োজন দেশে এর বিরুদ্ধে আইন তৈরি করা যেন কেউ শব্দ দূষণ করতে না পারে এবং করা হলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যায়। এর পর প্রয়োজন জনসচেতনা। সবাইকে বিষয়টি বোঝাতে হবে, যথাসম্ভব কম হর্ন ব্যবহার করে চলাচল, কলকারখানায় শব্দ শোষণের যন্ত্র চালু, মাইকের ব্যবহার কমিয়ে কংবা বন্ধ করে দেয়া, কম শব্দের যানবাহন ব্যবহার ইত্যাদি। একই সাথে শহরের ফাঁকা জায়গায় প্রচুর গাছ লাগিয়ে শব্দকে শোষণ করার মতো ব্যবস্থাও নেয়া উচিত।

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

1. দেখাও যে একটি তরঙ্গ শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে পারে।
2. শীষ দিলে শব্দ হয় কেন?
3. "তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার সময় মাধ্যম প্রবাহিত হয় না, নিজ অবস্থানে তার সরল ছন্দিত স্পন্দন হয়" সত্য না মিথ্যা?
4. বজ্রপাত হলে শব্দ হয় কেন?
5. ওড়ার সময় আলট্রা-সাউন্ড শব্দ তৈরি না করে ইনফ্রা-সাউন্ড শব্দ তৈরি করলে বাদুড়ের কী সমস্যা হতো?

গাণিতিক সমস্যা:

1. 7.13 ছবিতে অবস্থান এবং সময়ের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। তরঙ্গটির বেগ কত?

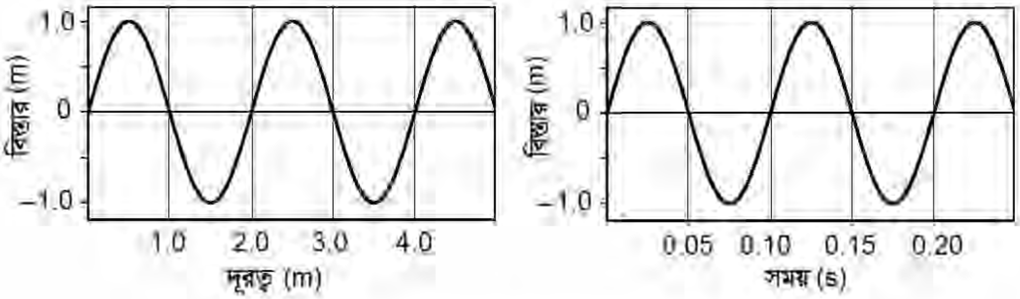

ছবি **7.13:** অবস্থান এবং সময়ের সাপেক্ষে একটি তরঙ্গ।

2. বেগ এবং শব্দের বেগ-এর অনুপাতকে $MACH$ বলে। $MACH$ 9 যুদ্ধবিমানের গতিবেগ কত?
3. কোনো একটি শহরে গ্রীষ্মকালে শব্দের বেগ 0.05% বেড়ে গেছে। শীতকালে তাপমাত্রা $10\ ℃$ হলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা কত?
4. আমরা $20Hz$ থেকে $20\ kHz$ পর্যন্ত শব্দ শুনতে পারি। $20Hz$ এবং $20kHz$ শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?
5. $dB = 10 \log\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$. P_2 জেট ইঞ্জিনের শব্দ এবং P_1 মশার পাখার শব্দ হলে, জেট ইঞ্জিনের শব্দ মশার পাখার শব্দ থেকে কতো গুণ বেশি?

অষ্টম অধ্যায়

আলোর প্রতিফলন

(Reflection of Light)

Ernest Rutherford (1871-1937)

আরনেস্ট রাদারফোর্ড

আরনেস্ট রাদারফোর্ডের জন্ম নিউজিল্যান্ডে এবং কর্মজীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন ইংল্যান্ডে। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করার জন্য তাঁকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। তিনি তার বড় কাজগুলো করেছিলেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান পরমাণুর কেন্দ্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসের ব্যাখ্যা দেয়া। তিনি যে শুধু নিজে অত্যন্ত বড় একজন ব্যবহারী পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর সহকমী এবং ছাত্রদের দিয়েও অনেক বড় গবেষণা করিয়েছেন। তিনি তাঁর হার্নিয়াকে অবহেলা করে যথাযথ চিকিৎসা না করায় এক ধরনের জটিলতায় মারা যান।

8.1 আলোর প্রকৃতি (Nature of Light)

আমরা চোখে যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আলো। আমরা চোখে গাছপালা দেখি, আকাশ দেখি, চেয়ার-টেবিল মানুষ দেখি তার মানে এই নয় যে গাছপালা আকাশ চেয়ার-টেবিল কিংবা মানুষ হচ্ছে আলো! এগুলো থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে সেই আলোটা আমাদের চোখে পড়ে, চোখের রেটিনা থেকে সেই আলো দিয়ে তৈরি সংকেত আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছায় আর আমাদের মস্তিষ্ক বুঝতে পারে কোনটা গাছপালা কিংবা কোনটা মানুষ। পুরো ব্যাপারটা শুরু হয় চোখের মাঝে আলো ঢোকা থেকে।

আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। তরঙ্গ হলেই তার একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে তার মানে আলোরও নিশ্চয়ই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে। আমরা যারা পুকুরে ঢিল ছুড়ে কিংবা একটা দড়িতে ঝাঁকুনি দিয়ে তরঙ্গ তৈরি করেছি তারা জানি যে ইচ্ছে করলেই ছোট বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ তৈরি করা যায়, তাই আলোরও নিশ্চয়ই নানা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকতে পারে। কথাটা সঠিক, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যা কিছু হতে পারে। সেটা কয়েক কিলোমিটার থেকেও বেশি হতে পারে আবার এক মিটারের ট্রিলিওন ট্রিলিওন ভাগের এক ভাগও হতে পারে। যে বিষয়টা আমাদের ভালো করে জানা দরকার সেটি হচ্ছে এই

সম্ভাব্য বিশাল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ছোট একটা অংশ আমরা দেখতে পাই, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর থেকে বেশি হলেও আমরা দেখতে পাই না আবার এর থেকে ছোট হলেও আমরা দেখতে পাইনা। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 400 nm থেকে 700 nm এর ভিতরে হলে আমরা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দেখতে পাই এবং সেটাকে আমরা বলি আলো। আমরা যে চোখে নানা রং দেখতে পাই সেগুলোও আসলে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো। তরঙ্গ

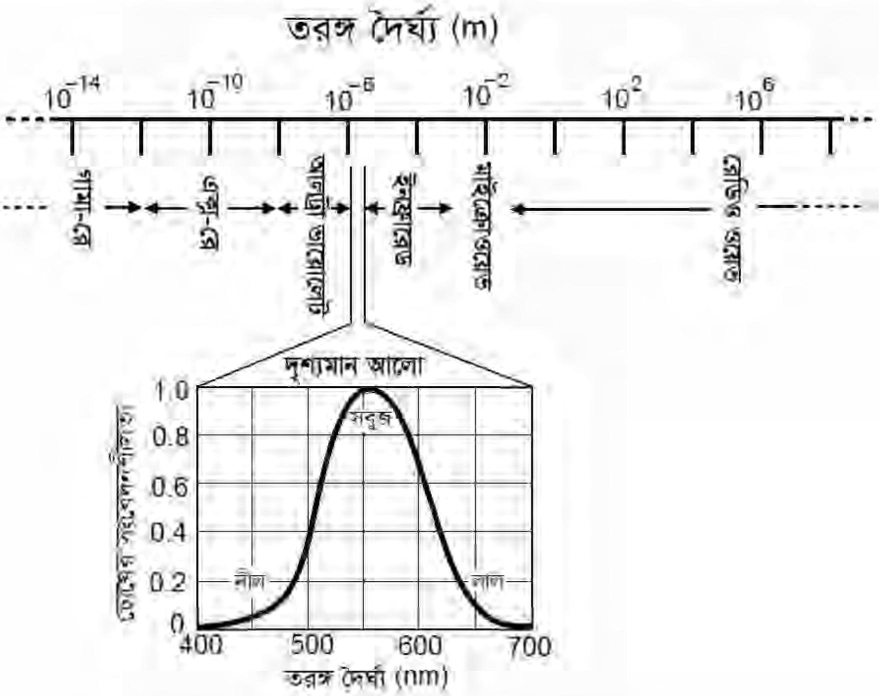

ছবি 8.1: আলোর স্পেকট্রাম এবং ভিন্ন ভিন্ন রংয়ে চোখে সংবেদনশীলতা

দৈর্ঘ্য যখন ছোট হয় সেটা হয় বেগুনী। যখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে তখন সেটা নীল সবুজ হলুদ কমলা লাল হয়ে চোখের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়! মানুষের চোখ এই ব্যাপ্তির এর বাইরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখতে পায় না– কিন্তু পোকা মাকড় বা অন্যান্য অনেক প্রাণী এর বাইরেও দেখতে পায়! বিভিন্ন আলোতে মানুষের চোখের সংবেদনশীলতা 8.1 ছবিতে দেখানো হয়েছে।

8.1 ছবিতে আলোর বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নামগুলো দেখানো হয়েছে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি দৃশ্যমান আলোর সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকেও ছোট হয় সেটাকে আমরা বলি আলট্রা ভায়োলেট আলো, আরো ছোট হলে এক্স রে আরো ছোট হলে গামা রে– যেটা তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়। আবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি দৃশ্যমান আলোর সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকেও বড় হয় সেটাকে আমরা বলি

ইনফ্রারেড আরো বড় হলে মাইক্রোওয়েভ আরো বড় হলে রেডিও ওয়েভ! পদার্থ বিজ্ঞান শিখতে হলে যে বিষয়গুলো জানতে হয়, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের এই বিভাজনটি হচ্ছে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা আমাদের চোখে যে আলো দেখতে পাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ছোট কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের অনেক চমকপ্রদ পরীক্ষা আছে যেগুলো দিয়ে আমরা এই তরঙ্গের নানা চমকপ্রদ এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি।

আলো সম্পর্কে আমরা যদি জানতে চাই তাহলে শুরু করতে পারি প্রতিফলন দিয়ে।

8.2 প্রতিফলন (Reflection)

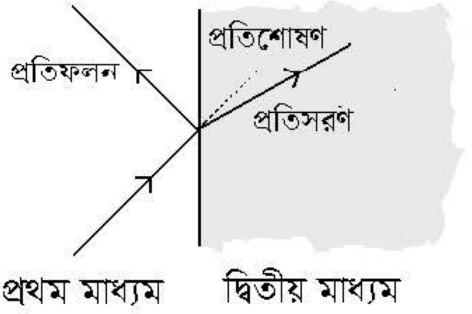

ছবি 8.2: এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও প্রতিশোষণ।

প্রতিফলন কথাটা বলতেই আমাদের প্রায় সবার চোখেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটা ভেসে ওঠে কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিফলন বিষয়টা আরো অনেক ব্যাপক। যখনই এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলোকে পাঠানো হয় তখনই আসলে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ঘটে, তার একটি হচ্ছে প্রতিফলন। অন্য দুটি হচ্ছে প্রতিসরণ আর প্রতিশোষণ। (ছবি 8.2)

প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে যাবার সময় খানিকটা আলো আবার প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে সেটার নাম হচ্ছে প্রতিফলন। খানিকটা আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢুকে যেতে পারে সেটা হচ্ছে প্রতিসরণ। আবার খানিকটা আলো শোষিত হয়ে যায় সেটার নাম হচ্ছে প্রতিশোষণ। এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিফলন এবং পরের অধ্যায়ে প্রতিসরণ নিয়ে আলোচনা করব।

আলো এক ধরনের তরঙ্গ, সাধারণভাবে তরঙ্গের যাওয়ার জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, (পানি না থাকলে পানির ঢেউটা হবে কোথায়?) কিন্তু আলোর বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এটা যেহেতু বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের তরঙ্গ তাই এটার জন্য কোনো মাধ্যমের দরকার নেই, আলো তার বিদ্যুৎ আর চৌম্বক ক্ষেত্র দুটির তরঙ্গ তৈরি করে নিজেরাই চলে যেতে পারে। কাজেই প্রতিফলন বা প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করার জন্য যখন প্রথম এবং দ্বিতীয় মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে তখন একটি মাধ্যম আসলে শূন্য মাধ্যমও হতে পারত। সত্যি কথা বলতে কী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কাচ বা পানিতে আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের যে উদাহরণগুলো দেখি– সেখানে একটা মাধ্যম বাতাস অন্যটি কাচ (কিংবা পানি)। বাতাস এত হালকা মাধ্যম যে সেটাকে শূন্য মাধ্যম ধরে নিলে এমন কিছু বড় ভুল হয় না।

8.2.1 প্রতিফলনের সূত্র

প্রতিফলনের সূত্র বোঝার আগে আমাদের কয়েকটা বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করে নেয়া দরকার। যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলো এসে পড়ে আমরা আপাতত ধরে নিই সেটি হচ্ছে একটা সমতল। বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা ধরে নিই যে আলোটা প্রতিফলিত হবে সেটা একটা আলোক রেখা বা আলোক রশ্মি। যখন একটা আলোক রশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমের ওপর একটা বিন্দুতে এসে পড়ে প্রথমেই সেই বিন্দু থেকে একটা লম্ব কল্পনা করে নিতে হবে। যে আলোক রশ্মিটি এসে সেই বিন্দুটিতে পড়েছে এবং যে লম্বটি কল্পনা করেছ সেই দুটি রেখাকে নিয়ে একটি সমতল কল্পনা করে নাও। (ছবি 8.3)

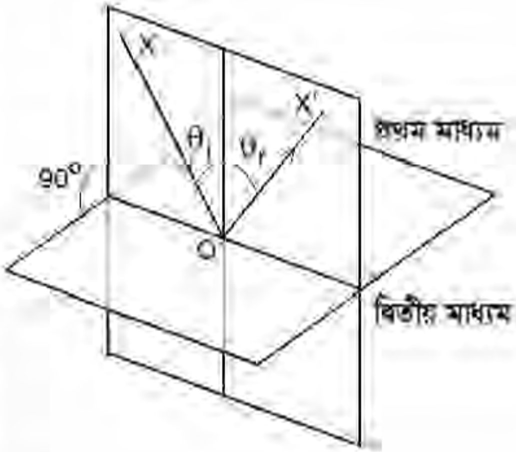

ছবি 8.3: প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর প্রতিফলন।

যে রশ্মিটি প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢোকার জন্য একটা বিন্দুতে আপতিত হয়েছে আমরা সেটাকে বলব, আপাতন রশ্মি (XO)। যে রশ্মিটি প্রতিফলিত হয়েছে (OX') সেটা হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি (বোঝাই যাচ্ছে যেটা দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢুকে যাবে সেটা প্রতিসরিত রশ্মি– এই অধ্যায়ে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না।) আপতিত রশ্মি লম্বের সাথে যে কোণ করবে সেটাকে বলব আপাতন কোণ θ_i, প্রতিফলিত রশ্মি লম্বের সাথে যে কোণ (θ_r) করবে সেটাকে বলব প্রতিফলিত কোন। এখন আমরা প্রতিফলনের সূত্র দুটি বলতে পারি:

প্রথম সূত্র: আপাতন রশ্মি এবং লম্ব দিয়ে আমরা যে সমতলটি কল্পনা করে নিয়েছিলাম প্রতিফলিত রশ্মিটি সেই সমতলেই থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র: প্রতিফলন কোণটি হবে আপাতন কোণের সমান।

উদাহরণ 8.1: 8.4 ছবিতে দেখানো অবস্থায় দুটি আয়না রাখা আছে। মাঝখানে ২ বিন্দুতে একটি মোমবাতি রাখা হয়েছে। মোমবাতির প্রতিবিম্ব কোথায় হবে?

উত্তর: আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বটিও আয়না দুটিতে দেখা যাবে এভাবে চলতেই থাকবে। কাজেই ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যাবে।

প্রতিফলনের দুটি সূত্র বলা হলেই প্রতিফলন নিয়ে সব কিছু বলা হয়নি, সত্যি কথা বলতে কী প্রতিফলনের

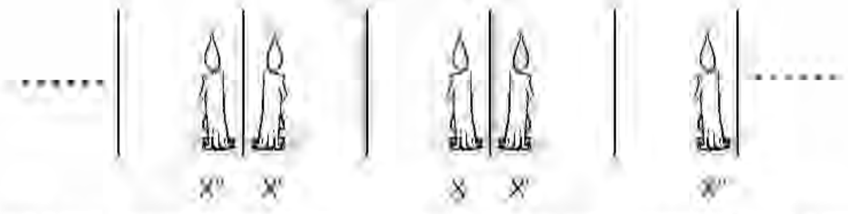

ছবি 8.4: দুটি সমান্তরাল আয়নার মাঝখানে একটি মোমবাতি X রাখা হলে তার প্রতিবিম্ব X' এবং প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব তৈরী হতে থাকে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাই বলা হয়নি, কতটুকু প্রতিফলন হবে? প্রতিফলনের জন্য যদি আয়না ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রায় পুরোটাই প্রতিফলিত হয়, কিন্তু প্রতিফলন কথাটি তো শুধু আয়নার জন্য তৈরি করা হয়নি– এটা তো যে কোনো দুটো মাধ্যমের মাঝে হতে পারে। কতটুকু প্রতিফলন হবে সেটার জন্য সূত্রটির নাম ফ্রেনেলের (Fresnel) সূত্র। সূত্রটা তোমরা আরেকটু বড় হয়ে শিখবে, এখন এটার মূল বিষয়টা জেনে শুধু রাখ– আপাতন কোণ যত বেশি হবে প্রতিফলনও হবে তত বেশি। তোমরা দেখেছ সাধারণ এক টুকরো কাঁচে প্রতিফলন হয় কম মাত্র 4% থেকে 5%, বাকীটা ভেতরে দিয়ে প্রতিসারিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিফলন কোণ যদি বেশি হয় 80° কিংবা 90° এর কাছাকাছি, তাহলে প্রতিফলিত আলো অনেক বেশি বেড়ে যায়। জানালার কাচের পাশে দাঁড়িয়ে তোমরা এখনই সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

8.2.2 প্রতিশোষণ

আমাদের চারপাশের জগতের সৌন্দর্যের বড় একটা অংশ আসে বিভিন্ন রং থেকে। কিন্তু রংটি আসে কেমন করে? আমরা যখন সবুজ পাতার মাঝে একটা লাল গোলাপ ফুল দেখি, সেটি কেন লাল কিংবা তার পাতাটি কেন সবুজ? বিষয়টা আরো বিস্ময়কর মনে হতে পারে যখন তোমরা দেখবে সবুজ আলোতে লাল ফুলটাকেই দেখাবে কুচকুচে কালো কিংবা লাল আলোতে সবুজ পাতাকে দেখাবে কুচকুচে কালো!

ছবি 8.5: আপাতন কোণ বেশি হলে প্রতিফলন অনেক বেশি হয়

বিষয়টা আসলে সহজ– সাধারণ আলোতে (অনেক সময় বলে সাদা আলো), আসলে সবগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই থাকে, রং যেহেতু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে তাই বলা যেতে পারে সেখানে সব রংয়ের আলো রয়েছে। যখন সবগুলো রং থাকে তখন সেখানে আলাদাভাবে কোন রং দেখা যায় না– তখন আলোটাকে আমরা বলি বর্ণহীন কিংবা সাদা আলো। এই আলোটা যখন একটা লাল গোলাপ ফুলে পড়ে তখন গোলাপ ফুলটা লাল রং ছাড়া অন্য সবগুলো রং শোষণ করে নেয়– তাই যে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে সেখানে লাল ছাড়া আর কোনো রং থাকে না এবং গোলাপ ফুলটাকে মনে হয় লাল। ঠিক সে রকম সবুজ পাতাটাতে সব রং এসে পড়ে এবং পাতাটা সবুজ ছাড়া অন্য সব রং শোষণ করে নেয় তখন যে রংটা প্রতিফলিত হয় সেটাতে সবুজ ছাড়া অন্য কোনো রংয়ের আলো থাকে না বলে পাতাটাকে দেখায় সবুজ। (ছবি ৪.6)

ছবি ৪.6: একটা বস্তু সব রং শোষণ করে যেটা প্রতিফলিত করে সেটাকেই তার রং বলে মনে হয়

যদি সম্পূর্ণ লাল আলোতে এই গোলাপ ফুল এবং পাতাটাকে দেখা হতো তাহলে ফুলটাকে ঠিকই লাল দেখা যেত কারণ এটা লাল রং শোষণ করে না কিন্তু পাতাটাকে তার সঠিক রংয়ে না দেখিয়ে দেখাবে কালো। কারন পাতাটা লাল রংকে শোষণ করে ফেলবে এবং কোনো রং প্রতিফলিত করবে না। ঠিক একই কারনে সবুজ আলোতে পাতাটা সবুজ দেখালেও সেই রংটা গোলাপ ফুল পুরোপুরি শোষণ করে নেবে বলে গোলাপ ফুল থেকে প্রতিফলিত হবার মতো কোনো রং থাকবে না বলে সেটাকে দেখাবে কালো।

৪.2.3 মসৃণ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠে প্রতিফলন

আয়না কিংবা আয়নার মতো মসৃণ পৃষ্ঠে আলোর সমান্তরাল রশ্মি গুলো প্রতিফলনের পরেও সমান্তরাল থাকে– কারণ প্রত্যেকটা রশ্মিই প্রতিফলনের সূত্র মেনে আপাতন কোণের সমান প্রতিফলন কোণে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পৃষ্ঠটি যদি মসৃণ না হয় তাহলে প্রতিফলনের পর আলোক রশ্মিগুলো আর সমান্তরাল না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। (ছবি ৪.7)

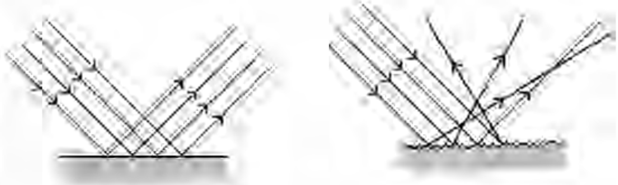

ছবি ৪.7: মসৃণ পৃষ্ঠে আলো প্রতিফলিত হয় কিন্তু অমসৃণ পৃষ্ঠে আলো বিচ্ছুরিত হয়

8.3 আয়না (Mirror)

আমরা সবাই আয়না (দর্পণ) দেখেছি। আয়নায় নিয়মিত প্রতিফলনের কারণে স্পষ্ট প্রতিবিম্বের তৈরি হয়। আয়না তৈরি করার জন্য কাচের পিছনে প্রতিফলনের উপযোগী রুপার প্রলেপ দেয়া হয়। কাচের সামনের পৃষ্ঠ থেকে 4% আলো প্রতিফলিত হলেও পিছনের পৃষ্ঠ থেকে পুরো আলো প্রতিফলিত হয় বলে সেটি মূল প্রতিবিম্বটি তৈরি করে। টেলিস্কোপ বা অন্য অপটিক্যাল (optical) যন্ত্রে যখন মূল প্রতিবিম্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন কাচের উপরেই রুপা বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেয়া হয় যেন একটি 4% হালকা আরেকটি 96% স্পষ্ট, এ রকম দুটি প্রতিবিম্ব তৈরি না হয়ে একটা 100% স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

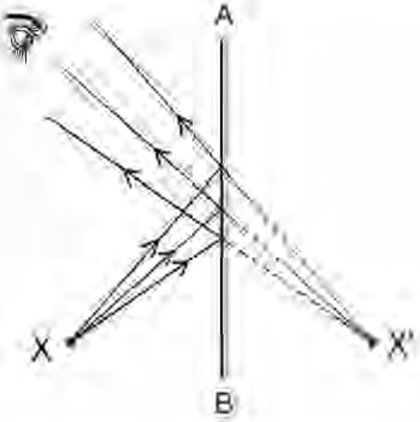

ছবি 8.8: X বস্তুটির প্রতিবিম্ব X' অবস্থানে দেখা যাবে

8.3.1 প্রতিবিম্ব:

তুমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়াও তখন তুমি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাও– তুমি আয়নার যতটুকু সামনে আছ, তোমার মনে হবে প্রতিবিম্বটি বুঝি ঠিক ততটুকু পিছনে আছে। 8.8 ছবিতে দেখানো হয়েছে X হচ্ছে একটি বস্তু সেখান থেকে তিনটি রশ্মি AB আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে (অর্থাৎ আপাতন কোণ = প্রতিফলিত কোণ)। প্রতিফলিত রশ্মিগুলোকে আমরা যদি আয়নার পিছনে বাড়িয়ে দিই তাহলে মনে হবে সবগুলো X' এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই বিন্দুটিই হচ্ছে X বস্তুটির প্রতিবিম্ব। সত্যিকার বস্তুতে একটা বিন্দু না থেকে অনেকগুলো বিন্দু থাকে এবং প্রত্যেকটা বিন্দুর একটা করে প্রতিবিম্ব হয়ে পুরো বস্তুটির প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

আমরা যদি জ্যামিতি ব্যবহার করে প্রতিবিম্বটির অবস্থান দেখাতে চাই তাহলে কমপক্ষে দুটি রশ্মি আঁকতে হবে। ছবিটা আঁকা অনেক সহজ হয় যদি আমরা একটি রশ্মি হিসেবে নিই সোজা লম্বভাবে যাওয়া রশ্মি XP এবং তার সাথে অন্য যে কোনো একটা রশ্মি XO ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে। OPX এবং OPX' ত্রিভুজ দুটি সর্বসম। অর্থাৎ $XP = X'P$ তার মানে X বিন্দুর প্রতিবিম্বটি X' আয়না থেকে বস্তুটির সমান দূরত্বে তৈরি হয়েছে।

উদাহরণ: 8.2 দেখাও OPX এবং OPX' ত্রিভুজ দুটি সর্বসম।

উত্তর: এখানে $\angle XPO = \angle X'PO$ কারণ দুটিই এক সমকোণ যেহেতু XP হচ্ছে আয়নার পৃষ্ঠে আঁকা লম্ব। প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী আপাতন কোণ প্রতিফলন কোণের সমান কাজেই $\angle XOP = \angle ROA$ আবার $\angle ROA = \angle X'OP$ কাজেই ত্রিভুজ OPX এবং OPX' এর মাঝে OP সাধারণ বাহু এবং এই বাহুর দুই দিকের কোণ দুটি সমান। OPX এবং OPX' ত্রিভুজ দুটি সর্বসম, তাই $XP = X'P$

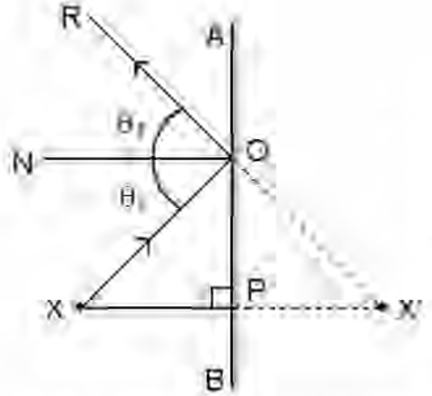

ছবি 8.9: X অবস্থানের বস্তুটির প্রতিবিম্ব দেখার জন্য XP এবং XO এই দুটি আলোক রশ্মি ব্যবহার করাই যথেষ্ট

কোনো আয়নায় আমরা যদি একটি বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখি তাহলে আমাদের মনে হয় প্রতিবিম্ব থেকে বুঝি আলোক রশ্মি আসছে– আসলে কিন্তু মোটেও সেই বিন্দু থেকে আলো আসছে না। আমরা পরে দেখব অনেক সময় কিন্তু সত্যি সত্যি এমনভাবে একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হয় যেখানে সত্যি সত্যি আলো কেন্দ্রীভূত হয় এবং সেখান থেকে আলোক রশ্মি বের হয়ে আসে। এ রকম প্রতিবিম্বকে বলে বাস্তব প্রতিবিম্ব এবং এই ধরনের প্রতিবিম্ব দিয়ে অনেক কাজ করা সম্ভব। আয়নায় যে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় সেখানে সত্যিকারের আলো কেন্দ্রীভূত হয় না তাই এর নাম অবাস্তব প্রতিবিম্ব।

8.10 ছবিতে একটি মাত্র বিন্দু না হয়ে একটা বিস্তৃত বস্তুর প্রতিবিম্ব কীভাবে তৈরি হয় দেখানো হয়েছে। X এবং Y বিন্দু থেকে আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে যথাক্রমে X' এবং Y' এ অবাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরী করেছে অর্থাৎ মনে হচ্ছে চোখে আলোক রশ্মি আসছে X' এবং Y' থেকে। দেখাই যাচ্ছে XY এর যে দৈর্ঘ্য $X'Y'$ এর সেই একই দৈর্ঘ্য। XY তে তীরের মাথাটি যদি উপরের দিকে হয় তাহলে $X'Y'$ তেও তীরের মাথাটি উপরের দিকে হবে। অর্থাৎ সাধারণ আয়নায় প্রতিবিম্ব:

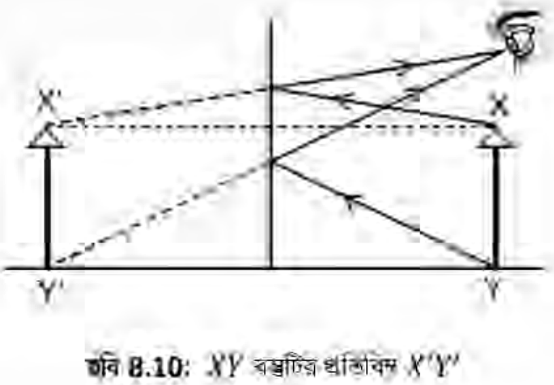

ছবি 8.10: XY বস্তুটির প্রতিবিম্ব $X'Y'$

(a) আয়না থেকে সমদূরত্বে
(b) অবাস্তব
(c) সোজা এবং
(d) সমান দৈর্ঘ্যের

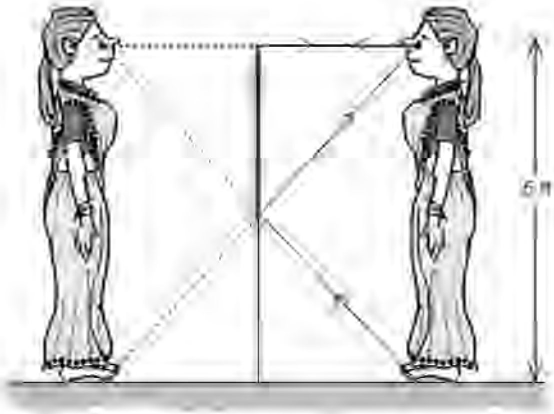

ছবি 8.11: পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রতিবিম্ব দেখার জন্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য আয়নার প্রয়োজন হয় না

আমরা আলাদা আলাদাভাবে এই বিষয়গুলো মনে করিয়ে দিচ্ছি কারণ একটু পরেই দেখব সাধারণ আয়নার বদলে অন্য ধরনের আয়না ব্যবহার করলে প্রতিবিম্ব ভিন্ন দূরত্বে হতে পারে, বাস্তব হতে পারে, উল্টো হতে পারে এমনকি ছোট কিংবা বড়ও হতে পারে।

উদাহরণ 8.3: পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রতিবিম্ব দেখার জন্যে আয়না কতো বড় হতে হয়?

উত্তর: 8.11 ছবির জ্যামিতি থেকে বলা যায় 0.5 মিটার। মজার ব্যাপার হচ্ছে তুমি আয়না থেকে 1 মিটার দূরেই থাকো কিংবা 10 মিটার দূরেই থাকো তোমার আয়নার দৈর্ঘ্য কিন্তু সবসময়েই হবে তোমার দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। তোমার মা বাবা কিংবা অন্য কেউ যদি সাজগোজ করার পর তাদের কেমন দেখাচ্ছে দেখার জন্য ফুল লেংথ মিরর কিনতে যায় তাদেরকে বলো- অর্ধেক লেংথ কিনলেই কাজ চলে যাবে।

উদাহরণ 8.4: দুটি আয়না পরস্পরের সাথে 60° কোণে রাখা আছে। প্রথম আয়নায় 60° তে আলো ফেলা হলে আলোক রশ্মি কোন দিকে যাবে?

উত্তর: জ্যামিতি থেকে বলা যায় রশ্মিটি B বিন্দুতে আপতিত হবে এবং ঠিক বিপরীত দিকে প্রতিফলিত হবে।

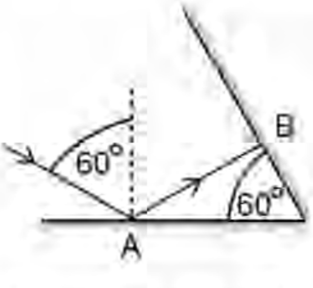

ছবি 8.12: 60° কোণে রাখা দুটি আয়নার একটিতে A বিন্দুতে 60° কোণে আলো আপতিত হচ্ছে

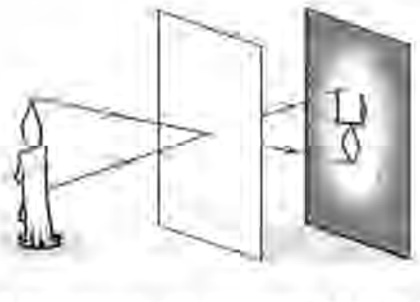

ছবি 8.13: সূক্ষ্ম ফুটো দিয়ে কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করা সম্ভব

উদাহরণ 8.5: একটা অন্ধকার ঘরে একটা বোর্ডের মাঝে খুব ছোট একটা ফুটো করে একটা জ্বলন্ত মোমবাতির সামনে রাখ। ছবিতে দেখানো উপায়ে বোর্ডটার অন্যপাশে একটা সাদা কাগজ রাখ। সাদা কাগজে যদি অন্য কোথা থেকে আলো পড়তে না দাও তাহলে সেখানে মোমবাতির শিখার একটি প্রতিবিম্ব দেখবে। পিছনের সাদা কাগজটি সামনে পিছনে সরিয়ে প্রতিবিম্বটি ছোট বড় করতে পারবে। প্রতিবিম্বটি কি বাস্তব নাকি অবাস্তব? সোজা না উল্টো – সমদূরত্বে না ভিন্ন দূরত্বে? বড় না ছোট?

উত্তরঃ বাস্তব, উল্টো, সকল দূরত্বে স্পষ্ট, যত দূরে তত বড়। এই পদ্ধতিতে পিন হোল ক্যামেরা তৈরী হয়।

উদাহরণ 8.6: 8.14 ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে দুটি আয়না AO এবং BO লম্বভাবে রাখা আছে। তার সামনে একটি বস্তু রাখা হলো। বস্তুটির প্রতিবিম্ব আঁক।

উত্তরঃ AO এবং BO আয়নাতে দুটি প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। $A'OB'$ ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে।

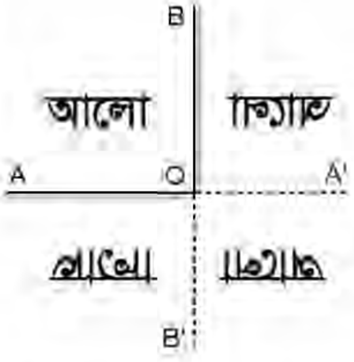

ছবি 8.14: সমকোণে রাখা দুটি আয়নায় "আলো" শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলন

8.4 গোলীয় আয়না (Spherical Mirror)

সাধারণ সমতল আয়না আমরা সবাই দেখেছি কিন্তু সত্যিকারের গোলীয় আয়না আমরা সবাই নাও দেখতে পারি– তবে গোলীয় আয়নার মূল বিষয়টি কিন্তু চকচকে নূতন চামচে অনেকটা দেখা যায়! গোলীয় আয়না দুই রকমের হয়ে থাকে অবতল এবং উত্তল। একটা ফাঁপা গোলকের খানিকটা কেটে তার পৃষ্ঠে রুপা বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ লাগিয়ে অবতল কিংবা উত্তল গোলীয় আয়না তৈরি করা যায়। কোন পৃষ্ঠে রুপা বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেয়া হবে তার ওপর নির্ভর করবে এই গোলীয় আয়নাটি অবতল না উত্তল গোলীয় আয়না হবে।

8.5 উত্তল আয়না (Convex Mirror)

তোমরা যদি কখনো একটা চকচকে চামুচের নিচের বা পিছনের অংশে নিজের চেহারা দেখার চেষ্টা করে থাক (ছবি 8.15) তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে সেখানে তুমি তোমার চেহারাটা সোজা দেখালেও সেটি হবে তুলনামূলকভাবে ছোট। চামচের এই অংশটা উত্তল আয়নার মতো কাজ করে। সত্যিকারের উত্তল আয়না একটা প্রকৃত গোলকের অংশ হয়। ধরা যাক গোলকটির ব্যাসার্ধ r (ছবি 8.16) এবং তার একটা অংশ কেটে তার উত্তল অংশটির দিকে থেকে আলোর প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আয়নায় একটা

ছবি 8.15: একটি চামচের উল্টো পৃষ্ঠা উত্তল গোলক আয়নার মতো।

সমান্তরাল আলো ফেলা হলে আলোটি চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে, ছড়িয়ে যাওয়া আলোক রশ্মিগুলো যদি আয়নার কেন্দ্রের দিকে বর্ধিত করি তাহলে মনে হবে সেটা বুঝি একটা বিন্দু থেকে ছড়িয়ে গেছে। ঐ বিন্দুটিকে বলে ফোকাস বিন্দু। উত্তল আয়নার যে পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলন হয় তার কেন্দ্র বিন্দুটিকে বলে মেরু বিন্দু এবং এই বিন্দু থেকে ফোকাস বিন্দুর দূরত্বটিকে বলে ফোকাস দূরত্ব (f)।

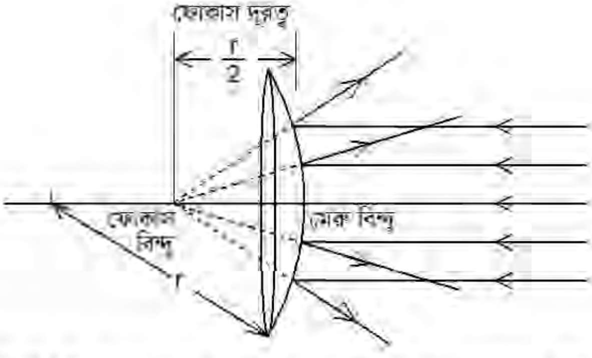

ছবি 8.16: উত্তল আয়নার ফোকাস দূরত্ব গোলকের ব্যাসার্ধের অর্ধেক

উদাহরণ 8.7: সমতল আয়নাকে যদি আমরা গোলীয় উত্তল আয়না হিসেবে কল্পনা করি তাহলে তার ফোকাস দূরত্ব কত?

উত্তর: অসীম।

একটা গোলীয় আয়নাকে আমরা সব সময়েই একটা গোলকের অংশ হিসেবে কল্পনা করতে পারি। ঐ গোলকটির ব্যাসার্ধ যদি r হয় তাহলে ফোকাস দূরত্ব হবে $\frac{r}{2}$.

উদাহরণ 8.8: প্রমাণ কর $f = \frac{r}{2}$

উত্তর: মজার ব্যাপার হচ্ছে তুমি কিন্তু এটা পুরোপুরি প্রমান করতে পারবে না– এর কাছাকাছি প্রমাণ করতে পারবে। ধরা যাক গোলীয় আয়নার মূল অক্ষের সাথে সমান্তরাল দুটি রশ্মি A এবং B থেকে মেরু বিন্দু X এবং অন্য একটি বিন্দু Y এসেছে (ছবি 8.17)। যে রশ্মিটি X বিন্দুতে এসেছে সেটি প্রতিফলিত হয়ে যেদিকে এসেছে ঠিক সেদিকেই ফিরে যাবে। আমরা এই রেখাটিকে গোলকের কেন্দ্র O বিন্দু পর্যন্ত বর্ধিত করি, দেখাই যাচ্ছে $OX = r$ (গোলকের ব্যাসার্ধ) যে রশ্মিটি Y বিন্দুতে এসেছে সেটি সেই বিন্দুতে লম্ব ON এর সাথে θ_i আপাতন কোণ করেছে। প্রতিফলন কোণ $\theta_r = \theta_i$ এবং সেটি YP দিকে যাবে। আমরা PY কে বর্ধিত করলে সেটি OX রেখাকে F বিন্দুতে ছেদ করবে।

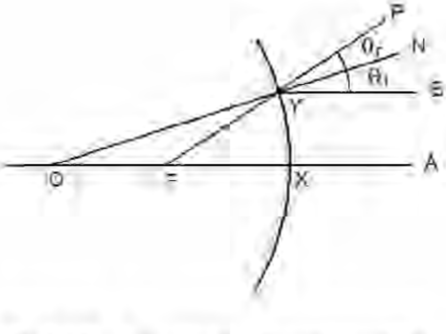

ছবি 8.17: একটা গোলীয় উত্তল আয়না আসলে একটা গোলকের অংশ

$FO = FY$ কারণ OFY ত্রিভুজের $\angle FOY = \angle OYF$ যেহেতু $\angle FOY = \theta_i$ এবং $\angle FYO = \theta_r$

$FY \cong FX$ যখন XF ব্যাসার্ধ r থেকে অনেক ছোট হয় তখন এটি সত্য। বেশির ভাগ উত্তল আয়নায় এটি সত্যি।

কাজেই $FO = FY = FX = \frac{r}{2}$

8.5.1 গোলীয় উত্তল আয়নায় প্রতিবিম্ব

আমরা আগেই বলেছি চামচের বাইরের অংশটা গোলীয় উত্তল আয়নার মতো কাজ করে এবং সেখানে তুমি নিজেকে দেখতে চাইলে ছোট এবং সোজা একটা প্রতিবিম্ব দেখতে পাও। যার অর্থ আমরা গোলীয় উত্তল আয়নার প্রতিবিম্বটি সব সময়েই ছোট দেখার কথা। ছবিতে একটা উত্তল আয়নার সামনে XY একটি বস্তু রাখা আছে Y বিন্দু থেকে আলো R বিন্দুতে এলে সেটি লম্বভাবে প্রতিফলিত হয়ে আবার Y বিন্দুর দিকেই ফিরে যায় যার অর্থ XY বস্তুর Y বিন্দুর প্রতিবিম্বটি এই OY রেখার কোথাও হবে। সেটি ঠিক কোথায় জানতে হলে X বিন্দু থেকে অন্য দিকে আরেকটি রশ্মি আঁকতে হবে– আমাদের সেটি করার প্রয়োজন নেই– কারণ X বিন্দুটির প্রতিবিম্বটি বের করে সেখান থেকে আমরা এটি জেনে নেব।

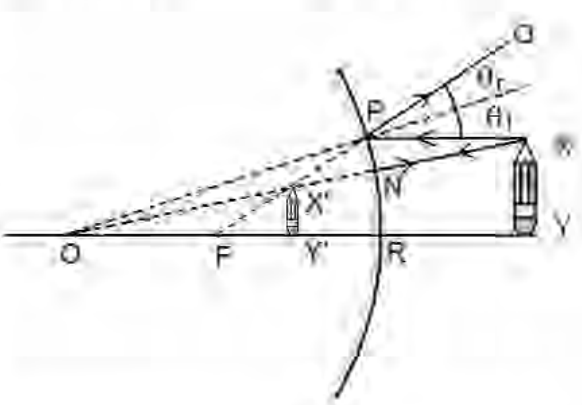

ছবি 8.18: উত্তল আয়নায় একটি বস্তু XY ফোকাস দূরত্বের ভেতরে রাখা হলে প্রতিবিম্বটি $X'Y'$ বড় দেখায়।

X বিন্দুর প্রতিবিম্ব বের করার জন্য দুটি রশ্মি আঁকতে হবে, একটি আগের মতো সরাসরি O বিন্দুর সাথে যুক্ত করি। YR রশ্মিটি যে রকম লম্বভাবে প্রতিফলিত হয়ে Y এর দিকে ফিরে গিয়েছিল এই রশ্মিটিও ঠিক একইভাবে N বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে X এর দিকে ফিরে যাবে। দ্বিতীয় রশ্মিটি YR এর সাথে সমান্তরালভাবে আঁকা যেতে পারে সেটা উত্তল আয়নার P বিন্দুতে স্পর্শ করলে মনে হবে যেন F বিন্দু থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে কাজেই আমরা FP কে যুক্ত করে Q এর দিকে বাড়িয়ে দিতে পারি।

FP রেখাটি OX রেখাকে X' বিন্দুতে ছেদ করেছে যার অর্থ X বিন্দুর প্রতিবিম্বটি হবে X' বিন্দুতে। যেহেতু আমাদের মনে হবে X বিন্দুর প্রতিফলনটি আসছে X' বিন্দু থেকে। X' থেকে OY রেখার ওপর লম্ব টানলে সেটি Y' বিন্দুতে ছেদ করেছে কাজেই $X'Y'$ হবে XY এর প্রতিবিম্ব। দেখাই যাচ্ছে $X'Y'$ সব সময় XY থেকে ছোট এবং XY উত্তল আয়না থেকে যত দূরে থাকবে $X'Y'$ হবে

তত ছোট! প্রতিফলনের নিয়ম ব্যবহার করে উত্তল কিংবা অবতল আয়নায় প্রতিবিম্ব আঁকার এই পদ্ধতিটি ভালো করে জেনে রাখা দরকার, এটি পদার্থবিজ্ঞানের খুব প্রয়োজনীয় একটা পদ্ধতি।

বোঝাই যাচ্ছে $X'Y'$ থেকে আসলে সত্যিকারের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে না, আমাদের মনে হচ্ছে বুঝি প্রতিবিম্বটি এখানে আছে! কাজেই এটা অবাস্তব প্রতিবিম্ব। সাধারণ আয়নার প্রতিবিম্বের সাথে তুলনা করে আমরা বলতে পারি

(a) এই প্রতিবিম্বটির অবস্থান হবে ফোকাস বিন্দু এবং মেরু বিন্দুর মাঝখানে। বস্তুটি যত দূরে থাকবে প্রতিবিম্বটি ফোকাস বিন্দুর তত কাছে তৈরি হবে।

(b) এই প্রতিবিম্বটি অবাস্তব

(c) এটি সোজা

(d) এটা ছোট, বস্তুটি আয়না থেকে যত দূরে যাবে প্রতিবিম্বটি তত ছোট হতে থাকবে।

8.6 অবতল গোলীয় আয়না (Concave Mirror)

একটা চকচকে চামচের ভেতরের অংশটা অবতল গোলীয় আয়নার উদাহরণ হতে পারে। তোমরা যারা চামুচের ভেতরের দিকে তাকিয়েছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ (ছবি 8.19) করেছ সেখানে তোমার প্রতিবিম্বটি ছোট এবং সবচেয়ে চমকপ্রদ হচ্ছে প্রতিবিম্বটি উল্টো! তোমরা চাইলে তোমার আঙুল চামচটার খুব কাছে ধরে দেখতে পার, দেখবে আঙুলটা সোজাই দেখাচ্ছে। এবারে আস্তে আস্তে দূরে সরাতে থাক, দেখবে তোমার আঙুলটা বড় দেখাতে শুরু করেছে (আমরা সমতল আয়না কিংবা উত্তল আয়নায় এর আগে প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পেরেছি কিন্তু কখনোই বস্তুর প্রকৃত আকার থেকে বড় প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারিনি– এই প্রথম বড় প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি।) আঙুলটা যদি আস্তে আস্তে সরাতে থাক এক সময় অবাক হয়ে দেখবে আঙুলের প্রতিবিম্বটা উল্টো হয়ে গেছে! এটাকে এখন যতই সরিয়ে নাও, এটা সব সময় উল্টোই থেকে যাবে। (সমতল আয়না কিংবা উত্তল আয়না দিয়ে আমরা এর আগে কখনোই উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারিনি– এই প্রথম আমরা উল্টো প্রতিবিম্ব দেখছি!)

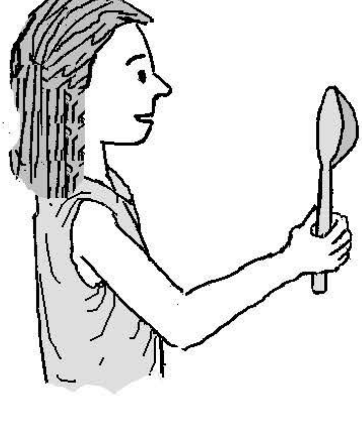

ছবি 8.19: একটি চামচ অবতল আয়নার মত কাজ করে

কাজেই দেখতে পাচ্ছ চামচের বাইরের অংশটা উত্তল আয়নার মতো এবং ভেতরের অংশটা অবতল আয়নার মতো কাজ করে! সত্যিকারের অবতল আয়না আসলে একটা

গোলকের অংশ। উত্তল আয়নার বেলায় বাইরের উত্তল অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হতো, অবতল আয়নার বেলায় আলোকে ভেতরের অবতল অংশ থেকে প্রতিফলিত করা হবে।

একটি অবতল আয়নায় সমান্তরাল আলো ফেলা হলে আলোর রশ্মিগুলো প্রতিফলনের পর এক বিন্দুতে মিলিত হবে (ছবি 8.20)। বুঝতেই পারছ এই বিন্দুটি অবতল আয়নার ফোকাস বিন্দু এবং মেরু বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বটা হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব। আলোর রশ্মির তো আর থেমে থাকার উপায় নেই এবং এক বিন্দুতে মিলিত হবার পরও সেটা সোজা সামনের দিকে এগোতে থাকবে এবং দেখা যাবে সেই বিন্দু থেকে আলোগুলো ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ ফোকাস বিন্দুতে পৌঁছানোর আগে আলো একত্র হতে থাকে (অভিসারী) ফোকাস বিন্দুতে পৌঁছানোর পর আলো ছড়িয়ে যেতে থাকে (অপসারী)।

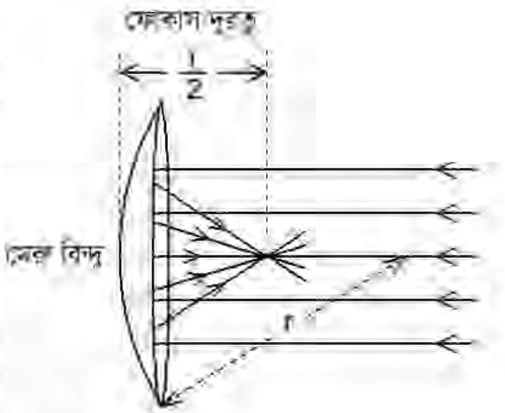

ছবি 8.20: অবতল আয়নার ফোকাস দূরত্ব গোলকের ব্যাসার্ধের অর্ধেক।

উদাহরণ 8.9: সমতল আয়নাকে আমরা যদি গোলীয় অবতল আয়না হিসেবে কল্পনা করি তাহলে তার ফোকাস দূরত্ব কত?

উত্তর: অসীম।

উত্তল আয়নার বেলাতেও আমরা একই উত্তর পেয়েছিলাম– যার অর্থ ফোকাস দূরত্ব বাড়তে বাড়তে অসীম হয়ে গেলে উত্তল এবং অবতল আয়না দুটিই সমতল আয়না হয়ে যায়।

উত্তল আয়নার মতো অবতল আয়নাতেও ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে ব্যাসার্ধের অর্ধেক। এটি হুবহু প্রমাণ করা যায় না, কাছাকাছি প্রমাণটি এবারে আমরা তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

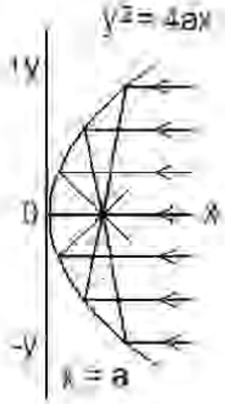

ছবি 8.21: প্রতিফলিত আলো একটি ফোকাস বিন্দুতে আপতিত করার জন্য বক্র আয়নার সঠিক আকৃতি

উদাহরণ 8.10: আমরা অবতল আয়না পড়ার সময় ধরে নিয়েছিলাম সমান্তরাল আলোক রশ্মি কেন্দ্রের কাছাকাছি আপতিত হয় কারণ যদি তা না হয় তাহলে সেটি $\frac{r}{2}$ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হবে না। যদি আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে সমান্তরাল আপতিত রশ্মি সব সময়েই এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হবে তাহলে আয়নাটির আকার কেমন হতে হবে?

উত্তর: জ্যামিতি থেকে আমরা দেখাতে পারি অবতল আয়নাটি গোলক না হয়ে ছবিতে দেখানো আকৃতির হলে আলোক রশ্মি এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হবে। একটা গ্রাফ পেপারে সমান্তরাল রশ্মি এঁকে সেটাকে এক বিন্দুতে মিলিত করানোর জন্য সেই বিন্দু থেকে রশ্মি এঁকে তোমরা উল্টোভাবে অগ্রসর হয়ে এই বিশেষ বক্র আয়নাটি আঁকতে পারবে। চেষ্টা করে দেখ।

8.6.1 অবতল আয়নায় প্রতিবিম্ব

এবারে এসেছি আমরা সবচেয়ে মজার অংশটুকুতে! সমতল আয়না এবং উত্তল আয়নায় শুধু এক ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হতো। অবতল আয়নায় দুই ধরনের প্রতিবিম্ব হতে পারে। একটা বস্তু ফোকাস দূরত্ব থেকে কম দূরত্বে রাখলে এক ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, ফোকাস দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে রাখলে অন্য রকম প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

ফোকাস দূরত্ব থেকে কম দূরত্বে:

8.22 ছবিতে একটা অবতল আয়না দেখানো হয়েছে, অবতল আয়নাটি যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্র হচ্ছে O, অবতল আয়নার ফোকাস বিন্দু F এবং ধরা যাক XY বস্তুটির প্রতিবিম্বটি আমরা বের করতে চাই। Y বিন্দুটি থেকে আলো অবতল আয়নার P বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে আবার Y হয়ে O বিন্দুর দিকে ফিরে যাবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এটি OP রেখায় কিংবা তার বর্ধিত অংশের কোনো একটা বিন্দুতে থাকবে, ঠিক কোথায় সেই বিন্দুটি হবে সেটি বের করতে হলে Y বিন্দু থেকে অন্যদিকে আরো একটি রশ্মিকে অবতল আয়নার দিকে আঁকতে হবে– আমরা আর সেটি করছি না, আগের মতো X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব বের করতে পারলেই

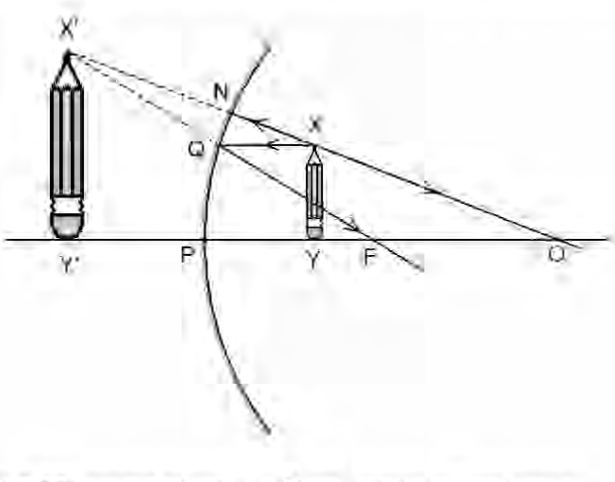

ছবি **8.22**: অবতল আয়নায় একটি বস্তু ফোকাস দূরত্বের ভেতরে রাখা হলে প্রতিবিম্বটি বড় দেখায়।

সেখান থেকে Y বিন্দুটির প্রতিবিম্বের সঠিক জায়গাটি বের করা যাবে। X বিন্দুর প্রতিবিম্ব বের করতে হলে এই বিন্দু থেকে দুটি রেখা আঁকতে হবে, বোঝাই যাচ্ছে প্রথম রেখাটি হবে OX রেখার বর্ধিত অংশ, এটো অবতল আয়নাকে লম্বভাবে স্পর্শ করে ঠিক সেই পথেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাবে। ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে X বিন্দু থেকে আরেকটা রশ্মি হতে পারে অক্ষের সাথে সমান্তরাল একটা রশ্মি–

কারণ আমরা এর মাঝে জেনে গেছি সমান্তরাল রশ্মি প্রতিফলনের পর ফোকাস বিন্দু দিয়ে যায়। কাজেই এটা Q বিন্দুতে আপতিত হয়ে প্রতিফলিত হয়ে F বিন্দু দিয়ে চলে যাবে।

X বিন্দু থেকে বের হওয়া দুটি রশ্মি প্রতিফলনের পর NO এবং QF দিকে যাবে এবং দেখাই যাচ্ছে এই রশ্মি দুটো মিলিত হবার কোনো সুযোগ নেই! কাজেই ডান পাশে কোনো প্রতিবিম্ব তৈরি হতে পারবে না। কিন্তু যদি ডান পাশ থেকে বাম পাশে তাকানো যায় তাহলে মনে হবে ON রেখা এবং FQ রেখা দুটি বুঝি X' বিন্দুতে মিলিত হয়েছে– কাজেই X' হবে X এর প্রতিবিম্ব। এই বিন্দু থেকে OP অক্ষের ওপর একটি লম্ব আঁকলেই আমরা XY এর পুরো প্রতিবিম্ব $X'Y'$ পেয়ে যাব। $X'Y'$ থেকে সত্যিকার ভাবে কোনো আলো যাচ্ছে না, শুধু আমাদের মনে হচ্ছে এখানে বুঝি প্রতিবিম্বটি তৈরি হয়েছে। কাজেই এই প্রতিবিম্বটি অবাস্তব প্রতিবিম্ব। ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতিবিম্বটি মূল বস্তু থেকে বড়। শুধু তা-ই নয় আমরা বস্তুটিকে যতই ফোকাস বিন্দুর কাছে আনব প্রতিবিম্বটি ততই বড় হবে। (যদি এটাকে ঠিক ফোকাস বিন্দুতে বসানো হয় তাহলে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি আসলে সমান্তরাল হয়ে যাবে– অর্থাৎ প্রতিবিম্ব তৈরি করার জন্য আলোক রশ্মি আর মিলিত হতে পারবে না।) অবতল আয়নায় ফোকাস দূরত্বের ভেতরে কোনো কিছু রাখা হলে তার প্রতিবিম্বটি কেমন হবে সেটি দেখে নেয়া যাক :

(a) প্রতিবিম্বটির অবস্থান কোথায় হবে সেটি নির্ভর করবে আসল বস্তুটির অবস্থানের ওপর। বস্তুটি যতই ফোকাসের কাছে রাখা হবে প্রতিবিম্বের অবস্থানটি হবে তত দূরে।

(b) এটি অবাস্তব

(c) সোজা

(d) প্রতিবিম্বটির দৈর্ঘ্যও নির্ভর করবে তার অবস্থানের ওপর, যত ফোকাস বিন্দুর কাছে যাবে তার দৈর্ঘ্যও তত বেড়ে যাবে।

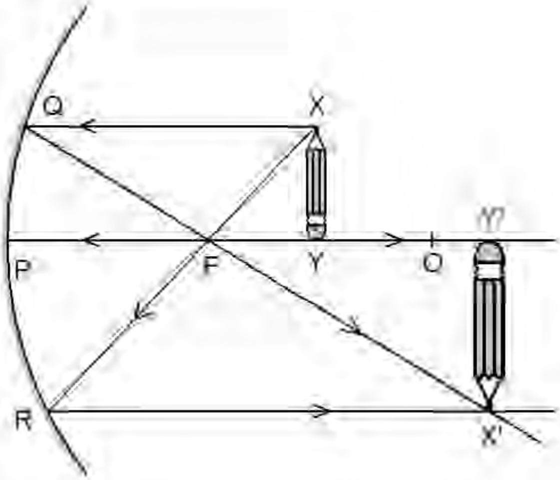

ছবি 8.23: অবতল আয়নায় একটি বস্তু ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখলে প্রতিবিম্বটি হয় উল্টো

ফোকাস দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে:

আমরা এখন পর্যন্ত যত প্রতিবিম্ব দেখেছি তার মাঝে এই প্রতিবিম্বটি সবচেয়ে চমকপ্রদ কারণ এই প্রথমবার আমরা একটি বাস্তব প্রতিবিম্ব দেখব– অর্থাৎ যেখানে প্রতিবিম্বটি তৈরি হবে সেখানে সত্যি সত্যি আলো কেন্দ্রীভূত হবে।

সত্যিকারের বস্তুটি হচ্ছে XY এবং Y বিন্দুর প্রতিবিম্বটি অন্যবারের মতো নিশ্চয়ই YP রেখার উপরে থাকবে। X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব বের করার জন্য আমাদের দুটি রশ্মি আঁকতে হবে একটি হবে অক্ষের সাথে সমান্তরাল XQ এবং প্রতিফলিত হয়ে এটি নিশ্চয়ই ফোকাস বিন্দু F এর ভিতর দিয়ে QF হিসেবে যাবে। দ্বিতীয় রশ্মিটি আমরা F বিন্দুর ভিতর দিয়ে আঁকতে পারি এটি অবতল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে RS হিসেবে সমান্তরাল হয়ে যাবে, কারণ সমান্তরাল রেখার আলো অবতল আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে যে রকম ফোকাস বিন্দুর ভিতর দিয়ে যায় ঠিক সে রকম তার উল্টোটাও সত্যি, আলো সব সময়েই তার গতিপথ উল্টো পথে পুরোপুরি অনুসরণ করে। QF এবং RS রেখা দুটি X' বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং X' বিন্দুটি হচ্ছে X বিন্দুর প্রতিবিম্ব। কাজেই X' বিন্দু থেকে PO রেখার ওপর লম্বটি Y' বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং $X'Y'$ হচ্ছে XY এর প্রতিবিম্ব। দেখতেই পাচ্ছ এই প্রতিবিম্বটি এখন পর্যন্ত দেখা অন্যান্য প্রতিবিম্ব থেকে ভিন্ন।

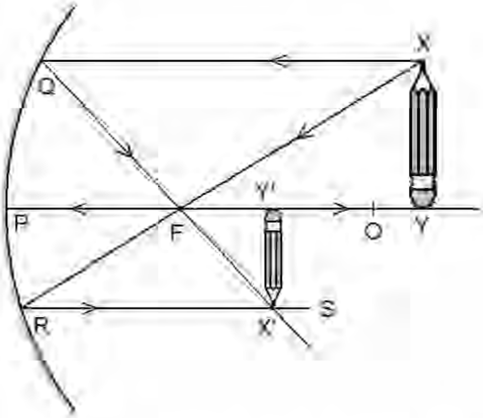

ছবি **8.24:** অবতল আয়নায় একটি বস্তু ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুন দূরত্বেও বাইরে রাখলে প্রতিবিম্বটি উল্টো এবং ছোট হয়।

8.24 ছবিতে হুবহু একই বিষয় দেখানো হয়েছে শুধুমাত্র XY বস্তুটি ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ থেকে বেশী দূরত্বে রাখা হয়েছে। এবারে বস্তুটির প্রতিবিম্বটি হয়েছে ছোট। বস্তুটি যদি ঠিক ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে রাখা হতো তাহলে তার প্রতিবিম্বটিও হতো এই একই বিন্দুতে, 8.25 ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রতিবিম্বটির আকার হতো ঠিক বস্তুটির সমান। ফোকাল দূরত্বের বাইরে রাখা এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার এবারে গুছিয়ে লেখা যেতে পারে। ফোকাল দূরত্বের বাইরে কোনো বস্তুকে রাখা হলে তার প্রতিবিম্ব হবে এ রকম :

(a) প্রতিবিম্বের অবস্থানটা নির্ভর করবে বস্তুটি কোথায় আছে তার ওপর। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি ফোকাস বিন্দু এবং অবতল আয়নার কেন্দ্রের মাঝখানে আছে প্রতিবিম্বের অবস্থানটা হবে কেন্দ্রের বইরে। বস্তুটি যদি অবতল আয়নার বক্রতার কেন্দ্র থেকে বাইরে থাকে তাহলে তার প্রতিবিম্ব হবে কেন্দ্রের ভিতরে। যদি বস্তুটি ঠিক কেন্দ্রের ওপর থাকে তাহলে প্রতিবিম্বের অবস্থানটাও হবে কেন্দ্রে।

(b) প্রতিবিম্বটি বাস্তব। তাই বস্তুটাকে দিয়ে তার প্রতিবিম্ব যে রকম বের করতে পারি ঠিক সে রকম প্রতিবিম্বটাকে বস্তু ধরা হলে বস্তুটাই হবে তার প্রতিবিম্ব!

(c) প্রতিবিম্বটি উল্টো!

(d) প্রতিবিম্বটির দৈর্ঘ্য নির্ভর করতে এটি কোথায় আছে তার ওপর। যদি এটা ফোকাস বিন্দু এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝখানে থাকে তাহলে প্রতিবিম্বটির প্রতিবিম্ব হবে বস্তুটি থেকে বড়। যত ফোকাস বিন্দুর কাছাকাছি তত বড়। যদি বস্তুটি বক্রতার কেন্দ্র থেকে বাইরে হয় তাহলে এর আকার হবে আসল বস্তুটি থেকে ছোট। যদি এটা ঠিক বক্রতার কেন্দ্রে থাকে তাহলে প্রতিবিম্বের আকার হবে ঠিক বস্তুটির আকারের সমান!

বাস্তব প্রতিবিম্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব কেমন করে লেন্স দিয়েও এ রকম বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায়। তোমরা দেখতেই পেয়েছ বাস্তব প্রতিবিম্ব সত্যিকারের আলোক রশ্মি থাকে তাই এটাকে যদি কোনো পর্দায় ফেলা যায় সেখানে প্রতিবিম্বটি দেখাও সম্ভব হয়। সাধারণ আয়নায় তুমি তোমার চেহারা দেখতে পারবে কিন্তু শুধু সাধারণ আয়না দিয়ে কখনো তোমার চেহারা কোনো পর্দায় ফেলতে পারবে না।

উদাহরণ **8.11:** 8.24 ছবিতে দেখানো হয়েছে XY বস্তুটির প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে $X'Y'$ এ। যদি $X'Y'$ টি বস্তুটি হতে তাহলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হতো?

উত্তর: এটি বাস্তব প্রতিবিম্ব। কাজেই $X'Y'$ যদি প্রকৃত বস্তু হয় তাহলে তার প্রতিবিম্ব হবে XY!

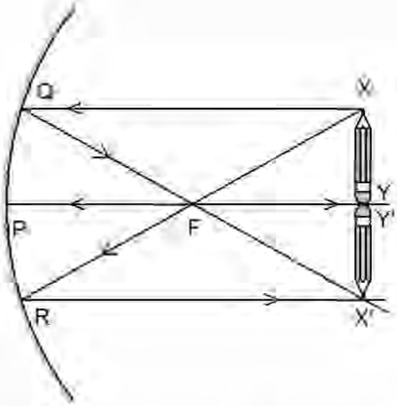

ছবি **8.25:** অবতল আয়নার ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে একটি বস্তু রাখলে প্রতিবিম্বটি ঠিক একই জায়গায় উল্টো অবস্থায় দেখা যায়।

আমরা এতক্ষণ গোলীয় অবতল আয়নার ভেতরকার বিজ্ঞানটুকু শিখেছি এবারে দেখা যাক কীভাবে সেটা আমরা ব্যবহার করি।

8.7 বিবর্ধন (Magnification)

আমরা যেহেতু দেখতে পেয়েছি যে একটা প্রতিবিম্ব কখনো প্রকৃত বস্তু থেকে ছোট হয় কখনো বড় হয় তাই বিবর্ধন বলে একটা শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিবিম্বটি মূল বস্তু থেকে কত বড় সেটাকে বিবর্ধন m বলা হয়। যদি একটা বস্তুর আকার হয় l এবং তার প্রতিবিম্বের আকার হয় l' তাহলে বিবর্ধন হচ্ছে:

$$m = \frac{l'}{l}$$

আমরা যখন টেলিস্কোপে কোনো বসতুকে দেখি খালি চোখে দেখলে সেটাকে যত বড় দেখানোর কথা– টেলিস্কোপে দেখলে সেটাকে সে তুলনায় যত বড় দেখাবে সেটাই হচ্ছে টেলিস্কোপের বিবর্ধন।

8.8 আয়নার ব্যবহার (Use of Mirror)

8.8.1 সাধারণ আয়না

দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ আয়নার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। যখনই একদিকে পাঠানো আলোকে অন্য দিকে নিতে হয় তখন আমরা সাধারণ আয়না ব্যবহার করি। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ সাধারণ আয়নায় ডান এবং বাম দিক বদলে যায় তাই যদি আমাদের ডান-বাম অবিকৃত রাখতে হয় তাহলে একটি আয়নার প্রতিবিম্ব অন্য একটি আয়নার দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত করে আবার ঠিক করে নিতে হয়।

সাধারণ আয়নার প্রতিবিম্ব ডান এবং বামের পরিবর্তন হয়। দুটি আয়না 90° তে রেখে সেটাকে আয়না হিসেবে ব্যবহার করলে ডান বামের পরিবর্তন হয় না। দুটি আয়না দিয়ে বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখো। (ছবি 8.26) এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে রাখা ভালো– যখন খুব ভালো প্রতিফলনের প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু সাধারণ আয়না ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের প্রতিফলন করা হয়। আমরা পরের অধ্যায়ে দেখব পুরোপুরি স্বচ্ছ মাধ্যম দিয়ে কীভাবে আলোকে প্রতিফলিত করা যায়!

ছবি 8.26: সাধারণ আয়নায় প্রতিবিম্ব ডান এবং বাম পাল্টে যায়, প্রতিবিম্বে বাম ডান অবিকৃত রাখতে হলে দুটি আয়নাকে সমকোনে রাখতে হবে

8.8.2 উত্তল আয়না

উত্তল আয়নায় যেহেতু সোজা এবং ছোট প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায় তাই বড় কোনো দৃশ্যকে ছোট জায়গায় দেখতে হলে উত্তল আয়না ব্যবহার করা হয়। গাড়ির দক্ষ ড্রাইভারেরা গাড়ি চালানোর সময় সব সময়ে পিছনে কী হচ্ছে দেখার চেষ্টা করেন– সে জন্য গাড়ীর ড্রাইভারের সামনে রিয়ার ভিউ মিরর থাকে– এই মিররগুলোতে উত্তল আয়না ব্যবহার করা হয় যেন ছোট একটা আয়না দিয়েই গাড়ির ড্রাইভারেরা পিছনের বড় একটা জায়গা দেখতে পান।

8.8.3 অবতল আয়না

অবতল আয়নার সবচেয়ে বড় ব্যবহার হচ্ছে টেলিস্কোপে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম টেলিস্কোপে অবতল আয়না ব্যবহার করা হয়। অনেকে সাধারণভাবে মনে করে দূরের কোনো ছোট জিনিসকে অনেক বড় করে দেখানোই বুঝি ভালো টেলিস্কোপের দায়িত্ব। আসলে সেটি সত্যি নয়– ভালো টেলিস্কিাপের দায়িত্ব অনেক কম আলোতেও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করা। সেজন্য অবতল আয়নার আকার যত বড় হবে সেটি তত বেশি আলো সংগ্রহ করে তত স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারবে। পৃথিবীর সব বড় বড় টেলিস্কোপে অবতল আয়না ব্যবহার করা হয়।

অবতল আয়নার আরেকটি ব্যবহার হচ্ছে আলোকে সমান্তরাল বীম তৈরি করা। জাহাজ লঞ্চের সার্চলাইটে অবতল আয়না ব্যবহার করা হয়। আলোর উৎসটুকু থাকে ফোকাস বিন্দুতে তাই সেটি অবতল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে সমান্তরাল বীম হিসেবে বের হয়ে যায়। তোমরা দৈনন্দিন জীবনে যে টর্চলাইট ব্যবহার কর সেখানেও বাল্বটি রাখা হয় একটি অবতল আয়নার ফোকাস বিন্দুতে!

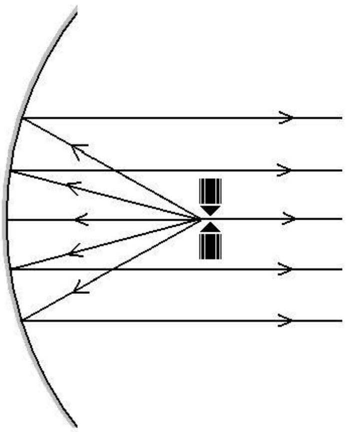

ছবি **8.27:** ফোকাস দূরত্বে তীব্র আলো তৈরী করলে সেটি অবতল আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে সমান্তরাল আলো হিসেবে বের হয়ে আসবে।

অবতল আয়নায় ফোকাস দূরত্বের ভেতরে কিছু থাকলে যেহেতু সোজা এবং বড় প্রতিবিম্ব তৈরি হয় তাই কোনো কিছু বড় করে দেখতে হলেও অবতল আয়না ব্যবহার করা হয়। ডাক্তার কিংবা ডেন্টিস্টরা তাই অনেক সময়েই কিছু দেখার জন্য অবতল আয়না ব্যবহার করেন।

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

1. চোখের সংবেদনশীলতার পরিমাপটি কেমন করে নির্ণয় করা হতে পারে?
2. মানুষের চোখ সবচেয়ে বেশি দেখতে পায় হলুদাভ সবুজ রং তাহলে বিপদসংকেত সব সময় লাল দিয়ে কেন করা হয়?
3. আয়নাতে ডান বাম উল্টে যায়, ওপর নিচ ওল্টায় না কেন?
4. জোছনার আলোতে রং দেখা যায় না কেন?
5. জ্যোতির্বিদদের বড় টেলিস্কোপে সব সময় অবতল আয়না ব্যবহার করা হয় কেন?

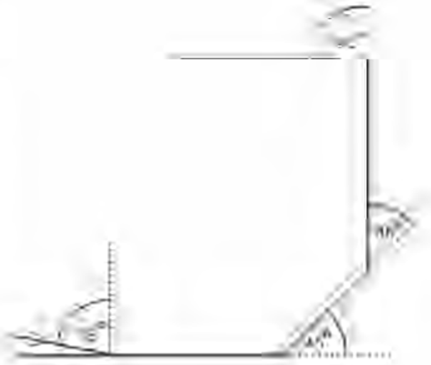

ছবি 8.28: ভিন্ন ভিন্ন কোণে রাখা আয়নার একটিতে আলো আপতিত হচ্ছে।

গাণিতিক সমস্যা:

1. 8.28 ছবির মতো করে আয়না রাখা আছে। ছবিতে দেখানো আলোক রশ্মিটি কোন দিকে যাবে দেখাও।
2. উত্তল আয়নায় XY বস্তুটির জন্য (ছবি 8.29 a) আলোক রশ্মিগুলো এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও।

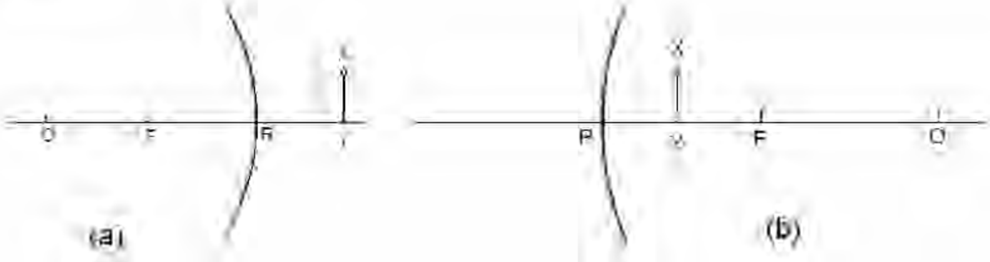

ছবি 8.29: (a) উত্তল আয়নায় ফোকাল দূরত্বের ভেতরে রাখা একটি বস্তু। (b) অবতল আয়নায় ফোকাল দূরত্বের ভেতরে রাখা একটি বস্তু।

3. অবতল আয়নায় XY বস্তুটির জন্য (ছবি 8.29 b) আলোক রশ্মিগুলো এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও।

4. অবতল আয়নায় XY বস্তুটির জন্য (ছবি 8.30 a) আলোক রশ্মিগুলো এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও।

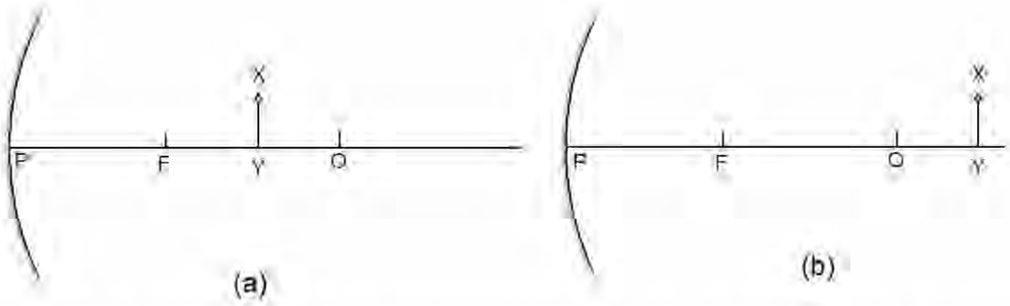

ছবি 8.30: (a) অবতল আয়নায় ফোকাল দূরত্বের বাইরে রাখা একটি বস্তু। (b) অবতল আয়নায় দ্বিগুণ ফোকাল দূরত্বের বাইরে রাখা একটি বস্তু।

5. অবতল আয়নায় XY বস্তুটির জন্য (ছবি 8.30 b) আলোক রশ্মিগুলো এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও।

নবম অধ্যায়

আলোর প্রতিসরণ

(Refraction of light)

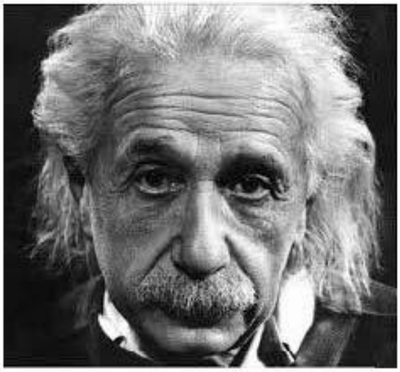

Albert Einstein (1879-1955)

আলবার্ট আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানিতে। জীবনের শুরুতে তিনি একটি পেটেন্ট অফিসের কেরানি হিসেবে কাজ শুরু করলেও শেষ বয়সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি এবং তাঁর $E = mc^2$ সমীকরণটি পৃথিবীর সবচেয়ে চমকপ্রদ সমীকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জার্মানিতে থাকা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়লে তিনি আমেরিকাতে চলে আসেন এবং বাকি জীবন সেখানে কাটিয়ে দেন। মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারকে না জানিয়ে একজন চিকিৎসক তাঁর মস্তিষ্কটি কেটে সরিয়ে ফেলে এবং পরবর্তীতে সেটি অনেক কৌতূহলের জন্ম দেয়!

9.1 আলোর প্রতিসরণ (Refraction of Light)

ইতোমধ্যে তোমরা জেনে গেছ যে আলো যখন একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করতে চায় তখন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার ঘটে। একটি হচ্ছে প্রতিফলন, যখন প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে যাবার সময় খানিকটা আলো আবার প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে এবং সে বিষয়টি আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। একটি হচ্ছে প্রতিসরণ যখন প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে আলো প্রবেশ করে। যে বিষয়টি আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। শেষটি হচ্ছে প্রতিশোষণ যখন খানিকটা আলো শোষিত হয়, আমরা এই প্রতিশোষণের ব্যাপারটি আপাতত আর আলোচনা করব না।

যদি শোষণের ব্যাপারটা আমরা ধর্তব্যের মাঝেই না আনি তাহলে এক মাধ্যম কিংবা অন্য মাধ্যমে আলোর প্রবাহের মূল বিষয়টা হতে পারে আলোর বেগ। সোজা কথায় বলতে পারি প্রত্যেকটা

মাধ্যমেই আলোর বেগ ভিন্ন এবং কোন মাধ্যমে আলোর বেগ কত সেটি নির্দিষ্ট করে দিলেই আমরা প্রতিসরণের সব কিছু বের করে ফেলতে পারব।

টেবিল 9.1: ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে আলোর প্রতিসারাংক

শূন্য মাধ্যম	1.00
বাতাস	1.00029
পানি	1.33
সাধারণ কাচ	1.52
হীরা	2.42

প্রত্যেকটি মাধ্যমকেই আসলে তার ভেতরে আলোর বেগ প্রকৃত আলোর বেগ থেকে কতগুণ কম সেটা দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং তাকে বলা হয় সেই মাধ্যমের প্রতিসারাংক n। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ c, এবং তাই কোনো মাধ্যমে আলোর বেগ v হলে মাধ্যমটির প্রতিসারাংক হচ্ছে:

$$n = \frac{c}{v}$$

n একটি সংখ্যা মাত্র এবং এর কোনো একক নেই এবং যেহেতু আলোর সর্বোচ্চ বেগ হচ্ছে c, কাজেই n এর মান সব সময়েই 1 থেকে বেশি। কাজেই যখন আমরা বলি পানির প্রতিসারাংক 1.33, তখন আসলে আমরা বোঝাই পানিতে আলোর বেগ:

$$v = 3 \times 10^8 ms^{-1}/1.33 = 2.26 \times 10^8 ms^{-1}$$

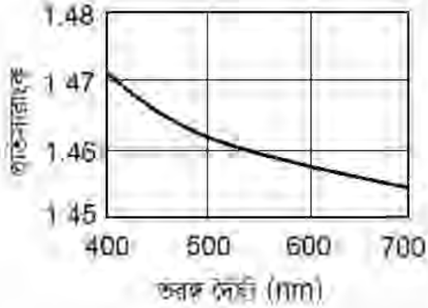

ছবি 9.1: কাচের প্রতিসারাংক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের কাচের তন্তুর প্রতিসারাংক 1.5 কাজেই ফাইবারের ভেতর দিয়ে আলো $2 \times 10^8 m/s$ বেগে যায়। 9.1 টেবিলে কিছু পদার্থের প্রতিসারাংক দেয়া হয়েছে। শূন্য মাধ্যমে স্বাভাবিক ভাবেই n এর মান হবে 1, বাতাসে এটি 1 এর এত কাছাকাছি যে আমরা এটাকে 1 ধরেই আমাদের হিসাব করব।

উদাহরণ 9.1: 9.1 টেবিলে দেখানো মাধ্যমগুলোতে আলোর বেগ কত বের কর।

উত্তর: কোন মাধ্যমে আলোর বেগ

$$v = \frac{c}{n}$$

শূন্য মাধ্যমে $v = 3 \times 10^8 ms^{-1}/1.00 = 3 \times 10^8 ms^{-1}$

বাতাসে $v = 3 \times 10^8 ms^{-1}/1.00029 = 3 \times 10^8 ms^{-1}$

পানিতে $v = 3 \times 10^8 ms^{-1}/1.33 = 2.26 \times 10^8 ms^{-1}$
সাধারণ কাচে $v = 3 \times 10^8 ms^{-1}/1.52 = 2 \times 10^8 ms^{-1}$
হীরাতে $v = 3 \times 10^8 ms^{-1}/2.42 = 1.24 \times 10^8 ms^{-1}$

এখানে উল্লেখ্য যে কোনো মাধ্যমের প্রতিসারাংক বলতে হলে সেটি কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোতে মাপা হয়েছে সেটি বলে দিতে হয়। কারণ আলোর প্রতিসারাংক আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। কোয়ার্টজ কাচের প্রতিসারাংক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে সাথে কীভাবে কমে যাচ্ছে সেটি 9.1 ছবিতে দেখানো হয়েছে!

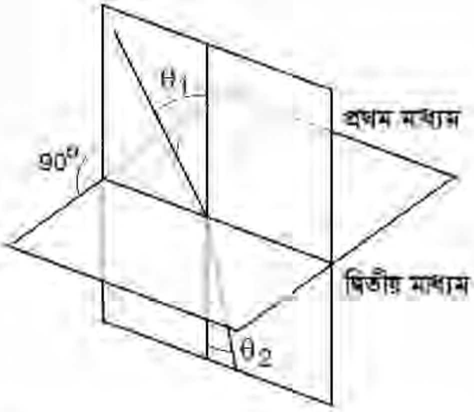

ছবি 9.2: প্রথম মাধ্যমে থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ।

9.1.1 প্রতিসরণের সূত্র

প্রতিসরণের সূত্র বোঝার জন্য যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন ছিল সেগুলো জানা হয়েছে। প্রতিফলনের বেলায় আমরা আলোক রশ্মি যে বিন্দুতে পড়েছে সেই বিন্দু থেকে একটি লম্ব কল্পনা করে নিয়েছিলাম, এখানেও সেই একই বিষয়টি করতে হবে। 9.2 ছবিতে লম্বের সাথে আপতিত রশ্মিটির কোণকে বলব আপাতন কোণ, দ্বিতীয় মাধ্যমে লম্বের সাথে প্রতিসারিত রশ্মির কোণকে বলব প্রতিসরণ কোণ।

প্রতিসরণের প্রথম সূত্র : আপাতন রশ্মি এবং লম্ব দিয়ে আমরা যে সমতলটি কল্পনা করে নিয়েছি প্রতিসরিত রশ্মি সেই একই সমতলে থাকবে।

প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র : প্রথম মাধ্যমের প্রতিসারাংক n_1, দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসারাংক n_2, আপাতন কোণ θ_1, এবং প্রতিসারিত কোণ θ_2 হলে

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

ছবি 9.3: হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবার সময় আলো লম্বের দিকে বেঁকে যায়। ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় আলো লম্ব থেকে দূরে সরে যায়।

এই অতি সহজ সূত্রটি মনে রাখলে তুমি প্রতিসরণ-সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারবে। যদি প্রথম মাধ্যমটি বাতাস হয় তাহলে $n_1 = 1$ ধরে লিখতে পারি (ছবি 9.3)

$$n_2 = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$$

যেহেতু n_2 এর মান 1 থেকে বেশি তাই $\theta_2 < \theta_1$ অর্থাৎ প্রতিসরণের পর আলোক রশ্মিটি লম্বের দিকে বেঁকে যাবে। n বেশি হলে আমরা অনেক সময় তাকে ঘন মাধ্যম বলি– মনে রাখতে হবে এখানে মাধ্যমের ভরের কারণে ঘন বলছি না। এটাকে ঘন বলতে বোঝানো হচ্ছে এর n বেশি। কাজেই প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি আলো হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাবার সময় প্রতিসারিত রশ্মি লম্বের দিকে বেঁকে যাবে। আবার ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় সেটি লম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। (ছবি 9.3)

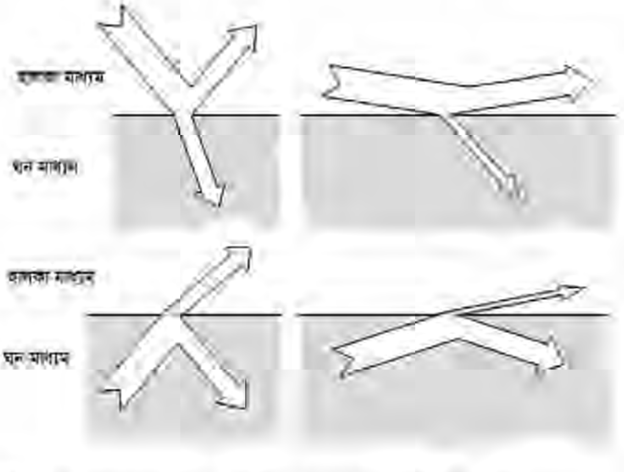

ছবি 9.4: আপতন কোন বেশি হলে আলো বেশি প্রতিফলিত হয়।

প্রতিসরণ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বলে এখানে শুধু মাত্র আপাতন রশ্মি এবং প্রতিসারিত রশ্মি আঁকা হয়েছে কিন্তু সবাইকে মনে রাখতে হবে যখনই একটি আলোক রশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সব সময়েই খানিকটা আলো প্রতিফলিত হয়। দুটো মাধ্যমের মাঝে কতখানি প্রতিফলিত হবে এবং কতখানি প্রতিসারিত হবে সেটা নির্ভর করে আপাতন কোণের ওপর। আপাতন কোণ বাড়তে থাকলে সব সময়েই প্রতিফলন বাড়তে থাকে। কাজেই উপরের দুটো ছবি ঠিক করে আঁকতে হলে 9.4 ছবির মতো করে আঁকতে হবে।

উদাহরণ 9.2: একটি কাপের মাঝে একটা মুদ্রা রেখে সেটাকে সামনে এমনভাবে রাখো যেন সেটি দেখা না যায়। মুদ্রাটি কীভাবে দেখা সম্ভব?

উত্তর: কাপে পানি ঢাললেই মুদ্রাটি দৃশ্যমান হয়ে যাবে। (ছবি 9.5)

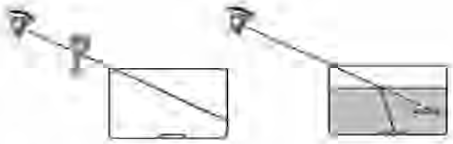

ছবি 9.5: পানি ও কাচের ভেতর আলো প্রতিসরণ।

উদাহরণ 9.3: 9.6 ছবিতে দেখানো পাশাপাশি রাখা কয়েকটি ভিন্ন মাধ্যমের বাইরের পৃষ্ঠে আলো θ_1 কোনে আপতিত হয়েছে। θ_5 এর মান কত?

উত্তর:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$
$$n_2 \sin\theta_2 = n_3 \sin\theta_3$$
$$n_3 \sin\theta_3 = n_4 \sin\theta_4$$
$$n_4 \sin\theta_4 = n_5 \sin\theta_5$$

কাজেই

$$n_1 \sin\theta_1 = n_5 \sin\theta_5$$

যেহেতু

$$n_1 = n_5$$
$$\theta_1 = \theta_5$$

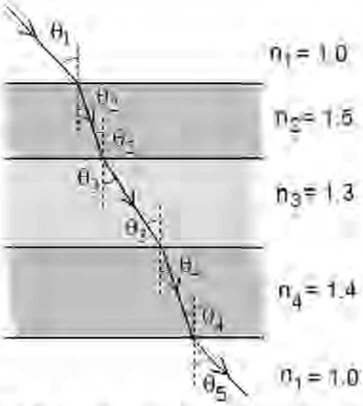

ছবি 9.6: ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ।

অর্থাৎ যে কোণে আলো ঢুকলে ঠিক সেই কোণে আলোটা বের হবে!

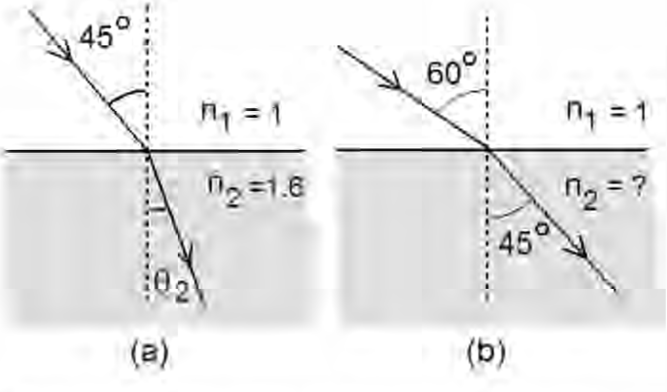

ছবি 9.7: (a) আলো 45° কোণে আপতিত হচ্ছে (b) আলো 60° কোণে আপতিত হয়ে 45° কোণে প্রতিসরিত হচ্ছে।

উদাহরণ 9.4: বাতাস থেকে আলোক রশ্মি $n = 1.6$ মাধ্যমে 45° তে আপতিত হয়েছে। (ছবি 9.7 a) এটি কত ডিগ্রি কোণে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করবে?

উত্তর: আমরা জানি

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

কাজেই

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1 = \frac{1}{1.6} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.44$$

$$\theta_2 = 26^\circ$$

উদাহরণ 9.5: 9.7 b ছবিতে একটি রশ্মি 60° তে বাতাস থেকে একটি মাধ্যমে প্রবেশ করে 45° কোণে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মাধ্যমটির প্রতিসারাংক কত?

উত্তর: আমারা জানি

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$1 \times \sin 60^\circ = n_2 \sin 45^\circ$$

$$n_2 = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 1.22$$

9.1.2 প্রিজম

কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের দুই পৃষ্ঠ সমান্তরাল না হলে তাকে প্রিজম বলে। স্বচ্ছ সমান্তরাল মাধ্যমে যে দিকে আলো প্রবেশ করে সেই দিকের সাথে সমান্তরাল হয়ে আলোক রশ্মি বের হয়ে যায়। দিক অপরিবর্তিত থাকলেও আলোর রশ্মি মূল রশ্মি থেকে খানিকটা সরে যায়। প্রিজমের বেলায় আলোক রশ্মির দিক পাল্টে যায়। (ছবি 9.8) প্রথম পৃষ্ঠ দিয়ে আলোক রশ্মিটি প্রবেশ করার সময় লম্বের দিকে বেঁকে যায়– যেহেতু দ্বিতীয় পৃষ্ঠটি সমান্তরাল নয় তাই সেই পৃষ্ঠ দিয়ে আলো বের হবার সময় লম্ব থেকে সরে গেলেও সেটি আর মূল দিকে ঘুরে যেতে পারে না।

ছবি 9.8: প্রিজমের আলোক রশ্মি দিক প্রিজমের ভূমির দিকে বেঁকে যায়।

প্রিজমে আলোর দিক পাল্টে যাবার ঘটনা ঘটলেও সেটি অন্য একটি কারণে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রিজমে একটি আলোক রশ্মি প্রবেশ করার পর সেটি মূল দিক থেকে কতটুকু বেঁকে যাবে সেটি প্রিজমের প্রতিসারাংকের ওপর নির্ভর করে। আমরা আগেই বলেছি প্রতিসারাংক আসলে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা রংয়ের ওপর নির্ভর করে। তাই ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের জন্য প্রতিসারাংক ভিন্ন, কাজেই একই আলোক রশ্মিতে ভিন্ন ভিন্ন রং থাকলে প্রিজমের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সেই রংয়ের আলোগুলো ভিন্ন ভিন্ন কোণে দিক পরিবর্তন করবে– কাজেই আমরা দেখব প্রিজম থেকে আলো বের হবার সময় তার রংগুলো আলাদা হয়ে গেছে, নিউটন যেটি প্রথম দেখিয়েছিলেন (ছবি 1.2)।

9.1.3 আপেক্ষিক প্রতিসারাংক

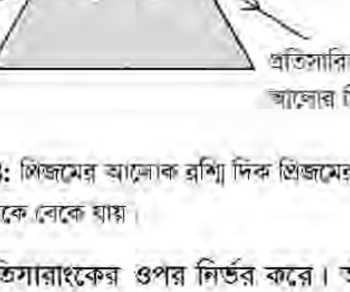

ছবি 9.9: পানি ও কাচের ভেতর আলো প্রতিসরণ

আমরা বলেছি কোনো মাধ্যমের প্রতিসারাংক সবসময় 1 থেকে বেশি হয়। কারণ প্রতিসারাংক যেহেতু শূন্য মাধ্যমের সাথে সেই মাধ্যমে আলোর বেগের তুলনা এটা 1 থেকে বেশি হবে। মাঝে মাঝে এক মাধ্যমের প্রতিসারাংকের তুলনায় অন্য মাধ্যমের প্রতিসারাংক প্রকাশ করা হয় তখন কোনটির সাথে

কোনটির তুলনা করা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে সেটা 1 থেকে কম হতে পারে।

যেমন পানিকে প্রথম মাধ্যম এবং কাঁচকে দ্বিতীয় মাধ্যম ধরলে (ছবি 9.9)

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$
$$n_1 = 1.33$$
$$n_2 = 1.52$$

পানির তুলনায় কাচের প্রতিসারাংক

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = 1.14$$

যেটি 1 থেকে বেশি।

আবার কাচের তুলনায় পানির প্রতিসারাংক

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} = 0.88$$

যেটি 1 থেকে কম।

অর্থাৎ যে মাধ্যমের প্রতিসারাংক বের করতে চাইছ সেটিকে যার তুলনায় বের করতে চাইছ সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে।

পানির তুলনায় হীরা: 1.82
হীরার তুলনায় পানি: 0.55
কাচের তুলনায় হীরা: 1.59
হীরার তুলনায় কাচ: 0.63

(তবে পদার্থবিজ্ঞানে সাধারণত দুটির তুলনা হিসেবে প্রতিসারাংক ব্যবহার না করে নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতিসারাংক হিসেবেই ব্যবহার করা হয়।)

9.2 পূর্ণ আভ্যন্তরীন প্রতিফলন (Total Internal Reflection)

প্রতিফলন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল যখন অত্যন্ত নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন প্রয়োজন হয় তখন আয়না ব্যবহার না করে পুরোপরি স্বচ্ছ মাধ্যম ব্যবহার করে এক ধরনের প্রতিফলন করানো হয় – এই প্রতিফলনের নাম পূর্ণ আভ্যন্তরীন প্রতিফলন। এটি অত্যন্ত সহজ এবং চমকপ্রদ একটি

প্রক্রিয়া, এখানে প্রতিসরণের নিয়ম ব্যবহার করে আলোক রশ্মিটি ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে পাঠাতে হয় মাত্র।

আমরা এর মাঝে জেনে গেছি (এবং অনেকবার ব্যবহার করেছি), প্রতিসরণের সূত্র হচ্ছে

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

অর্থাৎ যদি n_1 থেকে n_2 বড় হয় তাহলে θ_2 থেকে θ_1 বড় হবে। ধরা যাক তুমি একটি ঘন মাধ্যম (n_2) থেকে একটি আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যমের (n_1) দিকে পাঠাচ্ছ (ছবি 9.10), প্রতিসরণ এবং

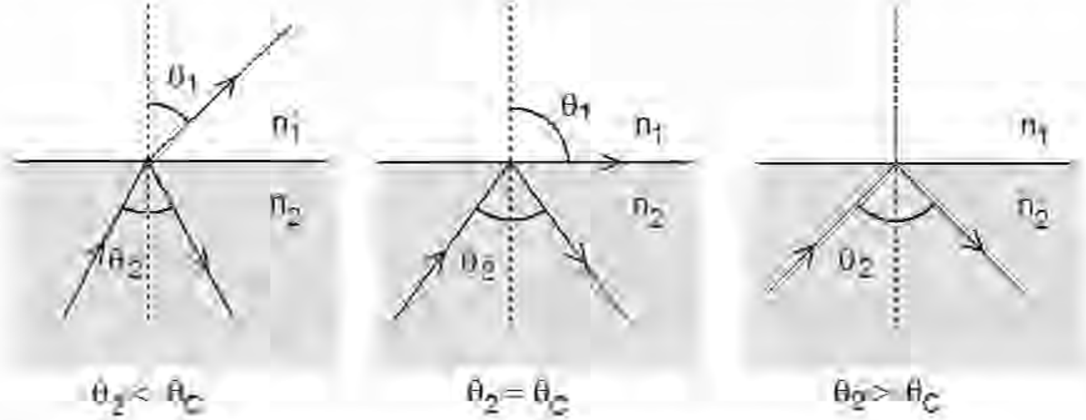

ছবি 9.10: ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাবার সময় আলোর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হতে পারে।

প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী খানিকটা আলো প্রতিফলিত হবে এবং খানিকটা প্রতিসারিত হবে। যেহেতু θ_2 থেকে θ_1 বড় হবে কাজেই $\theta_2 < 90^\circ$ থাকতেই $\theta_1 = 90^\circ$ হয়ে যাবে এবং এর পর থেকে আলোর প্রতিসারিত হবার আর কোনো সুযোগ থাকবে না! অর্থাৎ যখন $\theta_1 = 90^\circ$ হবে তখন থেকে পুরো আলোকেই প্রতিফলিত হতে হবে। θ_2 এর যে মানের জন্য $\theta_1 = 90^\circ$ হয় সেই কোণকে ক্রান্তি কোণ θ_c বলে।

অর্থাৎ

$$n_1 \sin 90^\circ = n_2 \sin\theta_c$$

$$\sin\theta_c = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\theta_c = sin^{-1}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

কাচের $n_2 = 1.52$ এবং বাতাসের $n_1 = 1.00$ মাঝে ক্রান্তি কোণ:

$$\theta_c = sin^{-1}\left(\frac{1.00}{1.52}\right) = sin^{-1}(0.66) = 41.8^{\circ}$$

অর্থাৎ যদি স্বচ্ছ কাচ থেকে বাতাসের মাঝে আলো পাঠানোর সময় আলোক রশ্মি 41.8° থেকে বেশি আপাতন কোণ করে তাহলে আলোক রশ্মিটি স্বচ্ছ কাচ থেকে বের না হয়ে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়ে যায়। তোমরা যদি একটি প্রিজম সংগ্রহ করতে পার তাহলে খুব সহজেই পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ব্যাপারটি নিজের চোখে দেখতে পাবে। 9.11 ছবিতে কাচ-বাতাস বিভেদ তলে আলোর আপাতন কোণ 45° যেটি কাচ-বাতাসের ক্রান্তি কোণ 41.8° থেকে বেশি। কাজেই এখানে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে।

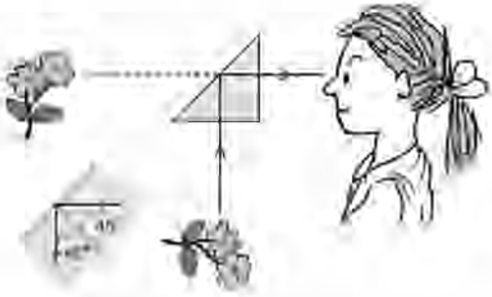

ছবি 9.11: সবচেয়ে পরিপূর্ণ প্রতিফলন হয় পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে।

উদাহরণ 9.6: পানিতে ডুবে যদি এই পরীক্ষাটা করতে চাও তাহলে কী হবে?

উত্তর: পানিতে কাচের ক্রান্তি কোণ হবে: $\theta_c = sin^{-1}\left(\frac{1.33}{1.52}\right) = sin^{-1}(0.88) = 61.6^{\circ}$
আপাতন কোণ যেহেতু 45°, ক্রান্তিকোণ থেকে কম তাই পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে না।

উদাহরণ 9.7: 1.45 প্রতিসরাংকের একটি মাধ্যমের ভেতর থেকে আলো 75°তে আপতিত হয়েছে। (ছবি 9.12) মাধ্যমটির অন্য পাশে বাতাস থাকলে আলোটি কত ডিগ্রি কোণে বের হয়ে আসবে।

উত্তর: আমরা জানি

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$1.45 \times \sin 75^{\circ} = 1 \times \sin\theta_2$$

$$\sin\theta_2 = 1.40$$

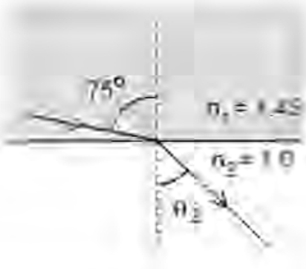

ছবি 9.12: আলো 75° কোণে আপতিত হচ্ছে।

কিন্তু আমরা জানি $\sin\theta_2$ এর মান কখনো 1 থেকে বেশি হতে পারে না। এখানে এ ব্যাপারটি ঘটেছে কারণ আলো

প্রতিসারিত না হয়ে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হয়েছে কাজেই যখনই ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ দেখতে হয় তখন প্রথমে ক্রান্তি কোণটি বের করে নেয়া ভালো, এই ক্রান্তি কোণ থেকে কম কোণে আলো আপতিত হলে শুধুমাত্র প্রতিসরণ হওয়া সম্ভব।

এই ক্ষেত্রে ক্রান্তি কোণ θ_c হলো

$$sin\theta_c = \frac{1}{1.45} = 0.69$$
$$\theta_c = 43.6^\circ$$

কাজেই 75°-তে আলো আপতিত হলে সেটি প্রতিসরিত না হয়ে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে।

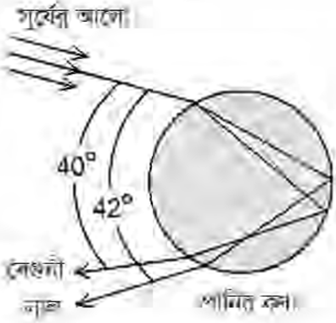

ছবি 9.13: সূর্যের আলো পানির কনার ভেতরে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ে ভাগ হয়ে যায় বলে আমরা রংধনু দেখতে পাই।

9.2.1 রংধনু

তোমরা যারা ভাবছ যে তোমরা সত্যি সত্যি কখনো পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দেখনি– তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া যায় যে যারা রংধনু দেখেছে তারাই পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দেখেছে! রংধনু তৈরি হয় পানির পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দিয়ে। শুধু তাই নয়, যারা প্রিজমের অভাবে সাদা আলোকে তার রংগুলোতে ভাগ করে দেখতে পারনি তারাও এই ব্যাপারটি রংধনুতে ঘটতে দেখেছ।

আমাদের সবার কাছে প্রিজম না থাকলেও সাদা আলোর রংগুলো আলাদা হওয়ার ঘটনা আমরা সবাই দেখেছি। বৃষ্টি হবার পরপর যদি রোদ উঠে তাহলে আমরা রংধনু দেখি। তার কারণ তখন বাতাসে পানির কণা থাকে এবং পানির কণায় সেই আলো পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হবার সময় ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের আলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায়। (ছবি 9.13) এই আলোর রশ্মিগুলো দিয়ে রংধনুর বিভিন্ন ভিন্ন রংয়ের ব্যান্ড (band) তৈরি হয়।

তোমরা যারা রংধনু দেখেছ তারা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করেছ এটি সব সময়েই সূর্যের বিপরীত আকাশে দেখা যায় এবং কারণটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

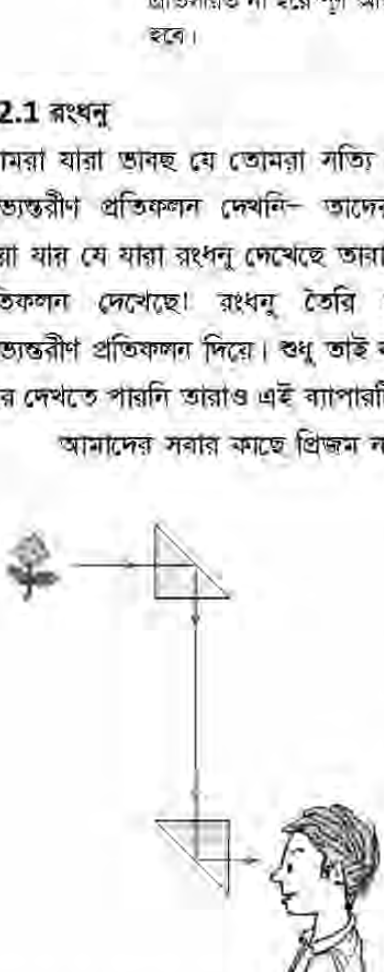

ছবি 9.14: আধুনিক পেরিস্কোপে আয়নার পরিবর্তে প্রিজম ব্যবহার হয়।

9.2.2 পেরিস্কোপ

আমরা সবাই জানি সাবমেরিনে পেরিস্কোপ থাকে এবং সেই পেরিস্কোপ দিয়ে পানির নিচে থেকে পানির উপরের

দৃশ্য দেখা সম্ভব। সাধারণ আয়না দিয়ে যে ধরনের পেরিস্কোপ তৈরি করা যায় তার থেকে অনেক বেশি কার্যকর পেরিস্কোপ তৈরি করা হয় প্রিজম এবং তার পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দিয়ে। (ছবি 9.14)

9.2.3 মরিচীকা

আমরা সবাই মরীচিকা শব্দটির সাথে পরিচিত, কোনো কিছু পাওয়ার আশা করে শেষ পর্যন্ত না পেলে সেটাকে মরীচিকা বলা হয়। মূল শব্দটি এসেছে মরুভূমিতে উত্তাপের কারণে বতাসের ঘনত্বের পরিবর্তন থেকে। যদিও আমরা জানি উত্তপ্ত বাতাস হালকা বলে উপরে চলে যায় কিন্তু মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর কারণে তার কাছাকাছি বাতাস উপরের বাতাস থেকে উত্তপ্ত থাকতে পারে। কাজেই মরুভূমির বাতাসকে নিচের 9.15 ছবির মতো করে কল্পনা করে নিতে পারি।

সহজভাবে বোঝানোর জন্য এখানে মাত্র কয়েকটি স্তরে দেখানো হয়েছে। উপরের স্তরে বাতাসের ঘনত্ব বেশি তাই প্রতিসারাংক বেশি। নিচের স্তরে বাতাস উত্তপ্ত তাই ঘনত্ব কম এবং প্রতিসারাংকও কম। গাছ থেকে আলো প্রতিটি স্তরে প্রতিসারিত হবার সময় প্রতিসরণ কোণ বেড়ে যাবে এবং একেবারে নিচের স্তরে এসে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে যেতে পারে। বেশি প্রতিসারাংক থেকে কম প্রতিসারাংকের মাধ্যমে যাবার সময় দূর থেকে দেখা হলে আপাতন কোণের মান বেশি হওয়ার কারণে ক্রান্তি কোণকে অতিক্রম করার সম্ভাবনা বেশি থাকে– তাই মরীচিকাকে দূর থেকে দেখা যায় কাছে এলে দেখা যায় না। যেহেতু কোনো মানুষ দূরের একটি গাছের দিকে তাকালে সরাসরি গাছটি দেখতে পাবে এবং পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের কারণে গাছের একটি প্রতিবিম্ব গাছের নিচেও দেখতে পাবে– মনে হবে নিচে পানি থাকার কারণে সেখানে গাছের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। কাছে গেলে দেখা যাবে কোনো পানি নেই!

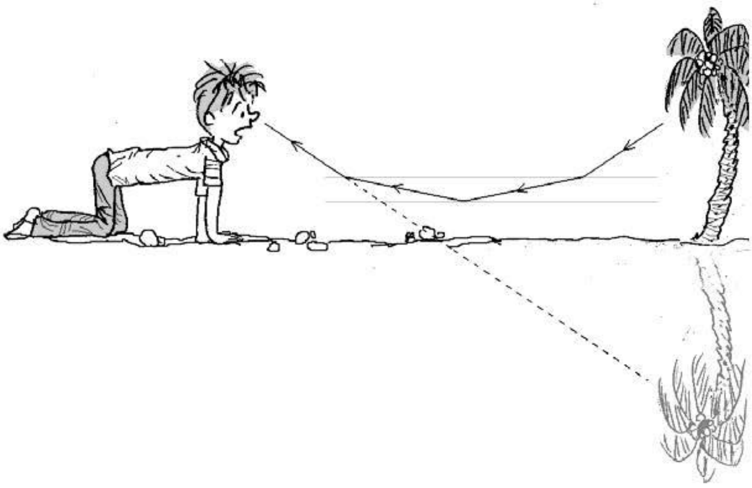

ছবি 9.15: মরুভুমিতে বাতাসের ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে মরীচিকা দেখা যায়।

গরমের দিনে উত্তপ্ত রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় একই কারণে দূরে কালচে ভেজা রাস্তা দেখা যায়– সেখানে পৌঁছানোর পর দেখা যায় রাস্তাটি খটখটে শুকনো– এটাও এক ধরনের মরীচিকা।

9.2.4 অপটিক্যাল ফাইবার

নূতন পৃথিবীর যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তারকে অত্যন্ত সরু কাচের তন্তু দিয়ে পাল্টে দেয়া হয়েছে। আগে যেখানে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল দিয়ে তথ্য পাঠানো হতো এখন সেখানে আলোর সিগন্যাল দিয়ে তথ্য পাঠানো হয়। মুক্ত অবস্থায় আলো সরল রেখায় যায় কিন্তু ফাইবারে আলো আটকা পড়ে যায় বলে সেটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে কোনো দিকে নেয়া সম্ভব।

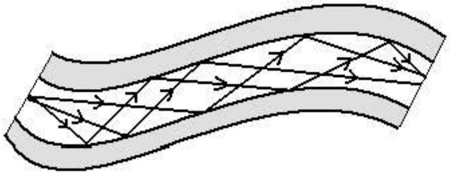

ছবি 9.16: অপটিক্যাল ফাইবারে পূর্ণ আভ্যন্তরীন প্রতিফলনের মাধ্যমে আলো যেতে পারে।

অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত সরু কাচের তন্তু এর ভেতরের অংশকে বলে কোর (core) বাইরের অংশকে বলে ক্ল্যাড (clad) দুইটিই একই কাচ দিয়ে তৈরি হলেও ভেতরের অংশের (কোর) প্রতিসারাংক বাইরের অংশ থেকে বেশি। এ কারণে আলোকে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে কোরের মাঝে আটকে রেখে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায়। (ছবি 9.16) অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে আলো শত শত কিলোমিটার নিয়ে যাওয়া যায় কারণ এই কাচের তন্তুকে আলোর শোষণ হয় খুবই কম। দৃশ্যমান আলো হলে শোষণ বেশি হতো বলে ফাইবারে লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অবলাল রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ 9.8: পৃথিবীর এক পৃষ্ঠে থেকে অন্য পৃষ্ঠে সিগন্যাল অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে পাঠানো যায় আবার জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের মাধ্যমেও পাঠানো যায়। কোন পদ্ধতিতে পাঠালে তথ্য তাড়াতাড়ি পাঠানো সম্ভব?

উত্তর: স্যাটেলাইটে যে সিগান্যাল পাঠানো হয় সেটি বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ তার বেগ $3 \times 10^8 m/s$ জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট পৃথিবী কেন্দ্র থেকে $35{,}786\, km$ উপরে থাকে সেখানে সিগন্যাল পাঠাতে এবং ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে

$$t = 2 \times \frac{35{,}786 \times 10^3}{3 \times 10^8}\ s = 0.238\ s$$

ফাইবারে করে যে সিগন্যাল পাঠানো হয় সেটি অবলাল আলো সেটিও বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ তার গতিবেগও $3 \times 10^8 m/s$, কিন্তু যখন ফাইবারের ভেতর দিয়ে যায় তখন তার গতিবেগ

$$v = \frac{3 \times 10^8 m/s}{1.5} = 2 \times 10^8 m/s$$

পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠের দূরত্ব πR, $(R = 6{,}371 \times 10^3 \text{km})$ ফাইবারে করে পাঠাতে সময় লাগবে

$$t = \frac{\pi \times 6{,}371 \times 10^3}{2 \times 10^8} s = 0.1\, s$$

কাজেই ফাইবারে দ্রুত পাঠানো সম্ভব।

ছবি 9.17: অপটিক্যাল ফাইবারের কোর থেকে ক্ল্যাডে আলোর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়।

উদাহরণ 9.9: অপটিক্যাল ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক 1.50 এবং ক্ল্যাডের প্রতিসরাঙ্ক 1.45 হলে, (ছবি 9.17) আলোকে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হওয়ার জন্য কত ডিগ্রিতে আপতিত হতে হবেঃ

উত্তর:

$$\theta_c = sin^{-1}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

এখানে

$$n_1 = 1.50$$
$$n_2 = 1.45$$

$$\theta_c = sin^{-1}\left(\frac{1.45}{1.50}\right) = sin^{-1}(0.97) = 75^\circ$$

কাজেই কাজেই আলোক রশ্মিকে 75° কিংবা তার চেয়ে বেশি কোণে আপতিত হতে হবে।

9.3 লেন্স ও তার প্রকারভেদ (Types of Lenses)

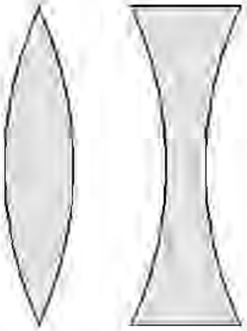

ছবি 9.18: একটি উত্তল ও একটি অবতল লেন্সের প্রস্থচ্ছেদ

আমরা উত্তল এবং অবতল আয়না পড়ার সময় দেখেছি এই আয়নাগুলোর ভেতর দিয়ে আলো যাবার সময় কখনো একবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত (অভিসারী রশ্মি) হয় আবার কখনো ছড়িয়ে পড়ে (অপসারী রশ্মি) এবং সে কারণে প্রতিবিম্বের তৈরি হয়। সেই প্রতিবিম্ব কখনো সত্যিকারের প্রতিবিম্ব হয় কখনো অবাস্তব হয়– কখনো ছোট হয় কখনো বড় হয়। আলো এই প্রতিবিম্ব দিয়ে নানা ধরনের অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব।

উত্তল এবং অবতল আয়না দিয়ে যে রকম নানা ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয় ঠিক সে রকম লেন্স দিয়েও নানা ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এবং নানাভাবে সেগুলো ব্যবহার হয়। আমরা সবাই লেন্স দেখেছি

(তার কারণ চশমার কাচগুলো আসলে এক ধরনের লেন্স)। তোমাদের মাঝে যারা চশমা ব্যবহার করো কিংবা যারা অন্যদের চশমা ব্যবহার করতে দেখেছ তারা নিশ্চিতভাবেই লক্ষ করেছ যে চশমার লেন্সকে

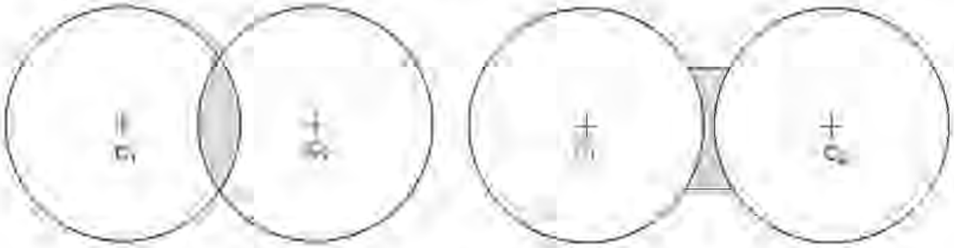

ছবি 9.19: উত্তল এবং অবতল লেন্সকে দুটি গোলকের অংশ হিসেবে কল্পনা করা যায়

দুইভাগে ভাগ করা যায়– এক ধরনের লেন্স দিয়ে ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায় (সাধারণত বয়স্কদের চশমার লেন্স এ রকম হয়।) আবার অন্য ধরনের লেন্স দিয়ে বড় জিনিসকে ছোট দেখা যায়– (সাধারণত কম বয়সীদের চশমার লেন্স এ রকম হয়)। যে লেন্স দিয়ে ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায় সেগুলোকে উত্তল (convex) কিংবা (কদাচিৎ) অভিসারী লেন্স বলে। যে লেন্স দিয়ে বড় জিনিসকে ছোট দেখা যায় সেই লেন্সগুলোকে অবতল লেন্স (Concave) কিংবা (কদাচিৎ)অপসারী লেন্স বলে। যে লেন্স দিয়ে ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায় অর্থাৎ উত্তল লেন্সগুলোর মাঝখানের অংশ প্রান্ত থেকে পুরু হয়। আর অবতল লেন্সগুলোর মাঝখানের অংশ প্রান্ত থেকে সরু হয় 9.18 ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে। লেন্সের প্রস্থচ্ছেদের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি উত্তল কিংবা অবতল লেন্সের দুটিই দুটি গোলীয় বৃত্ত দিয়ে সীমাবদ্ধ। এই দুটি গোলীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমানও হতে পারে ভিন্নও হতে পারে। এই বৃত্তগুলোর কেন্দ্রকে বক্রতার কেন্দ্র বলে। 9.19 ছবিতে C_1 এবং C_2 বক্রতার কেন্দ্র।

ছবি 9.20: পুরু কাচের ভেতর দিয়ে যাবার সময় প্রতিসরণের কারণে মূল রশ্মি থেকে আলোক রশ্মি বিচ্যুত হয়।

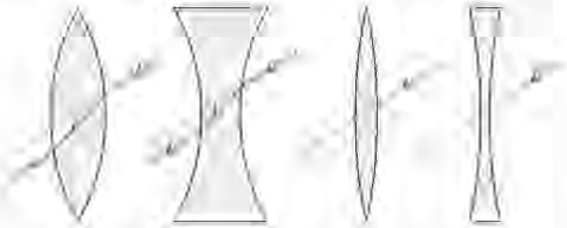

ছবি 9.21: পুরু লেন্সে কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া আলোক রশ্মি সমান্তরাল ভাবে বের হলেও একটু সরে যায়, পাতলা লেন্সে কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া আলোক রশ্মি তার দিক পরিবর্তন না করে সোজাসুজি বের হয়ে যায়

দৈনন্দিন জীবনে বা বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে নানা ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়– তবে আমরা আমাদের এই

বইয়ে আমাদের আলোচনা পাতলা লেন্সের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখব। পাতলা লেন্স এবং পুরু লেন্সের পার্থক্য নামকরণ থেকেই বোঝা গেলেও আমরা পার্থক্যটুকু আরেকটু পরিষ্কার করে নিই। লেন্সের প্রস্থচ্ছেদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যদিও লেন্সের পৃষ্ঠদেশের এক ধরনের বক্রতা আছে কিন্তু ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দুটি পৃষ্ঠ প্রায় সমান্তরাল। আমরা জানি সমান্তরাল পৃষ্ঠ দিয়ে আলো যাবার সময় প্রতিসরণের কারণে আলোক রশ্মিটি মূল দিক থেকে খানিকটা বিচ্যুৎ হয়ে যায় (ছবি 9.20)। সমান্তরাল পৃষ্ঠ দুটি যত পুরু হবে আলোক রশ্মিটি মূল রশ্মির দিক থেকে তত বেশি সরে যাবে। যদি সমান্তরাল পৃষ্ঠ দুটি খুব কাছাকাছি হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি মূল আলোক রশ্মি যে দিক দিয়ে এসেছে মোটামুটি সেদিক দিয়েই বের হয়েছে তার কোন বিচ্যুতি হয়নি। যেসব লেন্সের বেলায় তার কেন্দ্র দিয়ে আলোক রশ্মি যাবার সময় ধরে নেয়া যায় যে রশ্মিটির দিক অপরিবর্তিত আছে সেই সব লেন্সকে পাতলা লেন্স বলে (ছবি 9.21)।

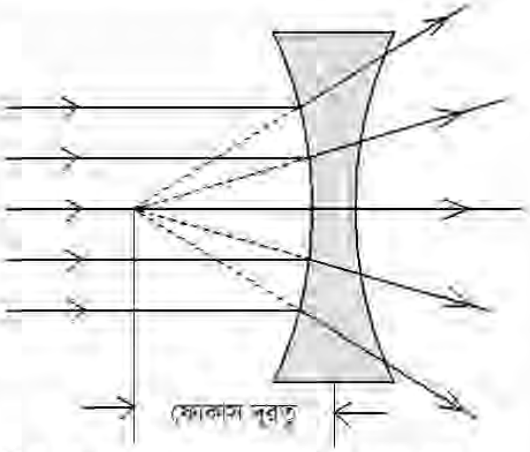

ছবি 9.22: অবতল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সমান্তরাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে।

9.3.1 অবতল লেন্স (concave lens)

উত্তল এবং অবতল আয়না আলোচনা করার সময় আমরা প্রথমে উত্তল আয়না নিয়ে আলোচনা করেছিলাম– লেন্সের বেলায় আমরা প্রথমে অবতল লেন্স নিয়ে আলোচনা করি– কারণ উত্তল আয়নায় যে ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হয় অবতল লেন্সে সেই একই ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

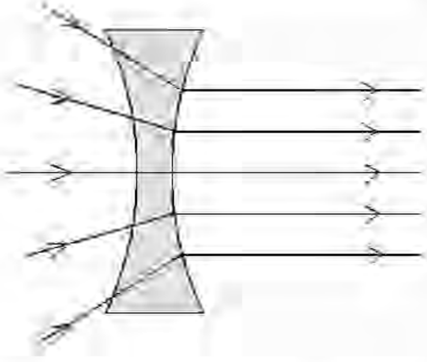

ছবি 9.23: অবতল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অভিসারী রশ্মি সমান্তরাল হয়ে যাবে।

উত্তল আয়নায় বেলায় আমরা দেখেছিলাম সেখানে সমান্তরাল আলো পড়লে সেটি প্রতিফলিত হবার সময় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবতল লেন্সের বেলাতেও ঠিক এই ধরনের ব্যাপার ঘটে এই লেন্সে সমান্তরাল আলো পড়লে প্রতিসারিত হবার সময় সেটি ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিসরিত আলোগুলো যদি আমরা পিছনের দিকে বাড়িয়ে নিই তাহলে মনে হবে সেগুলো বুঝি একটি বিন্দু থেকে সোজা ছড়িয়ে পড়ছে। সেই বিন্দুটিকে বলে ফোকাল বিন্দু এবং লেন্সের কেন্দ্র থেকে এই ফোকাল

পয়েন্টের দূরত্বটিকে বলে ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাল দূরত্ব । (ছবি 9.22)

উত্তল আয়নার বেলায় আমরা শুধু এক দিক থেকে আয়নার ওপর আলো ফেলতে পারতাম– লেন্সের বেলায় দুই দিক থেকেই আলো ফেলা যায়৷ প্রত্যেকটা লেন্সের একটা ফোকাল দূরত্ব থাকে– আলো যেদিক দিয়েই ফেলা হোক তার ফোকাল দূরত্ব সমান থাকে। সমান্তরাল আলো ফেলা হলে সেটি ছড়িয়ে পড়ে এবং মনে হয় সেটি বুঝি ফোকাল বিন্দু থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আলো যেহেতু সব সময় নিজের গতিপথের বিপরীতে যায় তাই অবতল লেন্সের ছড়ানো আলোর গতিপথ কোনোভাবে উল্টো করে দিতে পারলে সেটি সমান্তরাল হয়ে উল্টো দিকে বের হয়ে যাবে (ছবি 9.23)

আমরা এখন ইচ্ছে করলে অবতল লেন্সে একটা বস্তুর প্রতিবিম্ব কেমন হবে সেটা বের করতে পারি। ধরা যাক একটা বস্তু XY একটা অবতল লেন্সের কাছে রাখা হয়েছে। (ছবি 9.24) বিশ্লেষণটি সহজ করার জন্য ধরে নিয়েছি বস্তুটির Y বিন্দুটি লেন্সের মূল অক্ষ YR এর উপরে। বস্তুটির কোন বিন্দুর প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে সেটি বের করার জন্য সেই বিন্দু থেকে অন্তত দুটি রশ্মি আঁকা দরকার। তবে Y বিন্দু থেকে দুটি রশ্মি না এঁকেও আমরা প্রতিবিম্বটি বের করতে পারব। Y বিন্দু থেকে YR অক্ষ বরাবর একটি রশ্মি আঁকা সম্ভব, তাই আমরা জানি Y বিন্দুটির প্রতিবিম্ব এই অক্ষের ওপর তৈরি হবে। X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব থেকে অক্ষের ওপর লম্বটি এঁকে নিলেই আমরা Y বিন্দুর প্রতিবিম্ব পেয়ে যাবে।

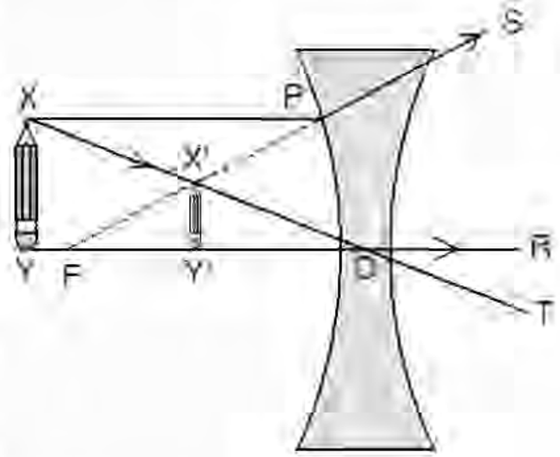

ছবি 9.24: অবতল লেন্সে একটি বস্তুকে ছোট দেখায়।

X বিন্দু থেকে দুটি রশ্মি কল্পনা করি, একটি অক্ষের সাথে সমান্তরাল XP সেটি লেন্স থেকে বের হওয়ার সময় ছড়িয়ে যাবে এবং যেহেতু মনে হবে ফোকাস থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাই ফোকাস F থেকে P পর্যন্ত একটি রেখা টেনে বর্ধিত করলেই সেই রশ্মিটি পেয়ে যাব। দ্বিতীয় রশ্মিটি X বিন্দু থেকে লেন্সের কেন্দ্রের দিকে এঁকে নিই। পাতলা লেন্সের নিয়ম অনুযায়ী এটি সরাসরি XT দিকে বের হয়ে যাবে। XT এবং FS রেখা দুটি যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেটিই হচ্ছে X এর প্রতিবিম্ব X', X' থেকে অক্ষের ওপর লম্ব আঁকলে আমরা XY এর প্রতিবিম্ব $X'Y'$ পেয়ে যাব।

উত্তল আয়নার বেলায় আমরা যা দেখেছিলাম অবতল লেন্সের প্রতিবিম্বের বেলাতেও সেটি সত্যি

(a) এটার অবস্থান হবে লেন্সের কেন্দ্র এবং ফোকাস বিন্দুর মাঝখানে

(b) এটা অবাস্তব

(c) এটা সোজা এবং এটা

(d) ছোট।

9.3.2 উত্তল লেন্স (convex lens)

উত্তল লেন্সের প্রতিবিম্বগুলো অনেক চমকপ্রদ। অবতল আয়নায় আমরা যে ধরনের প্রতিবিম্ব পেয়েছিলাম উত্তল লেন্সে ঠিক সেই একই ধরনের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।

অবতল আয়নায় আমরা দেখেছিলাম তার ওপর সমান্তরাল রশ্মি ফেলা হলে সেটি ফোকাস বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়। উত্তল লেন্সেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে, সমান্তরাল রশ্মি ফেলা হলে সেগুলো এই লেন্সের ফোকাল বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় (ছবি 9.25) এবং তারপর আবার ছড়িয়ে যায়।

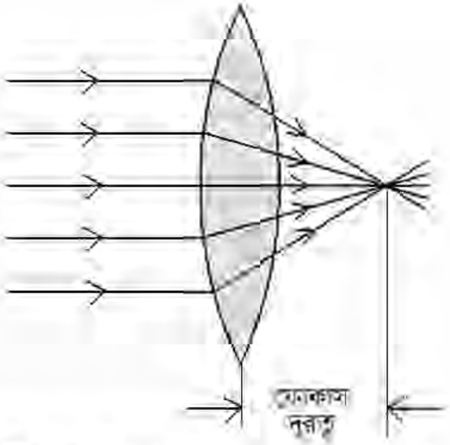

ছবি 9.25: উত্তল লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সমান্তরাল রশ্মি ফোকাল বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়।

কাজেই আগের যুক্তি ব্যবহার করে বলা যায় যদি কোনো বিন্দু থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় এবং একটা উত্তল লেন্সের ফোকাল বিন্দুতে সেই বিচ্ছুরিত আলো উৎসটাকে (ছবি 9.26) রাখা যায় তাহলে আলোটা লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সমান্তরাল রশ্মি হয়ে যাবে। (আলোর বেলায় এটি সব সময় সত্যি, এটি যদি A থেকে B তে যায় তাহলে রশ্মির দিক পরিবর্তন করে দিলে এটি সব সময় B থেকে A তে যাবে।) এখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে একটা বস্তু থাকলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে সেটি বের করে ফেলি।

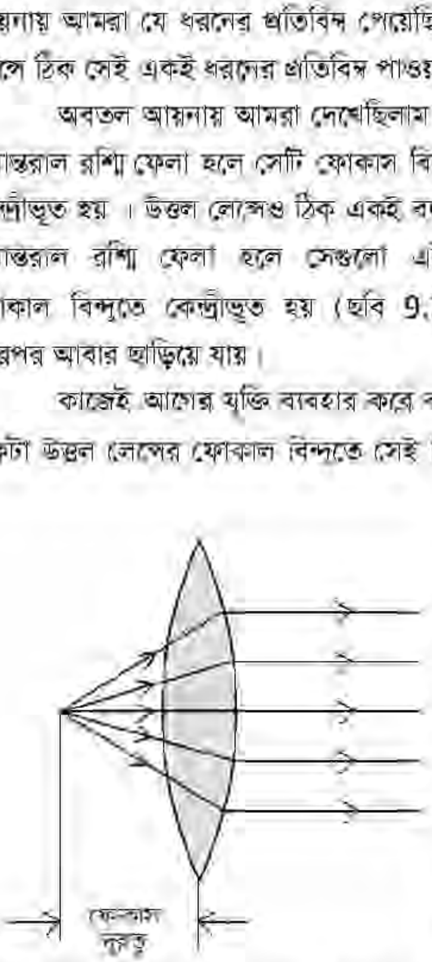

ছবি 9.26: ফোকাল দূরত্বে আলোক বিন্দু রাখা হলো উত্তল লেন্স সেটিকে সমান্তরাল রশ্মিতে পরিণত করে।

ফোকাস দূরত্ব থেকে কম দূরত্ব

প্রথমে ধরা যাক একটি বস্তু XY কে লেন্স এবং তার ফোকাল বিন্দুর F মাঝখানে রাখা হলো। (ছবি 9.27) আগে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঠিক সেই একই যুক্তিতে বলতে পারি Y বিন্দুর প্রতিবিম্বটি YOF অক্ষ

রেখার ওপর হবে। X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব X' থেকে এই অক্ষের ওপর লম্ব আঁকা হলেই আমরা Y এর প্রতিবিম্বের অবস্থান পেয়ে যাব।

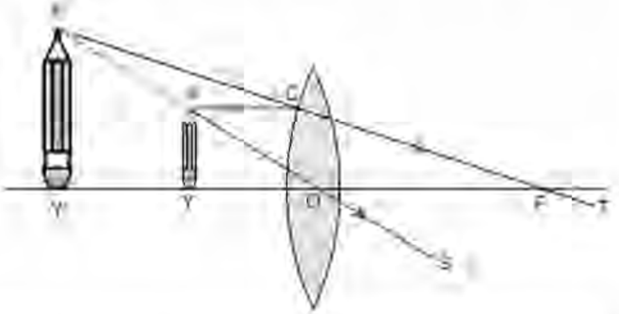

ছবি 9.27: ফোকাল দূরত্বের ভেতরে বস্তু রাখা হলে উত্তল লেন্সে বড় প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

এবারে X বিন্দু থেকে দুটি রশ্মি আঁকি, অক্ষের সাথে সমান্তরাল XC যেটি ফোকাল বিন্দু F এর ভিতর দিয়ে T এর দিকে যাবে। X বিন্দু থেকে রশ্মি লেন্সের কেন্দ্র বিন্দু দিয়ে আঁকা হলে সেটি সোজা সরল রেখায় XO হয়ে S এর দিকে যাবে। দেখতেই পাচ্ছ CFT এবং YOS রেখা দুটি সামনে গিয়ে মিলিত হতে পারবে না। যার অর্থ বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হবার কোনো সুযোগ নেই। রেখা দুটো পিছন দিকে বাড়িয়ে দিলে যে X' বিন্দুতে মিলিত হবে সেটাই X বিন্দুর প্রতিবিম্ব। এই বিন্দু থেকে YF রেখার উপর লম্ব আঁকা হলে Y' বিন্দুতে স্পর্শ করে সেটা Y বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

দেখাই যাচ্ছে XY বস্তুটি যতই লেন্সের কাছাকাছি আনা হবে প্রতিবিম্বটি ততই ছোট হতে থাকবে। বস্তুটি যতই ফোকাল বিন্দু F এর কাছাকাছি আনা হবে প্রতিবিম্বটি ততই বড় হতে থাকবে। বস্তুটি যখন ঠিক ফোকাল বিন্দু F এর ওপর হবে তখন প্রতিবিম্বটির আকার হবে অসীম। আমরা এখন বলতে পারি যদি একটা উত্তল লেন্সের কেন্দ্রবিন্দু এবং ফোকাল বিন্দুর মাঝখানে একটি বস্তু রাখা হয় তাহলে বস্তুটির প্রতিবিম্ব

(a) যে দিকে বস্তুটি রয়েছে সেই দিকেই তৈরি হবে

(b) প্রতিবিম্বটি হবে অবাস্তব

(c) সোজা এবং

(d) ছোট।

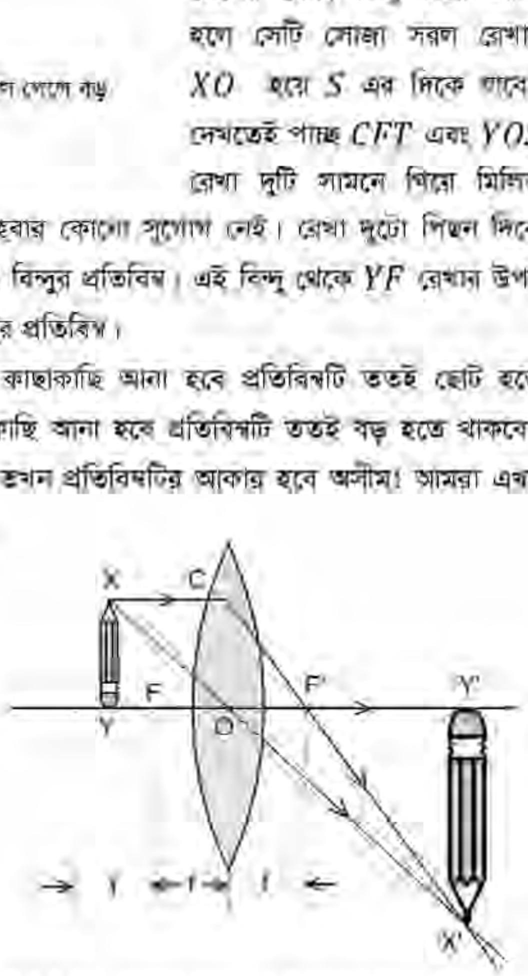

ছবি 9.28: ফোকাল দূরত্বের বাইরে কিন্তু দ্বিগুণ ফোকাল দূরত্বের ভেতরে বস্তু রাখা হলে তখন বাস্তব উল্টো বড় প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

ফোকাস দূরত্বের বাইরে

এবারে আমরা দেখি বস্তুটি ফোকাস দূরত্ব থেকে বাইরে রাখলে কী হয়। অবতল আয়নার মত

এখানেও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হতে পারে। (i) বস্তুটি ফোকাস দূরত্বের বাইরে কিন্তু দ্বিগুণ ফোকাল দূরত্বের ভিতরে (ii) বস্তুটি দ্বিগুণ ফোকাল দূরত্বের বাইরে এবং (iii) বস্তুটি ঠিক দ্বিগুণ ফোকাল দূরত্বে। একটি একটি করে দেখা যাক।

প্রথমে আমরা বস্তুটিকে ফোকাস দূরত্বের বাইরে কিন্তু ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের ভেতরে রাখা হবে। 9.28 ছবিতে XY বস্তুটির Y বিন্দুর প্রতিবিম্বটি YOB রেখার উপরে হবে তাই আগের মতো আমরা শুধু X বিন্দুটির প্রতিবিম্ব বের করি। X বিন্দু থেকে অক্ষের সাথে সমান্তরাল রশ্মিটি ফোকাল বিন্দু F এর ভেতর দিয়ে যাবে। লেন্সের কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে অন্য একটি রশ্মি XO সরল রেখায় যাবে– দুটি রেখা যেখানে ছেদ করবে সেই X বিন্দুটি হচ্ছে X এর প্রতিবিম্ব। X থেকে অক্ষ YO রেখার ওপর লম্ব আঁকা হলে Y' বিন্দুটি হবে Y এর প্রতিবিম্বের অবস্থান। কাজেই $X'Y'$ হচ্ছে XY এর প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ এই প্রতিবিম্বের জন্যে আমরা বলতে পারিঃ

(a) প্রতিবিম্বটির অবস্থান হবে ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে
(b) বাস্তব
(c) উল্টো
(d) এবং বস্তুর আকার থেকে বড়

আমরা দেখতেই পাচ্ছি XY বস্তুটি যদি ঠিক ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে (ছবি 9.29) রাখা হয় তাহলে প্রতিবিম্বটির আকার হবে XY বস্তুটির সমান এবং প্রতিবিম্বটির অবস্থান হবে লেন্সের কেন্দ্র থেকে ঠিক সমান দূরত্বে। বস্তুটি যতই ফোকাল বিন্দুর কাছাকাছি আনা হতে থাকবে প্রতিবিম্বটি ততই দূরে তৈরি হবে এবং তার আকার বড় হতে থাকবে। যেহেতু এই প্রতিবিম্বের ভেতর দিয়ে সত্যিকার আলোক রশ্মি যায় তাই এটি বাস্তব প্রতিবিম্ব এবং ছবিটিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রতিবিম্বটি উল্টো অর্থাৎ:

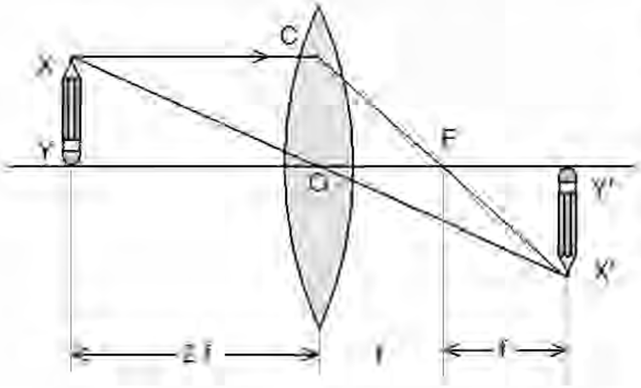

ছবি 9.29: ঠিক ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে কোনো বস্তু রাখা হলে তার প্রতিবিম্বটি হবে বস্তুটির সমান।

(a) প্রতিবিম্বটির অবস্থান হবে ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে

(b) বাস্তব

(c) উল্টো

(d) এবং বস্তুর সমান

আমরা (i) ফোকাল দূরত্বের বাইরে কিন্তু দ্বিগুণ ফোকাল দূরত্বের ভিতরে এবং (ii) ঠিক ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে কোনো বস্তু রাখলে তার কী ধরনের প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হয় সেটা বলেছি। এখন বাকি আছে বস্তুটি যদি ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে থাকে তাহলে তার কী ধরনের প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হয় সেটি বের করা।

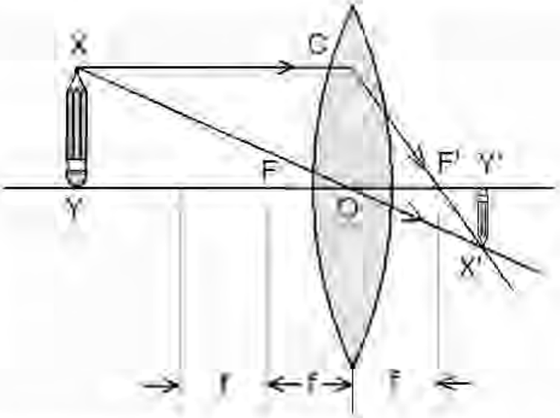

ছবি 9.30: দ্বিগুণ ফোকাল দূরত্বের বাইরে বস্তু রাখা হলে তার ছোট উল্টো বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরী হয়।

এই প্রতিবিম্বটি আঁকার পদ্ধতি ঠিক আগেরটির মতো শুধু (ছবি 9.30) মাত্র বস্তুটিকে বসাতে হবে ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে। আমরা আগেই বলেছি বস্তুটি যদি ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বে রাখা হয় তাহলে তার সম দূরত্বে সমান আকারের একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। যতই বস্তুটা দূরে সরিয়ে নেয়া হতে থাকে প্রতিবিম্বটি ততই ছোট হতে থাকে এবং ফোকাল বিন্দুর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বস্তুটি যদি অসীম দূরত্বে সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে তার প্রতিবিম্বটি তৈরি হবে ঠিক ফোকাস বিন্দুতে। কাজেই ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের বাইরে কোনো বস্তু রাখা হলে বস্তুটির

(a) প্রতিবিম্বের অবস্থান হয় ফোকাল দূরত্ব এবং ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্বের মাঝখানে

(b) বাস্তব

(c) উল্টো

(d) ছোট।

উদাহরণ 9.10. উত্তল লেন্সের ফোকাল দূরত্বের বাইরে কোনো বস্তু রাখা হলে তার বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। প্রতিবিম্বটির জায়গায় বস্তুটি রাখা হলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে?

উত্তর: আলোর রশ্মির দিক পরিবর্তন করলে একটি অন্যটিতে পরিবর্তিত হয়।

9.3.3 লেন্সের রং নির্ভর ফোকাল দৈর্ঘ্য

আমরা জানি প্রতিসারাংক আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে, কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক একটা লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য ভিন্ন হবে। লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি এবং তার ফোকাল দৈর্ঘ্য বেশি, আবার নীল রংয়ের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম এবং তার ফোকাল দৈর্ঘ্যও হবে কম। 9.31 ছবিতে একটা লেন্সের ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের আলো যে ভিন্ন ভিন্ন ফোকাল বিন্দুতে মিলিত হয় সেটা দেখানো হল।

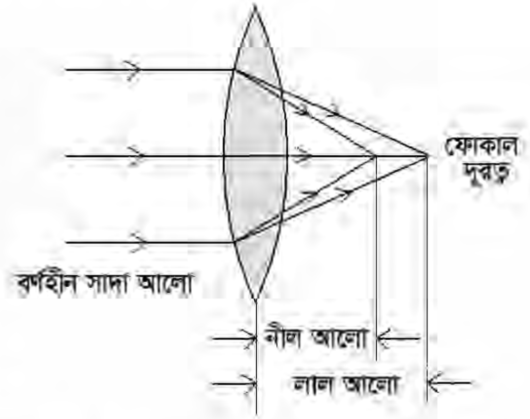

ছবি 9.31: বর্ণহীন সাদা আলোর ভিন্ন ভিন্ন রং ভিন্ন ভিন্ন ফোকাল দূরত্বে কেন্দ্রীভূত হয়।

এই কারণে সাধারণ লেন্স দিয়ে সূক্ষ্ম প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায় না– কারণ একেকটি রং একক জায়গায় প্রতিবিম্ব তৈরি করে। সূক্ষ্ম অপটিক্যাল যন্ত্র পাতিতে উত্তল ও অবতল লেন্স মিলিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই সমস্যার সমাধান করা হয়।

9.3.4 লেন্সের ক্ষমতা

লেন্সের সবচেয়ে প্রচলিত ব্যবহার আমরা দেখি চশমার মাঝে। তোমরা যদি বিভিন্ন মানুষের চশমার লেন্স পরীক্ষা করে দেখ তাহলে দেখবে কারো কারো চশমার লেন্স তৈরি হয় উত্তল লেন্স দিয়ে কারো কারো চশমার লেন্স তৈরি হয় অবতল লেন্স দিয়ে। আমরা লেন্সগুলোকে প্রায় সময়ই পাওয়ার দিয়ে ব্যাখ্যা করি– তোমরা নিশ্চয়ই বলেছ কিংবা বলতে শুনেছ, অমুকের চশমার পাওয়ার অনেক বেশি। পাওয়ার কথাটি দিয়ে আমরা কী বোঝানোর চেষ্টা করি?

পাওয়ারের ধারণাটি এসেছে লেন্স দিয়ে বড় এবং ছোট দেখার ব্যাপারটি থেকে। দুটি উত্তল লেন্সের পিছনে জিনিসটি কাছাকাছি একই দূরত্বে যদি কোনো কিছু রাখি এবং

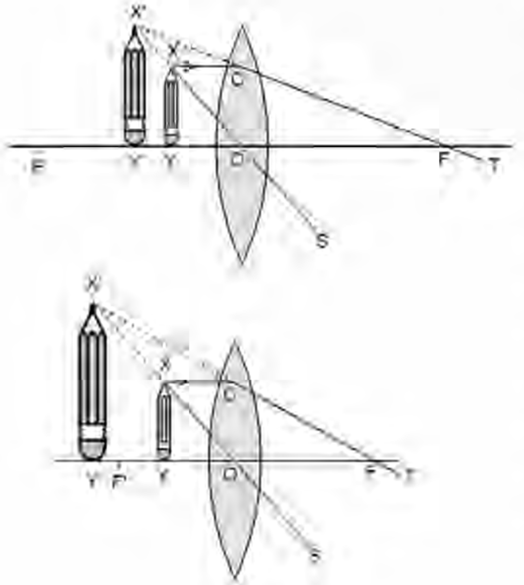

ছবি 9.32: যে লেন্সের ফোকাল দূরত্ব যতো কম সেই লেন্সে জিনিষটিকে তত বড় দেখায়।

একটি লেন্স অন্যটি থেকে বড় দেখায় তাহলে যে লেন্সটিতে বড় দেখায় আমরা বলি সেই লেন্সের পাওয়ার বেশি। তোমরা একটু চিন্তা করলেই দেখবে আসলে যে লেন্সের ফোকাল দূরত্ব যত কম সেই লেন্সে জিনিসটিকে তত বড় দেখাবে। (ছবি 9.32)

কাজেই এতে অবাক হবার কিছু নেই লেন্সের পাওয়ার P হচ্ছে ফোকাল দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক। যদি ফোকাল দূরত্ব f মিটারে দেয়া হয় তাহলে পাওয়ার P এর একক ডায়াপটার। অর্থাৎ তোমার পরিচিত কারো চশমার পাওয়ার যদি হয় 2.5 (সাধারণ কথাবার্তায় ডায়াপটার শব্দটা কেউ ব্যবহার করে না!) তাহলে তার চশমার লেন্সের ফোকাল দূরত্ব হবে

$$f = \frac{1}{P} = \frac{1}{2.5} m = 0.4m$$

পাওয়ারের ধারণাটি শুধু উত্তল লেন্সের বড় দেখানোর জন্য নয়– অবতল লেন্সে ছোট দেখানোর সময়ও একই পাওয়ার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যে অবতল লেন্সে বস্তুকে (সমান দূরত্বে) যত ছোট দেখা যাবে বুঝতে হবে তার পাওয়ার তত বেশি বা ফোকাল দূরত্ব তত ছোট। উত্তল লেন্সের বেলায় পাওয়ার ধনাত্মক বা পজিটিভ, অবতল লেন্সের বেলায় পাওয়ার ঋণাত্মক বা নেগেটিভ এটাই হচ্ছে পার্থক্য।

9.4 লেন্সের ব্যবহার (Uses of Lens)

লেন্সের ব্যবহারের কোনো শেষ নেই। যেখানেই আলোকে কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করা হয় সেখানেই লেন্সের প্রয়োজন হয়। এখানে আমাদের খুব পরিচিত কয়েকটি ব্যবহারের কথা বলা যাক। সেগুলো হচ্ছে চশমা, মাইক্রোস্কোপ এবং টেলিস্কোপ।

9.4.1 চশমা

লেন্সের সবচেয়ে প্রচলিত ব্যবহার হচ্ছে চশমা। আমাদের চোখে একটি উত্তল লেন্স রয়েছে এবং এই উত্তল লেন্সের কারণে চোখের অক্ষি গোলকের পিছনে দূরের কোনো বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। অক্ষি গোলকের পিছনে

ছবি 9.33: চোখের বিভিন্ন অংশ

থাকে রেটিনা সেখানে আলোকসংবেদী কোষ থাকে। (ছবি 9.33) এই কোষগুলো থেকে যে সিগন্যাল তৈরি হয় সেই সিগন্যাল অপটিক্যাল নার্ভে করে মস্তিষ্কে পাঠানো হয় এবং মস্তিষ্ক সেই সিগনাল থেকে আমাদের দেখার অনুভূতি দেয়। চোখের ভেতরে আলোর পরিমাণ বাড়ানো কিংবা কমানোর জন্য রয়েছে আইরিশ। তোমরা যারা আগে কখনো লক্ষ করনি তারা চোখের ওপর টর্চলাইটের আলো ফেলে দেখতে পারো আইরিশটা কী চমৎকারভাবে সংকুচিত হয়ে পিউপিলটাকে ছোট করে ফেলে।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কোনো কিছুকে স্পষ্ট করে দেখতে হলে চোখের রেটিনায় স্পষ্ট একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়া দরকার। তোমরা লেন্স সম্পর্কে যেটুকু জেনেছ সেখান থেকে ধারণা করতে পার যেহেতু একটা লেন্সের ফোকাল দূরত্ব নির্দিষ্ট করা থাকে তাই সম্ভবত একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বস্তুই চোখে স্পষ্ট দেখা যাবে। বস্তুটি যদি একটু দূরে হয় কিংবা কাছে হয় তাহলে প্রতিবিম্বটি রেটিনার উপরে না হয়ে আরো সামনে কিংবা আরো পিছনে তৈরি হবে।

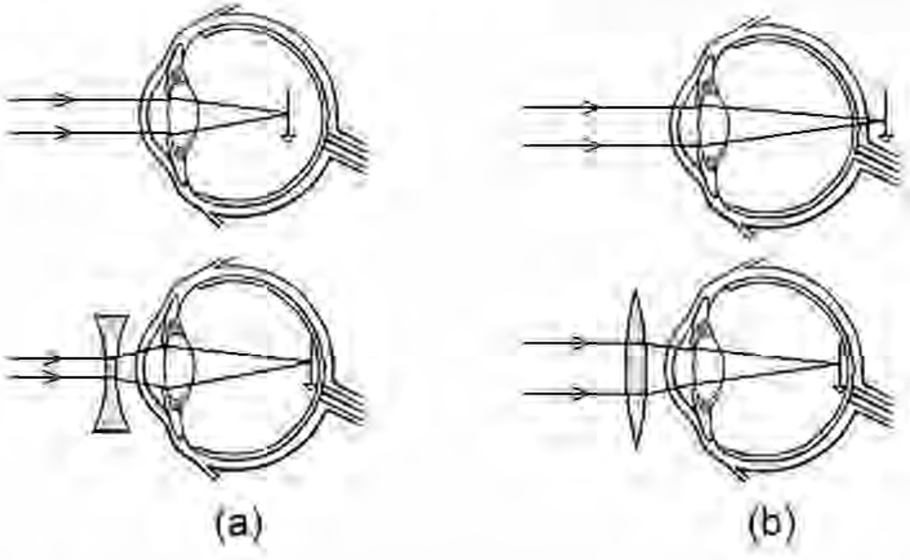

ছবি 9.34: চোখের লেন্স রেটিনায় সঠিক জায়গায় প্রতিবিম্ব তৈরি করতে না পারলে লেন্স ব্যবহার করে সেই সমস্যা মেটানো সম্ভব

সাধারণ লেন্সের বেলায় এটি সত্যি কিন্তু মানুষের চোখের লেন্স অনেক চমকপ্রদ, এর সাথে মাংশপেশী লাগানো থাকে এবং এই মাংশপেশী লেন্সটাকে টেনে কিংবা ঠেলে পুরু কিংবা সরু করে ফোকাল দৈর্ঘ্য বাড়াতে কিংবা কমাতে পারে। কাজেই রেটিনার ওপর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করার জন্য লেন্সটি সব সময়ই তার ফোকাল দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে যাচ্ছে। তোমরা নিজেরা খুব সহজে এটা পরীক্ষা করতে পার, চোখের সামনে একটি আঙুল রেখে একই সাথে এই আঙুলটি এবং দূরের কিছু

দেখার চেষ্টা কর। দেখবে যখন আঙ্গুলটি স্পষ্ট করে দেখবে তখন দূরের জিনিসটি ঝাপসা দেখাবে আবার দূরের জিনিসটি যখন স্পষ্ট দেখাবে তখন আঙ্গুলটি ঝাঁপসা দেখাবে।

কোনো মানুষ যখন তার চোখ দিয়ে বেশিরভাগ সময় কাছের জিনিস দেখে তখন তার মস্তিষ্ক কাজটি সহজ করার জন্য চোখের লেন্সকে স্থায়ীভাবে মোটা করে তার ফোকাল দূরত্ব কমিয়ে ফেলতে পারে। তখন কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা না হলেও দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হয়ে যায়। চোখের এই ত্রুটির নাম মায়োপিয়া (myopia) এ রকম সমস্যা হলে চোখের লেন্সের ফোকাল দূরত্ব বাড়ানোর জন্য তার সামনে আরেকটি অবতল লেন্স রাখতে হয়। (ছবি 9.34 a) অর্থাৎ তার নেগেটিভ পাওয়ারের চশমা পড়তে হয়।

মায়োপিয়ার বিপরীত চোখের ত্রুটির নাম হাইপারমেট্রোপিয়া (hypermetropia) তখন ঠিক উল্টো ব্যাপারটি ঘটে। চোখের লেন্সের ফোকাল দূরত্ব বেড়ে যায়, তখন পাকাপাকিভাবে শুধু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পারে কারণ রেটিনার ওপর লেন্সটি শুধু দূরের জিনিসের প্রতিবিম্ব সঠিকভাবে তৈরি করতে পারে। তখন কাছের জিনিসের প্রতিবিম্ব তৈরি হয় আরো দূরে। এ রকম অবস্থায় চোখের সামনে একটি উত্তল লেন্স রেখে সম্মিলিত ফোকাল দূরত্ব কমিয়ে সঠিকভাবে রেটিনাতে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করতে হয়। (ছবি 9.34 b)

চোখ অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয়, এটি নিয়ে আমরা অনেককিছু শিখতে পারি। আপাতত দৃষ্টি নিয়ে আরো সহজ কয়েকটা বিষয় জেনে নিই।

(a) চোখের রেটিনাতে আলোকসংবেদী রড এবং কোণ এই দুই ধরনের কোষ রয়েছে। রড কম আলোতে এবং কোণ বেশি আলোতে কাজ করে। কোণ কোষ রং সংবেদী তাই শুধু বেশি আলোতে আমরা রং দেখতে পাই। অল্প আলোতে রড কাজ করে এবং সেখানে রংয়ের অনুভূতি হয় না। সেজন্য জোছনায় সব কিছুকে কোমল দেখায়– কিন্তু জোছনার আলোতে আমরা রং দেখতে পাই না।

ছবি 9.35: চোখের ব্লাইন্ড স্পটের অস্তিত্ব এই ছবিটি দিয়ে বের করা যায়।

(b) আমাদের দুটি চোখ সামনে (পাখিদের মতো দুই পাশে নয়– তবে প্যাঁচার কথা আলাদা, প্যাঁচার চোখ মানুষের মতো সামনে) তাই আমরা একই সাথে দুই চোখে দুটি প্রতিবিম্ব দেখি। আমাদের মস্তিষ্ক এই দুটি প্রতিবিম্বকে উপস্থাপন করে আমাদেরকে দূরত্বের অনুভূতি দেয়। সেজন্য দুই চোখ খোলা রেখে সুঁইয়ের পিছনে সুতা ঢোকানো খুব সহজ কিন্তু এক চোখ বন্ধ রেখে এই কাজটি করা খব কঠিন!

(c) আমাদের রেটিনাতে একটা বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব পড়লেও আমরা বস্তুটিকে সোজা দেখার অনুভূতি পাই কারণ দেখার অনুভূতিটি কিন্তু চোখ থেকে আসে না, সেটি আসে মস্তিষ্ক থেকে। চোখের

রেটিনাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে সেটি থেকে আলোর সংকেত অপটিক নার্ভে করে মস্তিষ্কে যায় , মস্তিষ্ক সেটাকে বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে দেখার অনুভূতি দেয়।

উদাহরণ 9.11: রেটিনার যে অংশে অপটিক নার্ভ সংযুক্ত হয়েছে সেই অংশটি দেখার অনুভূতি তৈরি করে না, তাই এটাকে বলে ব্লাইন্ড স্পট। তুমি কি সেটা পরীক্ষা করতে চাও?

উত্তর: বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখ দিয়ে 9.35 ছবিতে বাম দিকের ক্রস চিহ্নটির দিকে তাকিয়ে মাথাটা ছবিটির দিকে নামিয়ে আনো, যখন ডান দিকের কালো বৃত্তটির প্রতিবিম্ব ঠিক অপটিক নার্ভের সংযোগ স্থল ব্লাইন্ড স্পটে পড়বে তখন হঠাৎ করে সেটি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

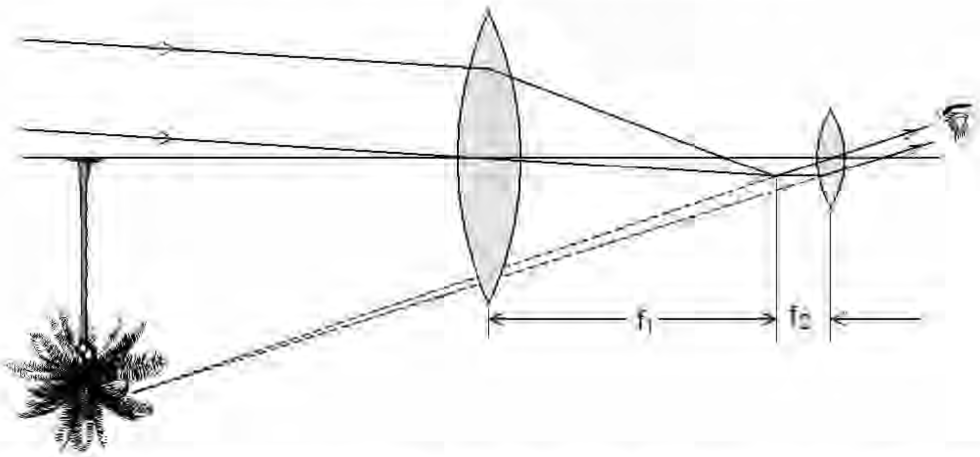

ছবি 9.36: দুটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করে তৈরি একটি টেলিস্কোপে উল্টো প্রতিবিম্ব দেখা যায়। টেলিস্কোপটির দৈর্ঘ্য হয় দুটি লেন্সের ফোকাল দূরত্বের সমান।

9.4.2 লেন্স ব্যবহার করে তৈরি করা যন্ত্র:

টেলিস্কোপ: 9.36 ছবিতে দুটি উত্তল লেন্স দিয়ে তৈরি একটি টেলিস্কোপ দেখানো হলো। টেলিস্কোপে অনেক দূরের কোনো বস্তু দেখা হয়, সেখান থেকে অত্যন্ত অল্প আলো পৌঁছাতে পারে বলে চেষ্টা করা হয় একটি বড় উত্তল অবজেক্টিভ লেন্স ব্যবহার করে যতটুকু সম্ভব বেশি আলো সংগ্রহ করা যায়। সংগৃহিত আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে যে বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি করে দ্বিতীয় একটি উত্তল লেন্স দিয়ে সেটাকে চোখে দেখার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। কাজেই টেলিস্কোপের দৈর্ঘ্য হয় অবজেক্টিভ এবং আই পিস এই দুটির ফোকাস দৈর্ঘ্যের দূরত্বের যোগফলের সমান। এই ধরণের টেলিস্কোপে প্রতিবিম্বটি দেখা যায় উল্টো। আই পিসে উত্তল লেন্স ব্যবহার না করে অবতল লেন্স ব্যবহার করেও টেলিস্কোপ তৈরি করা যায়া। এই ধরনের

টেলিস্কোপে প্রতিবিম্বটি দেখা যায় সোজা এবং টেলিস্কোপের দৈর্ঘ্য হয় অবজেক্টিভ এবং আইপিসের ফোকাস দৈর্ঘ্যের বিয়োগ ফলের সমান। (ছবি 9.37)

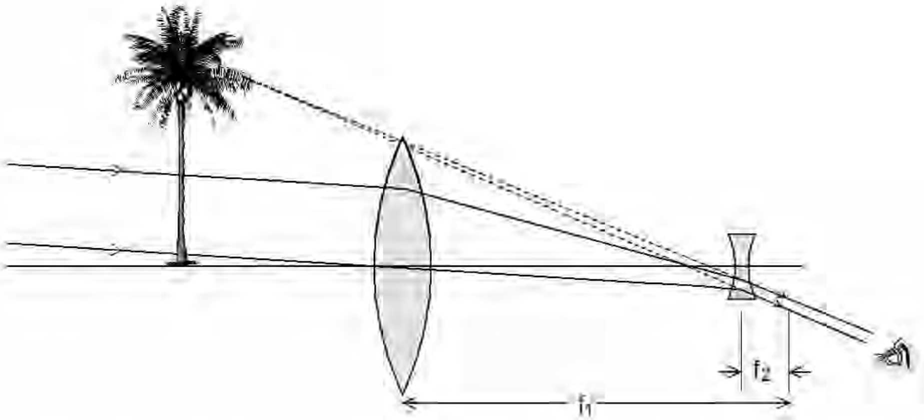

ছবি 9. 37: একটি উত্তল এবং একটি অবতল লেন্স ব্যবহার করে তৈরী একটি টেলিস্কোপে সোজা প্রতিবিম্ব দেখা যায়। টেলিস্কোপটির দৈর্ঘ্য হয় দুটি লেন্সের ফোকাল দূরত্বের পার্থক্যের সমান।

মাইক্রোস্কোপ: মাইক্রোস্কোপের কার্য পদ্ধতি দুটি উত্তল লেন্স দিয়ে তৈরি টেলিস্কোপের মতো, তবে যেহেতু এখানে অনেক দূর থেকে সংগ্রহ করা খুব অল্প আলোর প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয় না, বরং খুব কাছের ক্ষুদ্র একটা বস্তুর ভেতর দিয়ে অনেক তীব্র আলো পাঠানো হয় তাই খুব ছোট এবং অল্প ফোকাল দৈর্ঘ্যের অবজেক্টিভ লেন্স ব্যবহার করা হয়। 9.38 ছবিতে একটা মাইক্রোস্কোপ কেমন করে কাজ করে সেটা দেখানো হয়েছে।

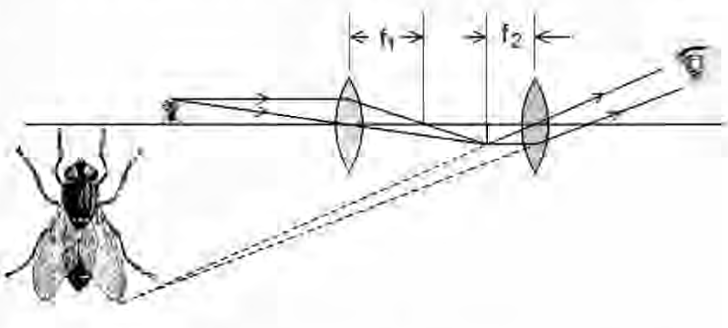

ছবি 9.38: দুটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করে ছোট বস্তুকে বড় করে দেখার জন্যে মাইক্রোস্কোপ তৈরী করা হয়।

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

1. চোখের লেন্স রেটিনাতে উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে, তাহলে আমরা সব কিছু উল্টো দেখি না কেন?
2. চোখের সাথে ক্যামেরার একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কথা বল।
3. ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ কম, এ রকম অবস্থায় কোনো কিছু কী আলো থেকে দ্রুত যেতে পারবে?
4. ভর দুপুরে রংধনু দেখা যায় না কেন?
5. পানির ফোঁটা লেন্সের মতো কাজ করতে পারে, এই লেন্সের ফোকাল দূরত্ব কত হতে পারে?

গাণিতিক সমস্যা:

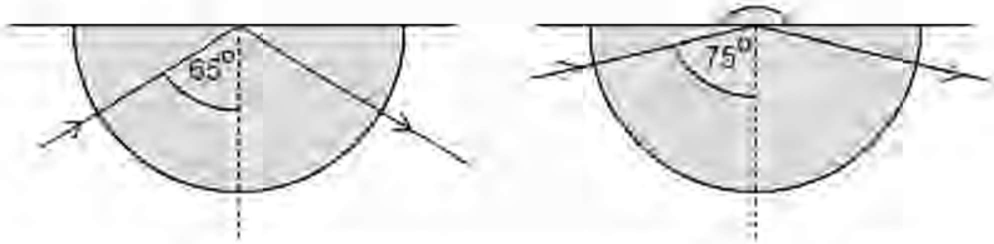

ছবি 9.39: আপতিত বিন্দুতে ভিন্নপ্রতিসরাংকের এক ফোটা তরল রাখা হলে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

1. 9.39 ছবিতে দেখানো আকারের একটা কাচের মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করিয়ে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্রান্তি কোণ পাওয়া গেছে $65°$। ঠিক যে বিন্দুতে আলোক রশ্মিটি আপতিত হয়েছে সেখানে এক বিন্দু তরল রাখার কারণে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে $75°$ তে। তরলের প্রতিসারাংক কত?
2. কাচের তৈরি একটি উত্তল লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য $10cm$ ঠিক একই আকৃতির একটি লেন্স হীরা দিয়ে তৈরি করলে তার ফোকাল দৈর্ঘ্য কত হবে?
3. XY বস্তুটির জন্য তার রশ্মিগুলো যতটুকু সম্ভব সঠিকভাবে এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও। (ছবি 9.40)

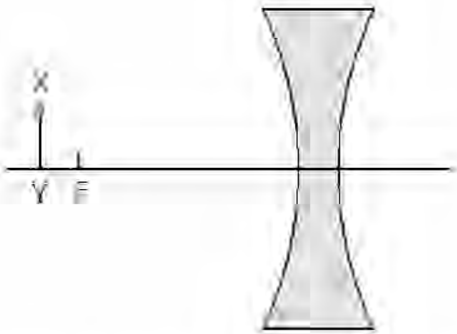

ছবি 9.40: অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখা একটি বস্তু।

4. XY বস্তুটির জন্য তার রশ্মিগুলো যতটুকু সম্ভব সঠিকভাবে এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও। (ছবি 9.41 a)
5. XY বস্তুটির জন্য তার রশ্মিগুলো যতটুকু সম্ভব সঠিকভাবে এঁকে প্রতিবিম্বটি কোথায় হবে দেখাও। (ছবি 9.41 b)

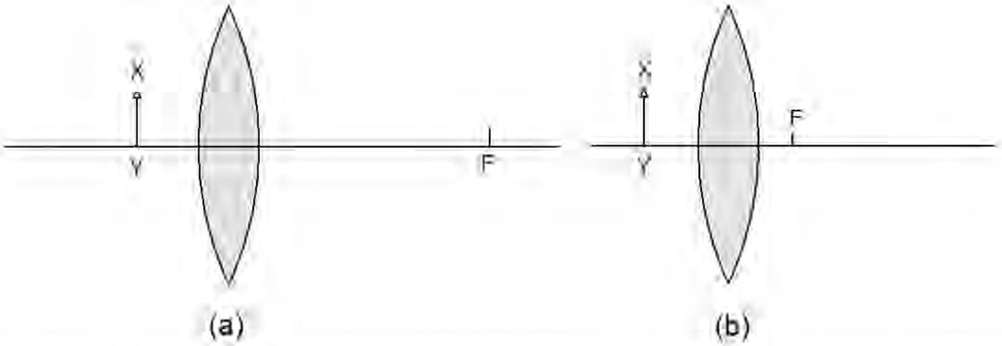

ছবি 9.41: (a) উত্তল লেন্সের ফোকাল দূরত্বের ভেতরে রাখা একটি বস্তু (b) উত্তল লেন্সের ফোকাল দূরত্বের বাইরে রাখা একটি বস্তু

দশম অধ্যায়

স্থির বিদ্যুৎ

(Static Electricity)

Edwin Hubble(1889-1953)

এডউইন হাবল

এডউইন হাবল একজন মার্কিন জ্যোতির্বিদ। তিনি প্রথম দেখিয়েছিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে এবং এটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিগ ব্যাং থিওরির সপক্ষে একটি বড় আবিষ্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পর্যবেক্ষণ করে সৌর জগৎ কিংবা ছায়াপথের বাইরে মহাজাগতিক জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অবদানকে যুগান্তকারী বলে ধারণা করা হয়। তাঁর বাবা তাঁকে একজন আইনবিদ তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি সেভাবে আইন নিয়ে পড়াশোনাও করেছিলেন কিন্তু শেষে জ্যোতির্বিদ হিসেবেই নিজেকে গড়ে তোলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়নি এবং কোথায় তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে সেটা কেউ জানে না!

10.1 চার্জ (Charge)

শীতকালে শুকনো চুল চিরুনি দিয়ে আচড়িয়ে তোমাদের প্রায় সবাই নিশ্চয়ই কখনো না কখনো ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে সেই চিরুনি দিয়ে আকর্ষণ করেছ। শীতপ্রধান দেশে শীতকালে বাতাস খুব শুকনো থাকে, তখন ছোট শিশু যখন কার্পেটে হামাগুড়ি দেয় তখন তাদের চুল খাড়া হয়ে যায়, দেখে মনে হয় একটি চুল বুঝি অন্য চুলকে ঠেলে খাড়া করিয়ে দিয়েছে। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ঝড়ের রাতে আকাশ চিড়ে বিদ্যুতের ঝলককে নিচে নেমে আসতে দেখেছ।

কাগজের আকর্ষণ, চুলের বিকর্ষণ কিংবা বজ্রপাত– এই তিনটি ব্যাপারের মূলেই কিন্তু একই বিষয় কাজ করেছে সেটি হচ্ছে চার্জ বা আধান। চার্জ (বা আধান) কী, কেন সেটা কখনো আকর্ষণ করে কখনো বিকর্ষণ করে আবার কখনো বিদ্যুৎ ঝলক তৈরি করে বোঝার জন্য আমাদের একেবারে গোড়ায় যেতে হবে, অণু-পরমাণু কেমন করে তৈরি হয় সেটা জানতে হবে।

আমরা সবাই জানি সবকিছু অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। পৃথিবীতে 109 টি পরমাণু আছে এর মাঝে মাত্র 43 টি টেকসই, মাত্র এই কয়টি পরমাণু দিয়ে লক্ষ লক্ষ ভিন্ন অণু তৈরি হয়েছে। একটা অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে পানি, একটা সোডিয়াম পরমাণুর সাথে একটা ক্লোরিন পরমাণু দিয়ে লবণ একটা কার্বন পরমাণুর সাথে চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে রান্না করার গ্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি। (অবাক হবার কিছু নেই বাংলায় মাত্র চল্লিশটা বর্ণমালা সেই বর্ণমালা দিয়ে হাজার হাজার শব্দ তৈরি হয়েছে!)

পরমাণু হচ্ছে সব কিছুর বিল্ডিং ব্লক (Building Block) এই পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ছোট একটা নিউক্লিয়াস, তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াস তৈরি হয় প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। এর ভেতরে প্রোটনের চার্জ হচ্ছে ধনাত্মক বা পজিটিভ (নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই) আর ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক বা নেগেটিভ। প্রোটন আর ইলেকট্রনের চার্জ সমান কিন্তু বিপরীত অর্থাৎ তার মান $(1.6 \times 10^{-19}\ coul)$ কিন্তু একটা পজিটিভ অন্যটা নেগেটিভ। একটা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যে কয়টা প্রোটন থাকে তার বাইরে ঠিক সেই কয়টা ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে তাই পরমাণুর সম্মিলিত চার্জ শূন্য, অর্থাত পরমাণু হচ্ছে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বা নিস্তড়িৎ বা নিউট্রাল। সবচেয়ে সহজ পরমাণু হচ্ছে হাইড্রোজেন, আর নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে শুধু একটা প্রোটন তাকে ঘিরে ঘুরছে একটা ইলেকট্রন। এর পরের পরমাণু হচ্ছে হিলিয়াম, নিউক্লিয়াসে দুইটা প্রোটন (এবং চার্জবিহীন দুইটা নিউট্রন) আর বাইরে দুইটা ইলেকট্রন। এভাবে আস্তে আস্তে আরো বড় বড় পরমাণু তৈরি হয়েছে, পরিশিষ্ট-2 এ সেগুলো একটার পর আরেকটা দেখানো হয়েছে। হাইড্রোজেনকে যদি বাদ দিই তাহলে বলা যায় নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন থাকে কমপক্ষে ততগুলো এবং সাধারণত আরো বেশি নিউট্রন থাকে।

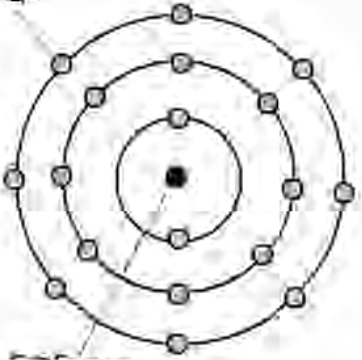

ছবি 10.1: একটি যৌগের পরমাণু। এক কক্ষপথ পূর্ণ করে ইলেকট্রন পরের কক্ষপথে যায়।

নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনগুলো সব একই কক্ষপথে থাকে না, 10.1 ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে একটা কক্ষপথ পূর্ণ করে পরের কক্ষপথে যেতে থাকে। ভেতরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো অনেক শক্তভাবে আটকে থাকে, তবে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলোকে একটু চেষ্টা করলে আলাদা করা যায়। ইলেকট্রন আলাদা করার একটা উপায় হচ্ছে ঘর্ষণ।

এমনিতে পরমাণুগুলো চার্জ নিরপেক্ষ— অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুতে সমান সংখ্যক প্রোটন আর ইলেকট্রন কিন্তু কোনো কারণে যদি বাইরের কক্ষপথের একটা ইলেকট্রন সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে

ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যায় অর্থাৎ পরমাণুটা আর বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল থাকে না, তার ভেতরে পজিটিভ চার্জের পরিমাণ বেড়ে যায়। একটা ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে পরমাণুটা একটি পজিটিভ চার্জ হয়, দুটি সরিয়ে নিলে দুটি পজিটিভ চার্জ হয়। আমরা তখন বলি পরমাণুটি আয়োনিত বা

ছবি 10.2: কাচকে সিল্ক দিয়ে এবং প্লাস্টিককে ফ্লানেল দিয়ে ঘষে পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ গঠন করা যায়।

আহিত হয়েছে। একটা পরমাণু যে রকম পজিটিভভাবে আয়োনিত হতে পারে ঠিক সে রকম নেগেটিভ ভাবেও আয়োনিত হতে পারে– অর্থাৎ তখন বিচ্ছিন্ন একটি বা দুটি ইলেকট্রন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে যায় তখন পরমাণুর মোট চার্জ হয় নেগেটিভ।

পরমাণুগুলোর ইলেকট্রনগুলো তার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে, এগুলো কীভাবে সাজানো হবে তার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এখন তার গভীরে আমরা যাব না– শুধু বলে রাখি কখনো কখনো শেষ কক্ষপথে একটি দুটি ইলেকট্রন প্রায় মুক্ত অবস্থায় থাকে, এ রকম পদার্থে ইলেকট্রনগুলো খুব সহজে পুরো পদার্থের মাঝে ছোটাছুটি করতে পারে। এ রকম পদার্থকে আমরা বলি বিদ্যুৎ পরিবাহী। আবার কিছু কিছু পদার্থে ছোটাছুটি করার মতো ইলেকট্রন নেই, যে কয়টি আছে খুব শক্তভাবে আবদ্ধ সেগুলো হচ্ছে বিদ্যুৎ অপরিবাহী। ধাতব পদার্থ– যেমন সোনা, রুপা, তামা হচ্ছে বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। কাঠ, প্লাস্টিক, কাচ, রবার এসব হচ্ছে বিদ্যুৎ অপরিবাহী।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে আমরা যদি সেগুলো বুঝে থাকি তাহলে স্থির বিদ্যুতের পরের বিষয়গুলো মনে হবে খুবই সহজ।

10.2 ঘর্ষণে স্থির বিদ্যুৎ তৈরি (Static Electricity by Friction)

এক টুকরো কাচকে যদি এক টুকরো সিল্ক দিয়ে ঘষা হয় (10.2 ছবি) তাহলে কাচ থেকে ইলেকট্রনগুলো সিল্কে আসতে শুরু করবে অর্থাৎ কাচটি হবে পজিটিভ বা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত আর সিল্কটি হবে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত। ব্যাপারটি ঘটে কারণ ইলেকট্রনের জন্য কাচের যত আসক্তি সিল্কের আসক্তি তার থেকে বেশি।

আবার যদি এক টুকরো প্লাস্টিককে ফ্লানেল (বা পশমি কাপড়) দিয়ে ঘষা হয় তাহলে ফ্লানেল থেকে ইলেকট্রন চলে আসবে প্লাস্টিকের টুকরোতে তার কারণ ইলেকট্রনের জন্য প্লাস্টিকের আকর্ষণ ফ্লানেল থেকে বেশি।

এবারে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি। ধরা যাক কাচ এবং সিল্ক ব্যববহার করে আমরা দুই টুকরো কাচকে পজিটিভ চার্জ দিয়ে আহিত করেছি। এখন একটাকে যদি সাবধানে একটা বিদ্যুৎ অপরিবাহি সিল্কের সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে তার কাছে অন্যটা নিয়ে আসি তাহলে দেখবে ঝুলন্ত কাচের টুকরোটি বিকর্ষিত হয়ে সরে যাচ্ছে। (ছবি 10.3)

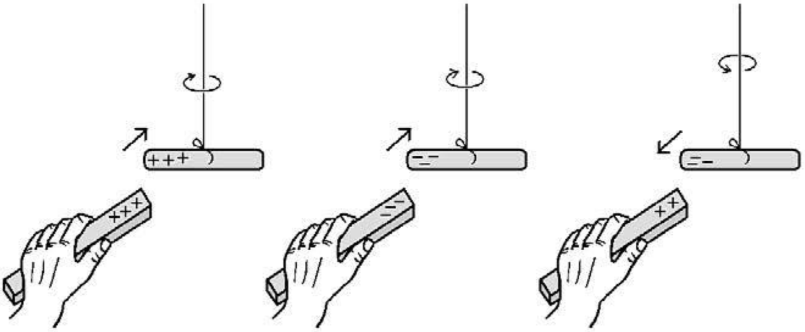

ছবি 10.3: এক চার্জ বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত চার্জ আকর্ষণ করে।

আমরা যদি একইভাবে দুই টুকরো প্লাস্টিককে নেগেটিভ চার্জ দিয়ে আহিত করে একটাকে সিল্কের সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিই এবং অন্যটা তার কাছে নিয়ে আসি তাহলে আমরা একই ব্যাপার দেখব, একটা আরেকটাকে বিকর্ষণ করছে। এবারে যদি প্লাস্টিকের দণ্ডটা যখন ঝুলে আছে তখন তার কাছে পজিটিভ চার্জে আহিত কাচের দণ্ডটা নিয়ে আসি তখন দেখব একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করছে।

আমরা যখন মহাকর্ষ বল পড়েছি তখন দেখেছি সেখানে শুধু এক রকম ভর তাই মাত্র এক রকম বল– সেটি হচ্ছে আকর্ষণ। এখন আমরা দেখছি এখানে দুই রকম চার্জ এবং বলটিও দুই রকম, কখনো আকর্ষণ, কখনো বিকর্ষণ। এক্সপেরিমেন্টটা যদি ঠিকভাবে করে থাকি তাহলে দেখতে পাব একই ধরনের চার্জ একে অন্যকে বিকর্ষণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন চার্জ একে অন্যকে আকর্ষণ করে।

10.3 বৈদ্যুতিক আবেশ (Electric Induction)

এই অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ানোর পর সেই চিরুনিটি যখন ছোট ছোট কাগজের কাছে আনা হয় তখন কাগজগুলো লাফিয়ে চিরুনির কাছে চলে আসে– বোঝা যায় চিরুনিটা কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করছে। আমরা এখন জানি চিরুনিটাতে নেগেটিভ চার্জ জমা হয়েছে এবং সে কারণেই চিরুনিটা কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করছে– কিন্তু এখানে একটা ছোট জটিলতা আছে। আমরা দেখেছি বিপরীত চার্জ আকর্ষণ করে, তাই কগজগুলোকে আকর্ষণ করতে হলে সেগুলোকে

অবশ্যই চিরুনির বিপরীরত চার্জ হতে হবে– কিন্তু আমরা জানি কাগজের টুকরোগুলোতে কোনো চার্জই নেই তাহলে চিরুনি কেন এগুলোকে আকর্ষণ করছে?

ব্যাপারটা ঘটে বৈদ্যুতিক আবেশ নামের একটা প্রক্রিয়ার জন্য। কাচ কিংবা প্লাস্টিকে চার্জ জমা করে সেটাকে যদি চার্জহীন কোনো কিছুর কাছে আনা হয় তাহলে সেই চার্জহীন বস্তুটার মাঝে এক ধরনের চার্জ জন্ম নেয়। বিষয়টা বোঝানোর জন্য 10.4 ছবিতে একটা ধাতব গোলক দেখানো হয়েছে, এটাকে রাখা হয়েছে বিদ্যুৎ অপরিবাহী স্ট্যান্ডের ওপর। এখন একটা কাচকে সিল্ক দিয়ে খুব ভালো করে ঘষে তার মাঝে চার্জ জমা করে নিয়ে সেটা ধাতব গোলকের কাছে নিয়ে এলে ধাতব গোলকের নেগেটিভ চার্জগুলো আকর্ষিত হয়ে কাছে চলে আসবে এবং গোলকের পিছন দিকে পজিটিভ চার্জগুলো সরে যাবে। এখন কাচ দণ্ড পজিটিভ চার্জযুক্ত, কাচ দণ্ডের কাছাকাছি গোলকের অংশটুকু নেগেটিভ চার্জযুক্ত কাজেই এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে!

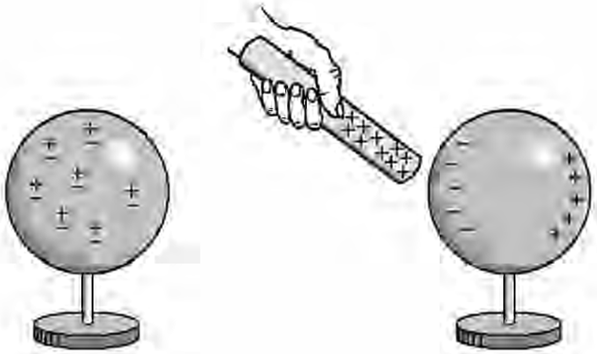

ছবি 10.4: চার্জবিহীন বস্তুও কাছে চার্জ সহ বস্তু আনা হলে বিপরীত চার্জ আবেশিত হয়।

এবারে আমরা চিরুনি দিয়ে কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করার ব্যাপারটা বুঝতে পারব। যখন কাগজের টুকরোর কাছাকছি নেগেটিভ চার্জযুক্ত চিরুনিটা আনা হয় তখন কাগজের টুকরোর যে অংশ কাছাকাছি সেখানে পজিটিভ চার্জ আবেশিত হয় আর সাথে সাথে যে অংশ দূরে সেখানে নেগেটিভ চার্জ জমা হয়। কাগজের টুকরোর পজিটিভ চার্জের অংশটুকু চিরুনির আকর্ষণ অনুভব করে আর কাগজের টুকরোর নেগেটিভ অংশটুকু চিরুনির বিকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু যেহেতু পজিটিভ চার্জের অংশটুকু চিরুনির কাছে তাই আকর্ষণটুকু বিকর্ষণ থেকে বেশি সেজন্য কাগজের টুকরো আকর্ষিত হয়ে লাফিয়ে চিরুনির কাছে চলে যায়। (ছবি 10.5)

ছবি 10.5: শীতকালে চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ে ছোট কাগজের কাছে ধরলে সেগুলো আকর্ষণ অনুভব করে।

এর পর আরো একটা ব্যাপার ঘটে তোমরা হয়তো নিজেরাই সেটা লক্ষ করেছ। কাগজের যে টুকরোগুলো লাফিয়ে চিরুনির গায়ে লেগে যায় সেগুলো আবার প্রায় সাথেই চিরুনি থেকে ছিটকে নিচে চলে আসে!

এর কারণটাও নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ, কাগজের টুকরোটা যদি আকর্ষিত হয়ে চিরুনির গায়ে লেগে যায় তাহলে সেটার আর আবেশিত থাকতে হয় না। চিরুনি থেকে নেগেটিভ চার্জ দিয়ে এটা নিজেই নেগেটিভ চার্জে ভরে যায়। তখন সেগুলো চিরুনি থেকে বিকর্ষিত হয়ে ছিটকে নিচে নেমে আসে। যারা বিশ্বাস করো না তারা বিষয়টা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পার।

বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকলে জমা হওয়া চার্জ দ্রুত হারিয়ে যায়– তাই স্থির বিদ্যুতের এই এক্সপেরিমেন্টগুলো শীতকালে অনেক বেশি ভালো কাজ করে।

উদাহরণ 10.1: দুটি ধাতব গোলক রয়েছে একটি পজিটিভ চার্জ যুক্ত কাচের দণ্ড দিয়ে দুটি গোলকে কি দুই রকমের চার্জ তৈরি করতে পারবে?

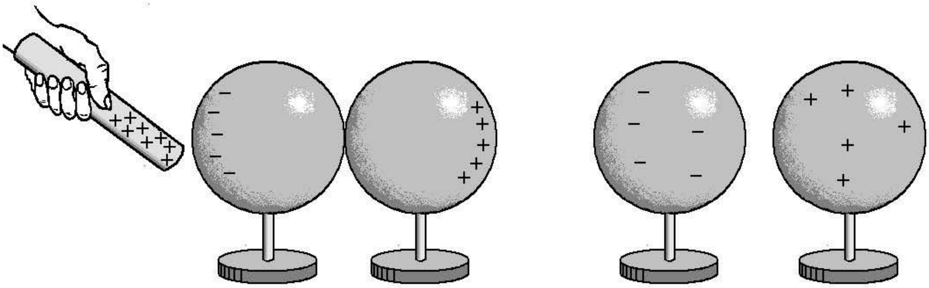

ছবি 10.6: দুটি ধাতব গোলককে একসাথে রেখে তাদের ভেতরেও ভিন্ন চার্জ আবেশিত করা সম্ভব।

উত্তর: হ্যাঁ 10.6 ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে দুটো গোলকে ভিন্ন চার্জ আবেশিত করে আলাদা করা সম্ভব।

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার কথা বলেছিলাম– এতক্ষণে সেগুলো কেন ঘটেছে তোমরা নিশ্চয়ই সেটা বুঝে গেছ! চিরুনির বিষয়টা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ছোট শিশুর হামাগুড়ি দেয়ার বিষয়টাও বোঝা কঠিন নয়– কার্পেটে ঘষে ঘষে যাবার জন্য তার শরীরে চার্জের জমা হয়, সারা শরীরের সাথে সাথে চুলেও সেই চার্জ ছড়িয়ে পড়ে। সব চুলে একই চার্জ– আমরা জানি এক ধরনের চার্জ বিকর্ষণ করে তাই একটা চুল অন্য চুলকে বিকর্ষণ করে খাড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে! এখন আমরা বজ্রপাতের বিষয়টাও ব্যাখ্যা করতে পারব। মেঘের সাথে মেঘের ঘর্ষণে সেখানে চার্জ আলাদা হয়ে যায়। আকাশের মেঘে যখন বিপুল পরিমাণ চার্জ জমা হয় তখন সেটা নিচে বিপরীত চার্জের আবেশ তৈরি করে এবং মাঝে

মাঝে সেটা এত বেশি হয় যে বাতাস ভেদ করে সেটা মেঘের সাথে যুক্ত হয়ে যায়– যেটাকে আমরা বজ্রপাত বলি। (ছবি 10.7)

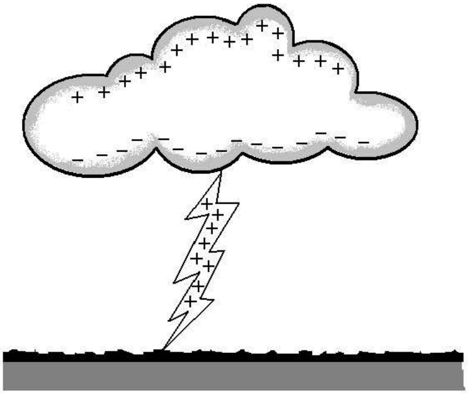

ছবি 10.7: মেঘ থেকে বিপুল পরিমান চার্জ যখন মাটিতে নেমে আসে তাকে আমরা বজ্রপাত বলি।

10.3.1 ইলেকট্রোস্কোপঃ

ইলেকট্রোস্কোপ স্থির বিদ্যুৎ পরীক্ষার জন্য খুব চমৎকার একটা যন্ত্র। যন্ত্রটা খুবই সহজ, এখানে চার্জের অস্তিত্ব বোঝার জন্য রয়েছে খুবই হালকা সোনা, অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোনো ধাতুর দুটি পাত। এই পাত দুটো একটা সুপরিবাহী দণ্ড দিয়ে একটা ধাতব চাকতির সাথে লাগানো থাকে পুরোটা একটা অপরিবাহী ছিপি দিয়ে কাচের বোতলের ভেতর রাখা হয় যেন বাইরে থেকে দেখা যায় কিন্তু বাতাস বা অন্য কিছু যেন পাতলা ধাতব পাত দুটোকে নাড়া চাড়া করতে না পারে।

চার্জ আহিতকরণ

একটা কাচের টুকরোকে সিল্ক দিয়ে ঘষা হলে কাচ দণ্ডটাতে পজিটিভ চার্জ জমা হবে। এখন কাচ দণ্ডটা যদি ইলেকট্রোস্কোপের ধাতব চাকতিতে ছোয়ানো যায় তাহলে সাথে সাথে খানিকটা চার্জ চাকতিতে চলে যাবে। চাকতি যেহেতু ধাতব দণ্ড আর সোনার পাতের সাথে লাগানো আছে তাই চার্জটুকু সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। সোনার পাতে যখন একই পজিটিভ চার্জ এসে হাজির হবে আর তখন দেখা যাবে পাত দুটো বিকর্ষণ করে তাদের মাঝে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে।

ঠিক একইভাবে একটা চিরুনিকে যদি ফ্লানেল দিয়ে ঘষা হয় তাহলে চিরুনিটাতে নেগেটিভ চার্জ জমা হবে, এখন সেটা যদি চাকতিতে স্পর্শ করা হয় তাহলে নেগেটিভ চার্জ সোনার পাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং দুটো পাত একটা আরেকটাকে বিকর্ষণ করে ফাঁক হয়ে যাবে।

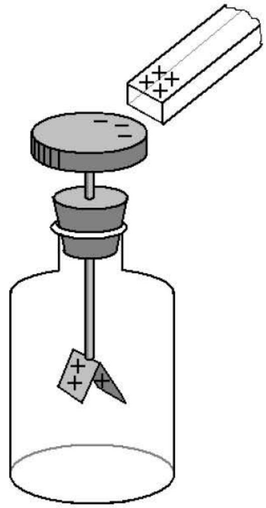

ছবি 10.8: ইলেক্ট্রস্কোপে চার্জের উপস্থিতির কারণে সূক্ষ্ম ধাতব পাত পরস্পর থেকে সরে যায়

চার্জের প্রকৃতি বের করা

কোনো একটা বস্তুতে যদি চার্জ জমা হয় তাহলে সেটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ চার্জ সেটা ইলেকট্রোস্কোপ দিয়ে বের করা যায়।

প্রথমে ইলেকট্রোস্কোপের চাকতিতে পরিচিত কোনো চার্জ দিতে হবে। ধরা যাক কাচকে সিল্ক দিয়ে ঘষে পজিটিভ চার্জ তৈরি করে আমরা সেটাকে চাকতিতে স্পর্শ করালে যদি সোনার পাত দুটির ফাঁক কমে যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা মাঝে নেগেটিভ চার্জ। যদি ফাঁকটি আরো বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে চার্জটি নিশ্চয়ই পজিটিভ।

চার্জের আবেশ

কোনো একটা বস্তুতে চার্জ আছে কি না সেটা চাকতিকে স্পর্শ না করেই বোঝা সম্ভব। ধরা যাক পজিটিভ চার্জ আছে এ রকম একটা দণ্ডকে চাকতির কাছে আনা হয়েছে, তাহলে চাকতির মাঝে নেগেটিভ চার্জের আবেশ হবে। (ছবি 10.8)। এই নেগেটিভ চার্জের আবেশে করার জন্য ইলেকট্রোস্কোপের অন্যান্য অংশ থেকে নেগেটিভ চার্জকে চাকতির মাঝে চলে আসতে হবে, সে কারণে সোনার পাত দুটিতেও পজিটিভ চার্জ তৈরি হবে– সেই পজিটিভ চার্জ সোনার পাত দুটির মাঝে একটা ফাঁক তৈরি করবে।

যদি পজিটিভ চার্জ দেয়া কোনো কিছু না এনে নেগেটিভ চার্জ দেয়া কিছু আনি তাহলেও আমরা দেখব সোনার পাত দুটো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে তবে এবারে সেটি হবে সেখানে নেগেটিভ চার্জ জমা হওয়ার কারণে।

10.4 বৈদ্যুতিক বল (Electric Force)

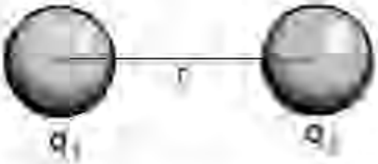

ছবি 10.9: দুটি চার্জ q_1 এবং q_2 এর ভেতরে বল F, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুইই হতে পারে।

আমরা একটু আগেই দেখেছি বিপরীত চার্জ একে অন্যকে আকর্ষণ করে কিন্তু এক ধরনের চার্জ একে অন্যকে বিকর্ষণ করে। তবে আমরা এখনো জানি না ঠিক কতখানি আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ করে, সেটা বুঝতে হলে আমাদের কুলম্বের সূত্রটি একটুখানি দেখতে হবে। বিজ্ঞানী কুলম্ব দুটি চার্জের মাঝে কতখানি বল কাজ করে সেটা বের করেছিলেন। এ রকম একটা বলের সূত্র আমরা এর মাঝে একটা দেখে ফেলেছি সেটি হচ্ছে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বলের সূত্র। সেটি ছিল এ রকম:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভর m_1 আর m_2 কে চার্জ q_1 আর q_2 দিয়ে পরিবর্তন করে দিলেই আমরা কুলম্বের সূত্র পেয়ে যাব। মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য ধ্রুবটি ছিল G এবারে ধ্রুবটির জন্য আমরা k ব্যবহার করব এইটুকুই পার্থক্য। অর্থাৎ যদি q_1 আর q_2 দুটি চার্জ r দূরত্বে থাকে তাহলে তাদের ভেতরে বল F এর পরিমাণ (ছবি 10.9):

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

এখানে q_1 আর q_2 এর একক হচ্ছে কুলম্ব C এবং r বা দূরত্বের একক হচ্ছে m কাজেই k এর একক আমরা বলতে পারি Nm^2/C^2 যেন F এর একক হয় N

k এর মান:

$$k = 9 \times 10^9\ Nm^2/C^2$$

কুলম্ব হচ্ছে চার্জের একক, আমরা পরের অধ্যায়েই দেখব চার্জের প্রবাহ হচ্ছে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা কারেন্ট এবং কারেন্টের একক হচ্ছে এম্পিয়ার। এক সেকেন্ড ব্যাপি এক এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহ করা হলে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় সেটা হচ্ছে এক কুলম্ব (C)।

তবে কুলম্ব বোঝার সবচেয়ে খাঁটি পদ্ধতি হচ্ছে ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জের পরিমাণটি বোঝা। তার পরিমাণ

ইলেকট্রনের চার্জ: $-1.6 \times 10^{-19}\ C$

প্রোটনের চার্জ: $1.6 \times 10^{-19}\ C$

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ q_1 এবং q_2 দুটিই যদি পজিটিভ বা নেগেটিভ হয় তাহলে F এর মান হবে পজিটিভ এবং তখন একটি অন্যটিকে বিকর্ষণ করে। যদি একটা পজিটিভ আর অন্যটি নেগেটিভ হয় তাহলে F এর মান হবে নেগেটিভ, তার অর্থ বলের দিক পরিবর্তন হলো অর্থাৎ চার্জ দুটি একটা আরেকটিকে আকর্ষণ করবে। আমরা আগেই সেটা দেখেছিলাম, সূত্র থেকেও সেটা আসছে।

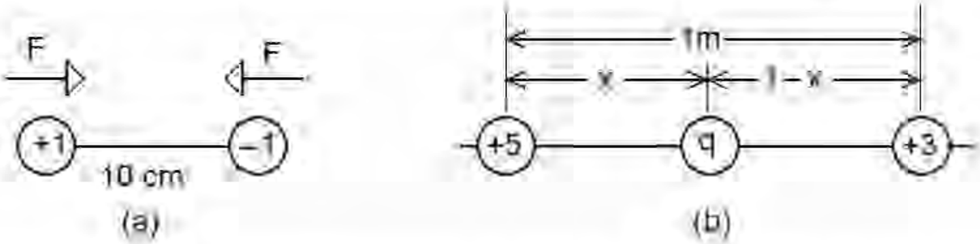

ছবি 10.10: (a) 10 cm দূরে অবস্থিত +1C এবং -1C চার্জ (b) 1 মিটার দূরে অবস্থিত +5C এবং +3C চার্জ

উদাহরণ 10.1: একটি $+1$ কুলম্ব চার্জ এবং একটি -1 কুলম্ব চার্জ $10\ cm$ দূরে রাখা হলো। দুটো চার্জের ভেতর বল কতটুকু?

উত্তর: দুটো বিপরীত চার্জ একে অন্যকে আকর্ষণ করবে। তাদের ভেতরকার বল: (ছবি 10.10a)

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

এখানে

$q_1 = 1C$
$q_2 = -1C$
$r = 10cm = 0.10m$
$k = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times 1 \times (-1)}{(0.10)^2} N = 9 \times 10^{11} N$$

উদাহরণ 10.2: একটি $+5C$ এবং $+3C$ চার্জ $1m$ দূরে রাখা হয়েছে। এখন তৃতীয় একটি চার্জ $+q$ এমনভাবে দুটি চার্জের মাঝখানে রাখ যেন সেটি কোনো বল অনুভব না করে। (ছবি 10.10 b)

উত্তর: $+q$ চার্জটি $+5C$ ডান দিকে ঠেলে দেবে এবং $+3C$ বাম দিকে ঠেলে দেবে। দুটি চার্জ যখন একই বলে ঠেলবে তখন $+q$ চার্জটি কোনো বল অনুভব করবে না।

কাজেই

$$k\frac{(+5)q}{x^2} = k\frac{(+3)q}{(1-x)^2}$$

$$5(1-x)^2 = 3x^2$$

$$2x^2 - 10x + 5 = 0$$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 40}}{4}$$

$$x = 4.435 \text{ কিংবা } 0.565$$

x এর মান 0 থেকে 1 এর ভেতরে হবে কাজেই এটি নিশ্চয়ই 0.565

(x যদি 4.435 হয় তাহলে কী হবে নিজেরা চিন্তা করে বের কর!)

উদাহরণ 10.3: হাইড্রোজেন এটমের কেন্দ্রে একটা প্রোটন এবং বাইরে একটা ইলেকট্রন। প্রোটনের চার্জ $+1.6 \times 10^{-19}C$ এবং ইলেকট্রনের চার্জ $-1.6 \times 10^{-19}C$. যদি নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের কক্ষপথের দূরত্ব $0.5 \times 10^{-8}m$ হয় তাহলে তাদের ভেতরে আকর্ষণ কতটুকু?

উত্তরঃ

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

এখানে

$$q_1 = +1.6 \times 10^{-19}C$$
$$q_2 = -1.6 \times 10^{-19}C$$

$r = 0.5 \times 10^{-8}m$

$$k = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$$

কাজেই

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times 1.6 \times 10^{-19} \times (-1.6 \times 10^{-19})}{(0.5 \times 10^{-8})^2} N = 9.22 \times 10^{-12}N$$

উদাহরণ 10.4: পৃথিবীতে এবং চাঁদে কী পরিমাণ চার্জ জমা রাখলে মহাকর্ষ বল শূন্য হয়ে চাঁদ কক্ষপথ থেকে ছুটে বের হয়ে যাবে?

উত্তরঃ পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝে মাধ্যাকর্ষণ বলঃ

$$F_G = G\frac{mM}{r^2}$$

এখানে

$G = 6.67 \times 10^{-11} Nkg^{-2}m^2$
$m = 7.35 \times 10^{22} kg$
$M = 5.97 \times 10^{24} kg$
$r = 3.84 \times 10^6 km$

কাজেই

$$F_G = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 7.35 \times 10^{22} \times 5.97 \times 10^{24}}{(3.84 \times 10^8)^2} N = 1.98 \times 10^{20}N$$

পৃথিবী এবং চাঁদে সমান পরিমাণ চার্জ রাখা হলে বিকর্ষণ বলঃ

$$F_E = k\frac{q^2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times q^2}{(3.84 \times 10^8)^2} NC^{-2}$$

মাধ্যাকর্ষণকে কুলম্ব বল দিয়ে কমিয়ে দিতে হলে দুটো বল সমান হতে হবে

অর্থাৎ $F_G = F_E$

$$1.98 \times 10^{20}N = \frac{9 \times 10^9 \times q^2}{(3.84 \times 10^8)^2} NC^{-2}$$

$$q^2 = 3.24 \times 10^{27} C^2$$
$$q = 5.69 \times 10^{13} C$$

সুতরাং ইলেকট্রনের সংখ্যা

$$n = \frac{q}{e} = \frac{5.69 \times 10^{13} C}{1.6 \times 10^{-19} C} = 3.56 \times 10^{32}$$

একটা ইলেকট্রনের ভর $9.11 \times 10^{-31}\ kg$, কাজেই সবগুলো ইলেকট্রনের ভর:

$$(3.56 \times 10^{32}) \times (9.11 \times 10^{-31}) kg = 324\ kg!$$

অর্থ্যাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে এবং চাঁদে মাত্র 324 kg ইলেকট্রন রেখে দিতে পারলে চাঁদ কক্ষপথ থেকে ছুটে বের হয়ে যাবে। (একটা মাঝারি গরুর ভরের সমান!)

10.5 তড়িৎ ক্ষেত্র (Electric Field)

দুটি চার্জের ভেতরকার বল আমরা কুলম্বের সূত্র দিয়ে বের করতে পারি। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য প্রত্যেকবারই আলাদা করে মহাকর্ষণ বল থেকে শুরু না করে আমরা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বের করে নিয়েছিলাম। সেটার সঙ্গে ভর গুণ দিলেই বল বের হয়ে যেত।

তড়িৎ বলের বেলাতেও আমরা সেটা করতে পারি আমরা তড়িৎ ক্ষেত্র বলে একটা নূতন রাশি সংজ্ঞায়িত করতে পারি, তার সাথে চার্জ q গুণ করলেই আমরা সেই চার্জের ওপর আরোপিত বল F পেয়ে যাব। অর্থাৎ যে কোনো চার্জ Q তার চাপাশে একটা তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি করে, সেই তড়িৎ ক্ষেত্র E হচ্ছে

$$E = k\frac{Q}{r^2}$$

এই তড়িৎ ক্ষেত্রে যদি কোনো চার্জ q আনা হয় তাহলে চার্জটি F বল অনুভব করবে, আর F বলের পরিমাণ হবে:

$$F = Eq$$

বল F যেহেতু ভেক্টর, q যেহেতু স্কেলার তাই E হচ্ছে ভেক্টর এবং তার একক হচ্ছে Nm^2/C তোমরা দেখবে তড়িৎ ক্ষেত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলে পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করা অনেক সহজ হয়।

তড়িৎ ক্ষেত্র দেখা যায় না কিন্তু কাউকে বোঝানোর জন্য অনেক সময় তড়িৎ বল রেখা নামে পুরোপুরি কাল্পনিক এক ধরনের রেখা এঁকে দেখানো হয় (মাইকেল ফ্যারাডে প্রথম সেটা করেছিলেন।) আমাদের পরিচিত জগৎ ত্রিমাত্রিক কাজেই বল রেখাগুলো চারদিকেই ছড়িয়ে পড়বে তোমাদের দেখানোর জন্য সেগুলো একটা সমতলে এঁকে দেখানো হয়েছে। (ছবি 10.11)

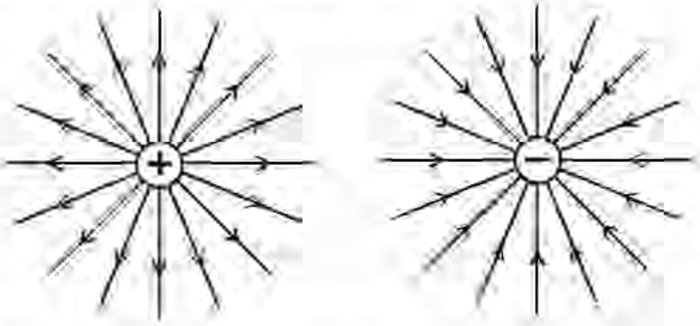

ছবি **10.11**: পজিটিভ চার্জ থেকে বলরেখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিগেটিভ চার্জের দিকে বলরেখা কেন্দ্রীভূত হয়।

বল রেখা আঁকার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলা হয়। যেমন

(a) পজিটিভ চার্জের বেলায় বল রেখা চার্জ থেকে বের হবে নেগেটিভ চার্জের বেলায় বল রেখা চার্জে এসে কেন্দ্রীভূত হবে। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে বল রেখার দিক হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক।

(b) চার্জের পরিমাণ যত বেশি হবে বল রেখার সংখ্যা তত বেশি হবে।

(c) বল রেখাগুলো যত কাছাকাছি থাকবে তড়িৎ ক্ষেত্র তত বেশি হবে।

(d) একটি চার্জের বল রেখা কখনো অন্য চার্জের বল রেখার উপর দিয়ে যাবে না।

10.12 a ছবিতে দুটো বিপরীত চার্জের জন্য বল রেখা দেখানো হয়েছে এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক চার্জের বল রেখা অন্য চার্জে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। যেখানে তড়িৎ ক্ষেত্র বেশি সেখানে বল রেখার সংখ্যাও বেশি শুধু তাই নয় ছবিটি দেখলে দুটো চার্জ একটা আরেকটাকে টানছে এ রকম একটা অনুভূতি হয়। 10.12 b ছবিতে দুটোই পজিটিভ চার্জ দেখানো

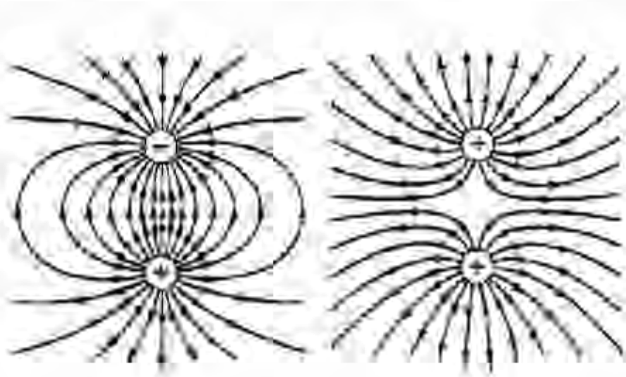

(a) (b)

ছবি **10.12**: (a) বিপরীত এবং (b) সমচার্জের জন্যে তৈরি বল রেখা

হয়েছে এবং ছবি দেখেই দুটো চার্জ একটি আরেকটিকে ঠেলে দিচ্ছে এ রকম অনুভূতি হচ্ছে। শুধু তাই নয় দুটো চার্জের মাঝামাঝি অংশে একটি চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্র অন্য চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্রকে কাটাকাটি করে ফেলে চলে সেখানে বল রেখা কম এবং এর মাঝখানে একটি বিন্দু রয়েছে যেখানে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান শূন্য। যদি দুটোই নেগেটিভ চার্জ হতো তাহলে শুধু মাত্র বল রেখার দিক পরিবর্তন হতো তাছাড়া অন্য সবকিছু আগের মতোই হতো।

উদাহরণ 10.5: $5C$ চার্জের জন্য $10m$ দূরে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত?

উত্তরঃ

$$E = k\frac{q}{r^2}$$

এখানে

$$q = 5C$$
$$q_2 = -1.6 \times 10^{-19}C$$
$$r = 10m$$
$$k = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$$

কাজেই

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 5}{10^2} N/C \ = 4.5 \times 10^8 N/C$$

উদাহরণ 10.6: 3C চার্জের একটি বস্তু $10N$ বল অনুভব করছে, ঐ জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড কত?

উত্তরঃ $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$

কাজেই

$$E = \frac{F}{q}$$

এখানে

$$F = 10N$$
$$q = 3C$$

কাজেই

$$E = \frac{F}{q} = \frac{10N}{3C} = 3.33N/C$$

উদাহরণ 10.7: চার্জ এবং তার দ্বিগুণ পরিমাণ বিপরীত চার্জ থাকলে তার বল রেখা কেমন হয়।

উত্তরঃ 10.13 ছবিতে দেখানো হয়েছে।

10.6 ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল (Electric Potential)

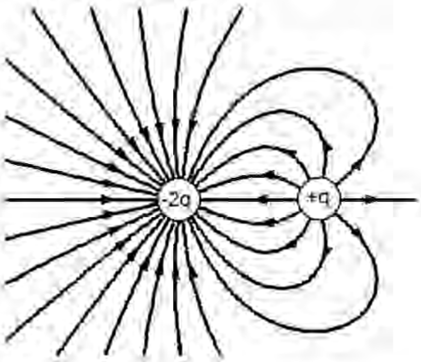

ছবি 10.13: চার্জ এবং দ্বিগুণ পরিমাণ বিপরীত চার্জের জন্যে বলরেখা।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দুটি পাত্রে যদি পানি থাকে এবং একটি নল দিয়ে যদি পানির পাত্র দুটোকে জুড়ে দেয়া যায় তাহলে যে পাত্রি পানির পৃষ্ঠতল উঁচুতে থাকবে সেখান থেকে অন্য পাত্রে পানি চলে আসবে। কোন পাত্র থেকে কোন পাত্রে পানি আসবে সেটা পানির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না সেটা নির্ভর করে পানির পৃষ্ঠতলের উচ্চতার উপরে।

ঠিক সে রকমভাবে আমরা দেখেছিলাম ভিন্ন তাপমাত্রায় দুটো পদার্থকে যদি একটার সাথে আরেকটাকে স্পর্শ করানো যায় তাহলে তাপ কোন পদার্থ থেকে কোথায় যাবে সেটা সেই পদার্থের তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, সেটা নির্ভর করে তাপমাত্রার ওপর। তাপমাত্রা যার বেশি সেখান থেকে তাপ প্রবাহিত হয় তাপমাত্র যার কম সেখানে। তাপমাত্রা বেশি হলেও অনেক কম তাপ রয়েছে সেরকম বস্তু থেকেও তাপ অনেক বেশি তাপ যেখানে আছে সেখানে প্রবাহিত হতে পারে।

আমরা স্থির বিদ্যুৎ আলোচনা করার সময় বেশ কয়েকবার বলেছি কোনো একটা বস্তুতে চার্জ জমা করে সেটা যদি অন্য কোনো বস্তুতে স্পর্শ করা হয় তাহলে সেখানে চার্জ প্রবাহিত হয়। এখানেও কি পানির পরিমাণ আর পৃষ্ঠদেশের উচ্চতা কিংবা তাপ এবং তাপমাত্রার মতো চার্জ এবং চার্জ মাত্রা বলে কিছু আছে? যেটা ঠিক করবে চার্জ কোন বস্তু থেকে কোন বস্তুতে যাবে? সেটি আসলেই আছে এবং সেটাকে বলা হয় পটেনশিয়াল বা বিভব। যদি দুটো বস্তুর ভেতরে ভিন্ন ভিন্ন চার্জ থাকে এবং দুটোকে স্পর্শ করানো হয় তাহলে যে বস্তুটিতে পটেনশিয়াল বেশি সেখান থেকে কম পটেনশিয়ালে চার্জ প্রবাহিত হবে!

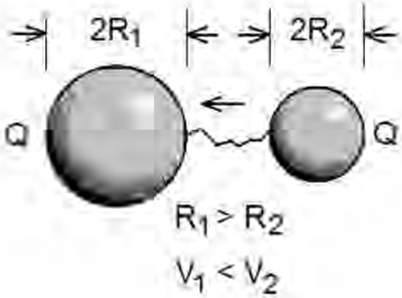

ছবি 10.14: বেশী পটেনশিয়াল থেকে কম পটেনশিয়ালে চার্জ প্রবাহিত হয়।

একটা ধাতব গোলকের ব্যাসার্ধ যদি r হয় এবং তার ওপর যদি Q চার্জ দেয়া হয় তাহলে তার পটেনশিয়াল হবে V

$$V = \frac{Q}{C}$$

এখানে C হচ্ছে গোলকের ধারকত্ব বা Capacitance। গোলাকার ধাতব গোলকের জন্য C এর মান

$$C = \frac{r}{k}$$

যেখানে $k = 9 \times 10^9\ Nm^2/C^2$

কাজেই যদি r_1 এবং r_2 ব্যাসার্ধের দুটো ধাতব গোলক থাকে এবং দুটো গোলকেই সমান পরিমাণ চার্জ Q দেয়া হয় তাহলে যে গোলকের ব্যাসার্ধ কম হবে সেখানে পটেনশিয়াল বা বিভব বেশি হবে। যদি একটা তার দিয়ে দুটো গোলককে জুড়ে দেয়া হয় তাহলে ছোট গোলক থেকে বড় গোলকে চার্জ যেতে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না দুটো গোলকের পটেনশিয়াল সমান হয়। (ছবি 10.14)

পটেনশিয়ালের এককটি সম্পর্কে আমরা সবাই পরিচিত এটা হচ্ছে ভোল্ট। এবারে আমরা জানার চেষ্টা করি পটেনশিয়াল বলতে আমরা আসলে কী বোঝাই?

আমরা বিভব বা পটেনশিয়ালকে পানির পৃষ্ঠের উচ্চতা কিংবা তাপমাত্রার সাথে তুলনা করেছি, চার্জের প্রবাহ কোন দিকে হবে সেটা বোঝার জন্য এই তুলনাটি ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি আক্ষরিক ভাবে সেটা বিশ্বাস করে নিই তাহলে কিন্তু হবে না, তার কারণ পটেনশিয়াল বা বিভব কিন্তু আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা রাশি।

যেমন ধরা যাক যদি কোনো একটা ধাতব গোলকে পজিটিভ Q চার্জ দেয়া হয়েছে তাহলে তার পৃষ্ঠদেশের বিভব বা পটেনশিয়াল হচ্ছে

$$V = k\frac{Q}{r}$$

পৃষ্ঠ দেশের বাইরে তার পটেনশিয়াল কত? এটি কিন্তু মোটেও শূন্য নয় গোলকের চারপাশে কোথায় কত বিভব সেটাও বের করা সম্ভব।

তোমরা জান একটা গোলকে চার্জ থাকার কারণে তার চারপাশে ইলেকট্রিক ফিল্ড E আছে, কাজেই সেখানে যদি একটা চার্জ q আনা হয় সেই চার্জটি একটা বল F অনুভব করবে যেখানে

$$F = Eq$$

যেহেতু গোলকে চর্জি Q পজিটিভ এবং গোলকের বাইরে রাখা q চার্জটাও পজিটিভ কাজেই সেটা বিকর্ষণ অনুভব করবে এবং আমরা যদি q চার্জটাকে যদি ছেড়ে দিই তাহলে সেই বলের জন্য তার ত্বরণ হবে, গতি বাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি! আবার q চার্জটাকে যদি আমরা গোলকের কাছে আনার চেষ্টা করে (কল্পনা করে নাও ধাতব গোলকটা শক্ত করে কোথাও লাগানো q চার্জ সেটাকে ঠেলে সরাতে পারবে না) তাহলে বলের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে কাজেই যতই আমরা গোলকের কাছে আনব ততই তার ভেতরে স্থিতি শক্তি হতে থাকবে!

বিভব হচ্ছে একক চার্জকে (অর্থাৎ q এর মান 1) কোনো একটা জায়গায় হাজির করতে (ধরে নাও শুরু কছে অনেক দূর থেকে যেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড খুব কম, কাজেই বল বলতে গেলে নেই) যেটুকু কাজ করতে হয় তার পরিমাণ! আশপাশে যদি কোনো চার্জ না থাকে, তাহলে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড ও থাকবে না, চার্জটা কোনো বলও অনুভব করবে না তাই একক চার্জটাকে আনতে কেনো কাজও করতে হবে না, তাই আমরা বলব কোনো বিভব নেই।

কিন্তু যদি চার্জ থাকে তাহলে একক চার্জটাকে আনতে কাজ করতে হবে, এবং ঠিক যেটুকু কাজ করতে হয়েছে তার পরিমাণটা হচ্ছে বিভব। অর্থাৎ q চার্জকে আনতে যদি W কাজ হয় তাহলে বিভব V হচ্ছে

$$V = \frac{W}{q}$$

গোলকের চার্জটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে উল্টো ব্যাপার ঘটবে, চার্জটাকে ছেড়ে দিলে সেটা গোলকের চার্জের আকর্ষণে তার দিকে ছুটে যেতে চাইবে। তাই অনেক দূর থেকে এই চার্জটাকে যদি কোনো রকম ত্বরণ তৈরি না করে কোনো বাড়তি গতিশক্তি না দিয়ে ধীরে ধীরে আনতে যাই তাহলে সারাক্ষণই চার্জটার আকর্ষণ বলটাকে সামলানোর মতো একটা বল দিয়ে কাছে আনতে হবে অর্থাৎ আমরা যেদিকে বল দিচ্ছে তার বিপরীত দিকে চার্জটা যাচ্ছে কাজেই আমাদের দেয়া বল নেগেটিভ কাজ করছে অর্থাৎ আমরা এই চার্জের খানিকটা শক্তি সরিয়ে নিচ্ছি!

তবে এবারেও বিভব হচ্ছে

$$V = \frac{W}{q}$$

শুধু মনে রাখতে হবে W বা কাজ যেহেতু নেগেটিভ তাই V এর মান নেগেটিভ।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা শিখেছি সেগুলো একবার ঝালাই করে নিই :

চার্জ থাকলেই তার আশপাশে যেমন ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে ঠিক সে রকম পটেনশিয়ালও থাকে। সত্যি কথা বলতে কী আমরা যদি পটেনশিয়ালটা কেমন ভাবে আছে সেটা জানি তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা বের করে ফেলতে পারব। এই বইটা যেহেতু তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ তাই কেমন করে কোথাও পটেনশিয়াল বের করতে হয়, কেমন করে সেখান থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তড়িৎ ক্ষেত্র বের করতে হয় সেগুলো আলোচনা করা হয়নি। তবে সাধারণ ভাবে একটা বিষয় জেনে রাখতে পার পটেন্সিয়ালের পরিবর্তন যত বেশি হয় ইকেট্রিক ফিল্ডও তত বেশি হয়!

উদাহরণ 10.8: একটি পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ চার্জের পাশে পটেনশিয়াল কেমন হবে?

উত্তর: বিপরীত সমান চার্জের জন্য সম পটেনশিয়াল রেখাগুলো 10.15 ছবিতে দেখানো হয়েছে। বাম পাশে পটেনশিয়াল পজিটিভ সম পরিমানে কমে কমে ডান পাশে নেগেটিভ হয়েছে। ঠিক মাঝখানে পটেনশিয়াল শূণ্য।

10.6.1 বিভব পার্থক্য

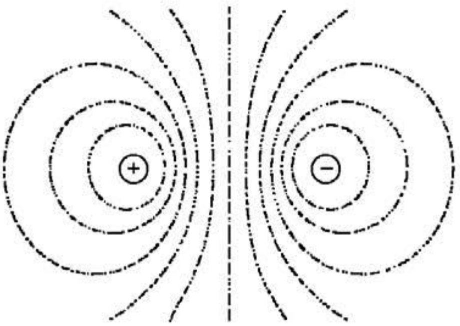

ছবি 10.15: বিপরীত চার্জের জন্যে সম পটেনশিয়াল রেখা।

তোমরা সবাই ইলেকট্রিক লাইনের গায়ে নানারকম সতর্ক বাণী দেখেছ, যেমন, "বিপজ্জনক দশ হাজার ভোল্ট!" তোমরা সবাই জান ইলেকট্রিক শক বলে একটা বিষয় আছে, এটি খুব বিপজ্জনক অসতর্ক মানুষ ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা গেছে সে রকম উদাহরণও আছে। তোমরা যদি বিভব বিষয়টা বুঝে থাক তাহলে নিশ্চয়ই এখন অনুমান করতে পারছ আসলে কী ঘটে। কোথাও যদি বিভব বা পটেনশিয়াল বেশি থাকে এবং তুমি যদি সেটা স্পর্শ কর, তোমার শরীরের পটেনশিয়াল যেহেতু কম সেজন্য বেশি বিভবের জায়াগা থেকে চার্জ তোমার শরীরে চলে আসরবে চার্জের সেই প্রবাহ কতটুকু তার ওপর নির্ভর করে তোমার ভেতরে অনেক কিছু হতে পারে!

তুমি যেটা স্পর্শ করছ তার পটেনশিয়াল পজিটিভ বা নেগেটিভ দুটোই হতে পারে এক জায়গায় তোমার শরীর থেকে চার্জ (ইলেকট্রন) যাবে অন্য ক্ষেত্রে তোমার শরীরে চার্জ আসবে, দুটোই বিদ্যুৎ প্রবাহ শুধু দিকটা ভিন্ন।

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ চার্জ প্রবাহিত হয় বিভব পার্থক্যের জন্য– বিভবের মানের জন্য নয়। সে কারণে একটা কাক যখন হাইভোল্টেজ ইলেকট্রি তারের ওপর বসে সে ইলেকট্রিক শক খায় না কারণ তারের বিভব এবং তার নিজের বিভব সমান– কোনো পার্থক্য নেই! শুধু তাই নয় দশ হাজার কিংবা বিশ হাজার ভোল্টের প্রচন্ড উচ্চ ভোল্টেজে কর্মীরা হেলিকপ্টার দিয়ে খালি হাতে কাজ করে– তারা কোনো ইলেকট্রিক শক খায় না– কারণ শূন্যে থাকার কারণে তারা যখন হাইভোল্টেজ তার স্পর্শ করে তাদের শরীরের ভোল্টেজ তারের সমান হয়ে যায়– কোনো পার্থক্য নেই তাই কোনো চার্জ প্রবাহিত হয় না– তারা ইলেকট্রিক শক খায় না! তার মানে হচ্ছে ভোল্টেজের পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ– ভোল্টেজের মান নয় এটা সবার জানা দরকার।

তারপরও যখন ভোল্টেজের মান মাপতে হয় তখন তার জন্য একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ থাকলে ভালো। তাপমাত্রার বেলায় একটা চরম শূন্য তাপমাত্রা ছিল, অনেকটা সে রকম। আমাদের জীবনে আমরা

পৃথিবীকে শূন্য বিভব ধরে নিই। পৃথিবীটা এত বিশাল যে এর মাঝে খানিকটা চার্জ দিলেও সেটা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য তার বিভব বেড়ে যায় না আবার খানিকটা চার্জ নিয়ে গেলেও তার বিভব বেড়ে যায় না! তাই সেটাকে শূন্য বিভব ধরে সব কিছু তার সাপেক্ষে মাপা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সব সময় খুব ভালো করে ভূমির সাথে লাগানো (Earthing) হয়– যার অর্থ কোনো দূর্ঘটনায় হঠাৎ করে কোনো কারণে যদি প্রচুর চার্জ চলে আসে তাহলে সেটা যেন দ্রুত এবং নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে চলে যেতে পারে– যারা আশপাশে আছে তাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

10.6.2 বজ্র নিরোধক

বজ্র পাতের সময় মেঘ থেকে বিশাল পরিমাণ চার্জ পৃথিবীতে নেমে আসে– বাতাসের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সেটা বাতাসকে আয়োনিত করে ফেলে তখন সেখানে প্রচণ্ড তাপ আর আলো তৈরি হয় শব্দ তৈরি হয়, এই বিশাল পরিমাণ চার্জ যেখানে হাজির হয় সেখানে ভয়ংকর ক্ষতি হতে পারে। বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বজ্র নিরোধক দণ্ড লাগানো হয়। বজ্র নিরোধক দণ্ড হচ্ছে একটা ধাতব দণ্ড যেটার নিচের প্রান্ত মাটির গভীরে চলে গেছে, উপরের অংশটুকু একটা বিল্ডিংয়ের মত উপরে সম্ভব হলে খোলা আকাশের দিকে তাক করে রাখা হয় চেষ্টা করা হয় সেখানে এক বা একাধিক সূচালো শলাকা থাকে। সাধারণত জলীয়বাষ্প উপরে ওঠার সময় ঘর্ষণে ইলেকট্রনগুলো আলাদা হয়ে নিচে থেকে যায় এবং উপরে পজিটিভ আয়নগুলো থাকে। মেঘের নিচের ইলেকট্রনগুলো যখন হঠাৎ করে বাতাস ভেদ করে মাঠিতে নেমে আসে আমরা সেটাকে তখন বজ্রপাত বলি। আমরা আগেই দেখেছি চার্জ যুক্ত কোনো কিছু চার্জহীন কোনো কিছুর কাছে আনলে সেখানে বিপরীত চার্জ আবেশিত হয়। তাই বজ্রপাত হবার উপক্রম হলে বজ্র শলাকাতে পজিটিভ চার্জ জমা হয় এবং সূচালো শলাকা থাকার কারণে সেখানে তীব্র ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করে। সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে আশপাশে থাকা বাতাস, জলীয় বাষ্প আয়োনিত হয়ে যায় এবং আকাশের দিকে উঠে মেঘের নেগেটিভ চার্জকে চার্জহীন করে বজ্রপাতের আশংকাকে কমিয়ে দেয়। অনেক উঁচু বিল্ডিংয়ে যখন বজ্র শলাকা রাখা হয় সেটি প্রায় সময়েই সত্যিকার বজ্রপাত গ্রহণ করে আর বিশাল পরিমাণ চার্জকে সেই দণ্ড নিরাপদে মাটির ভেতরে নিয়ে যায়।

যখন বজ্রপাত হয় তখন এত বিশাল পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় যে বাতাসের তাপমাত্রা 20 থেকে 30 হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে যেটা সূর্য প্রষ্ঠের তাপমাত্রা থেকে বেশি! সেখানে তখন একটা নীলাভ সাদা আলোর ঝলকানি দেখি প্রচণ্ড তাপে বাতাস যখন ছিটকে সরে যায় তখন গগনবিদারী একটা শব্দ হয়। আলোর ঝলকানী এবং শব্দ একই সাথে তৈরি হলেও আমরা আলোটিকে প্রথম দেখি– আলোর গতিবেগ এত বেশি যে সেটা প্রায় সাথে সাথে পৌঁছে যায়। শব্দের গতি $330\ m/s$ এ মতো অর্থাৎ এক কিলোমিটার যেতে প্রায় $3s$ সময় নেয়। কাজেই আলোর কত সেকেন্ড পর শব্দটা শোনা গেছে সেখান থেকে আমরা বজ্রপাতটা কত দূরে হয়েছে সেটা অনুমান করতে পারি। আনুমানিক ভাবে প্রতি তিন সেকেন্ডের জন্য এক কিলোমিটার।

10.7 ধারক (Capacitor)

কোনো পদার্থে তাপ দেয়া হলে তার তাপমাত্রা কত বাড়বে সেটা সেই পদার্থের তাপ ধারণের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। তাপ ধারণক্ষমতা বেশি হলে অনেক তাপ দেয়া হলেও তাপমাত্রা অল্প একটু বাড়ে, কম হলে অল্প তাপ দেয়া হলেই অনেকখানি তাপমাত্র বেড়ে যায়। ঠিক সে রকম কোনো পদার্থে চার্জ দেয়া হলে তার বিভব কতটুকু বাড়বে সেটা তার ধারকত্বের ওপর নির্ভর করে। কোনো বস্তুর ধারকত্ব বেশি হলে অনেক চার্জ দেয়া হলেও তার বিভব বাড়বে অল্প একটু আবার ধারকত্ব কম হলে অল্প চার্জ দিলেই বিভব অনেক বেড়ে যায়। আমরা আগেই বলেছি কোনো কিছুর ধারকত্ব C হলে সেখানে যদি Q চার্জ দেয়া হয় তাহলে বিভব V হবে

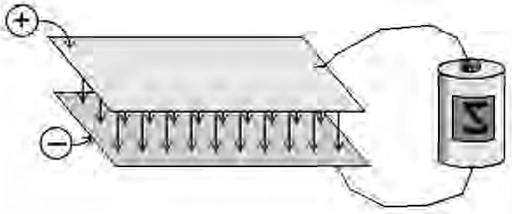

ছবি **10.16:** সমান্তরাল ধাতব প্লেট দিয়ে তৈরি ক্যাপাসিটর।

$$V = \frac{Q}{C}$$

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি r ব্যাসার্ধের ধাতব গোলকের জন্য C হচ্ছে

$$C = \frac{r}{k}$$

তবে সবচেয়ে পরিচিত সহজ এবং কার্যকর ধারক তৈরি করা হয় দুটো ধাতব পাত পাশাপাশি রেখে। ধাতব পাতের একটিকে যদি পজিটিভ অন্যটিতে নেগেটিভ চার্জ রাখা হয় তাহলে দুটি পাতের মাঝখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডে শক্তি সঞ্চিত থাকে। একটা ক্যাপাসিটরের ধারকত্ব যদি C এবং ভোল্টেজ V হয় তাহলে তার ভেতরে যে শক্তি (Energy) জমা থাকে সেটি হচ্ছে

$$\text{Energy} = \frac{1}{2} CV^2$$

উদাহরণ 9.9: একটা $20\mu F$ ক্যাপাসিটরে $10V$ বৈদ্যুতিক পটেনশিয়াল দেয়া হয় তাহলে সেখানে কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকবে?

উত্তর: শক্তি : $\frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times 10^2 J = 10^{-3} J = 1mJ$

10.8 স্থির বিদ্যুতের ব্যবহার (Use of Static Electricity)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, কলকারখানা ল্যাবরেটরি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হাসপাতাল সব জায়গায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, তবে প্রায় সব জায়গাতেই সেটা হয় চল বিদ্যুৎ (পরের অধ্যায়ে আমরা সেটা দেখব) তবে বিশেষ বিশেষ জায়গাতে এখনো স্থির বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়:

(a) ফটোকপি

আমরা সবাই কখনো না কখনো কাগজের কোনো লেখার কপি তৈরি করার জন্য ফটোকপি মেশিন ব্যবহার করেছি। এখানে কাগজের লেখার ওপর আলো ফেলে তার একটি প্রতিচ্ছবি একটি বিশেষ ধরনের রোলারে ফেলা হয় এবং সেই রোলারে কাগজের লেখাটির মতো করে স্থির চার্জ তৈরি করা হয়। তারপর এই রোলারটিকে পাউডারের মতো সূক্ষ্ম কালির সংস্পর্শে আনা হলে যেখানে যেখানে চার্জ জমা হয়েছে সেখানে কালো কালি লেগে যায়। তারপর নূতন একটা সাদা কাগজের ওপর ছাপ দিয়ে এই কালিটি বসিয়ে দেয়া হয়। কালিটি যেন লেপ্টে না যায় সেজন্য তাপ দিয়ে কালিটিকে আরো ভালো করে কাগজে যুক্ত করে প্রক্রিয়াটি শেষ করা হয়।

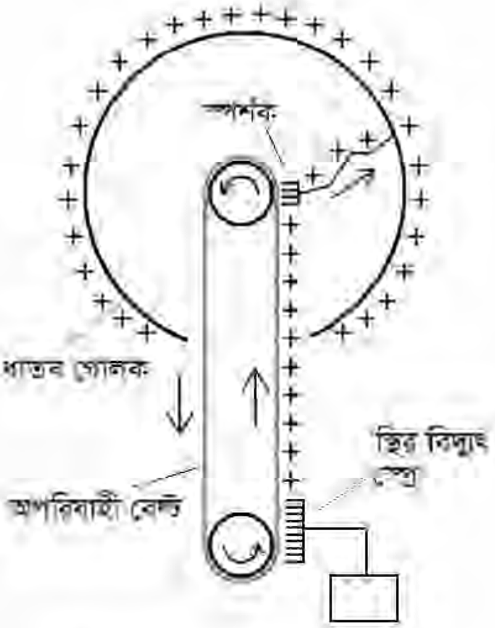

ছবি 10.17: ভ্যান ডি গ্রাফ মেশিন

(b) ভ্যান ডি গ্রাফ মেশিন

অত্যন্ত উচ্চ বিভব দিয়ে নানা ধরনের কাজ করা হয়। ভ্যান ডি গ্রাফ মেশিনে সেটি করা সম্ভব হয় স্থির বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। একটি ঘুরন্ত বিদ্যুৎ অপরিবাহী বেল্টে স্থির বিদ্যুৎ স্প্রে করা হয়, বেল্টটি ঘুরিয়ে একটি ধাতব গোলকের ভেতর নেয় হয়। বেল্টের ওপর থেকে একটা স্পর্শক এই চার্জটা গ্রহণ করে ধাতব গোলকের কাছে পৌঁছে দেয়। আমরা জানি চার্জ সব সময়ই বেশি থেকে কম বিভবে প্রবাহিত হয়। ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটরে এটি সব সময় ঘটে থাকে কারণ ধাতব গোলকের ভেতরে সব সময়েই গোলকের সমান বিভব থাকে। বেল্টের উপরের বাড়তি চার্জটুকুর জন্য যে বাড়তি ভোল্টেজ তৈরি হয় সেটি তাই সব সময়েই গোলকের ভোল্টেজ থেকে বেশি। সে কারণে গোলকের ভেতরে চার্জ থাকলেই সেটা গোলক পৃষ্ঠে চলে যায়। এভাবে বিশাল পরিমাণ চার্জ জমা করিয়ে অনেক উচ্চ পটেনশিয়াল তৈরি করা সম্ভব।

(c) জ্বালানি ট্রাক

পেট্রোল বা অন্য জ্বালানির ট্রাক যখন তাদের জ্বালানি সরবরাহ করে তখন তাদের খুব সতর্ক থাকতে হয় যেন হঠাৎ করে কোনো বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়ে বড় কোনো বিস্ফোরণের জন্ম না দেয়। জ্বালানি ট্রাকের চাকার সাথে রাস্তার ঘর্ষণে স্থির বিদ্যুৎ তৈরি হলে এটা ঘটতে পারে, সেজন্য এই ধরনের ট্রাকের পিছনে ট্যাংক থেকে একটা শেকল ঝুলিয়ে দেয়া হয়– সেটা রাস্তার সাথে ঘষা খেতে থাকে যেন কোনো স্থির বিদ্যুৎ তৈরি হলে সেটা যেন সাথে সাথে মাটিতে চলে যেতে পারে।

অনুশীলনী

প্রশ্ন

1. চার্জের ক্ষুদ্রতম একটি মান আছে, সেটি হচ্ছে $1.6 \times 10^{-19} C$ এ রকম কি ভরের একটি ক্ষুদ্রতম মান আছে?
2. বর্ষাকালে স্থির বিদ্যুতের পরীক্ষাগুলো ঠিক করে কাজ করে না কেন?
3. দুটো এক আকারের ধাতব গোলককে স্পর্শ না করে তাদের মাঝে সমান এবং বিপরীত চার্জ দিতে পারবে?
4. ধারকত্ব বা capacitance কে যদি একটা পাত্রের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে পটেনশিয়ালটি কিসের সাথে তুলনা করব?
5. কোনো বিন্দুতে পটেনশিয়াল শূন্য কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড শূন্য নয়, এটি কি সম্ভব?

গাণিতিক সমস্যা

1. $4C$ এবং $-1C$ চার্জ $1m$ দূরে রাখা আছে। চার্জ দুটির সংযুক্ত রেখার কোথায় ইলেকট্রিক ফিল্ড শূন্য?
2. হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন কুলম্ব বলের কারণে একটি প্রোটনকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রনের ভর $9.11 \times 10^{-31} kg$ এবং প্রোটনের ভর $1.67 \times 10^{-27} kg$ এই ভরের কারণে তাদের ভেতরে নিশ্চয়ই একটি মাধ্যাকর্ষণ বলও আছে। দুটি বলের ভেতর কোনটি বড় এবং কত বড়?
3. 1 নম্বর প্রশ্নের চার্জ দুটির জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের বল রেখা গুলি এঁকে দেখাও।
4. 10.15 ছবিতে চার্জের জন্য সম পটেনশিয়াল রেখা দেখানো হয়েছে, সেখান থেকে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখাও।
5. 10.13 ছবি দুটি চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড দেখানো আছে, পটেনশিয়াল এঁকে দেখাও।

একাদশ অধ্যায়
চল বিদ্যুৎ
(Electricity)

.Satyendra Nath Bose (1894-1974)

সত্যেন বোস

সত্যেন্দ্র নাথ বোসের জন্ম কলকাতায়, তিনি একজন বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক থাকা অবস্থায় তিনি বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই জগদ্বিখ্যাত পেপারটি জার্নাল ছাপাতে অস্বীকার করায় তিনি সেটি আইনস্টাইনের কাছে পাঠান এবং জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে জার্নালে ছাপানোর অনুরোধ করেন। তরুণ এই বিজ্ঞানীর অনুরোধ রক্ষা করে আইনস্টাইন সেটি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই আবিষ্কারের কারণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই ধরনের কণার একটিকে বোজন নামে অভিহিত করা হয়। পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও তাঁর গণিত, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, দর্শন এমনকি সাহিত্যেও আগ্রহ ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য তিনি অনেক কাজ করেছিলেন।

11.1 বিদ্যুৎ প্রবাহ (Electric Current)

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে যদি দুটো ভিন্ন বস্তুর বিভবের মাঝে পার্থক্য থাকে তাহলে যেটার বেশি বিভব সেখান থেকে যেটার বিভব কম সেখানে চার্জ প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিভব দুটো সমান না হচ্ছে চার্জের প্রবাহ হতেই থাকে। চার্জের এই প্রবাহ হচ্ছে বিদ্যুতের প্রবাহ আমরা যেটাকে সাধারণভাবে "ইলেকট্রিসিটি" বলি, যেটা দিয়ে লাইট জ্বলে, ফ্যান ঘুরে, মোবাইল টেলিফোন চার্জ দেয়া হয়!

একটা বিষয় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, বিভব পার্থক্য থাকলেই শুধু মাত্র বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়, তাই আমরা যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রাখতে চাই তাহলে বিভব পার্থক্যটাও বজায় রাখতে হবে, সেটাকে কমে সমান হয়ে যেতে দেয়া যাবে না। দুটো গোলকের মাঝে ভিন্ন চার্জ দিয়ে ভিন্ন বিভব তৈরি করে গোলক দুটোকে যদি একটা তার দিয়ে জুড়ে দিই তাহলে বিদ্যুতের প্রবাহ শুরু হবার সাথে সাথে বিভবের

পার্থক্য কমতে থাকবে এবং মুহূর্তের মাঝে দুটি বিভব সমান হয়ে যাবে! দুটো সমান্তরাল ধাতব পাতের মাজে চার্জ জমা করে যদি বিভবের পার্থক্য তৈরি করা হয়, তাহলে সেই দুটো একটা তার দিয়ে জুড়ে দিলেও মুহূর্তের মাঝে পুরো চার্জ প্রবাহিত হয়ে তাদের বিভব সমান হয়ে যাবে। কাজেই বুঝতেই পারছ আমরা যদি ব্যবহার করার মতো সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ চাই তাহলে অন্য কোনো পদ্ধতি দরকার যেটা এমন একটা বিভব পার্থক্য তৈরি করে দেবে যেন চার্জ প্রবাহিত হলেও তার পার্থক্য কমে না যায়।

তোমরা সবাই সে রকম পদ্ধতি দেখেছ, এগুলো হচ্ছে ব্যাটারি এবং জেনারেটর। ব্যাটারির ভেতর রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বিভব পার্থক্য তৈরি করা হয়, সেখান থেকে চার্জ প্রবাহ করা হলে রাসায়নিক দ্রর্বগুলো খরচ হতে থাকে, যখন রাসায়নিক দ্রব্যগুলো শেষ হয়ে যায় তখন ব্যাটারি আর বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে না। আমরা সাধারণ যে ব্যাটারি দেখি সেগুলোর বিভব পার্থক্য হচ্ছে 1.5 ভোল্ট।

তোমাদের স্কুলে কিংবা বাসায় যে ইলেকট্রিসিটি আছে সেখানে তোমরা সবাই দেখেছ বিদ্যুৎকে ব্যবহার করার জন্য দুটো পয়েন্ট থাকে, তার একটাতে থাকে কম বিভব অন্যটাতে বেশি বিভব, এই পার্থক্যটা বজায় রাখে জেনারেটর, যেটি ক্রমাগত বিভব পার্থক্য তৈরি করতে থাকে! একটা ব্যাটারি বা একটা জেনারেটরে ক্রমাগত বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য ক্রমাগত চার্জকে কম বিভব থেকে বেশি বিভবে হাজির করে রাখতে হয় এবং এর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। যদি কোনো ব্যাটারিতে Q চার্জকে কম বিভব থেকে বেশি বিভবে আনতে W পরিমাণ কাজ করতে হয়তাহলে এই ব্যাটারির তড়িৎ চালক শক্তি বা ই.এম.এফ

$$EMF = \frac{W}{Q}$$

ব্যাটারি বা জেনারেটর, যেগুলো বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করে তার তড়িৎ চালক শক্তি বা ই.এম.এফ থাকে। যখন কোনো ব্যাটারি বা জেনারেটরকে কোনো সার্কিটে লাগানো হয় তখন এই তড়িৎ চালক শক্তিই চার্জকে পুরো সার্কিটের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে আনে। একটা ব্যাটারি যে পরিমাণ পটেনশিয়াল তৈরি করে সেটাই হচ্ছে তার তড়িৎ চালক শক্তি বা ই.এম.এফ– ইংরেজিতে এটাকে বলা হচ্ছে ফোর্স বা “বল” বংলায় বলছি “শক্তি”– কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ই. এম. এফ. বা তড়িৎ চালক শক্তি বলও নয় শক্তিও নয়। তোমাদের বলা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানে “বল” “শক্তি” এই বিষয়গুলো খুবই সুনির্দিষ্ট, ইচ্ছে মতন একটার জায়গায় অন্যটা ব্যবহার করা যাবে না– কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে করা হয়ে গেছে! তোমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ যেহেতু একটা ব্যাটারি বা জেনারেটর যে পরিমাণ পটেনশিয়াল তৈরি করে সেটাই হচ্ছে তার ই.এম.এফ. তাই আমরা সেখান থেকেই শুরু করব, পটেনশিয়াল কথাটি দিয়েই সব কাজ করে ফেলব দেখবে কোনো সমস্যা হবে না।

আমরা আগেই বলেছি পটেশিয়ালের মানটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার পার্থক্যটুকু গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেখবে অনেক সময় একটা ব্যাটারির এক মাথার পটেনশিয়াল ভিন্ন করে ফেলা সম্ভব, কিন্তু পার্থক্যটা সব সময়েই সমান থাকবে।

উদাহরণ **11.1:** একটা ব্যাটারির বিভব পার্থক্য $1.5\ V$ কিন্তু আসলে তাদের বিভব কত? নেগেটিভটা শূন্য এবং পজিটিভটা $1.5\ V$ নাকি নেগেটিভটা $-1.5\ V$ এবং পজিটিভটা শূন্য?

উত্তর: দুটোই সত্য হতে পারে। যদি 11.1 (a) ছবির মত হয় তাহলে নেগেটিভটা শূন্য এবং পজিটিভটা $1.5V$, যদি 11.1 (b) ছবির মত হয় তাহলে পজিটিভটা শূন্য এবং নেগেটিভটা $-1.5V$.

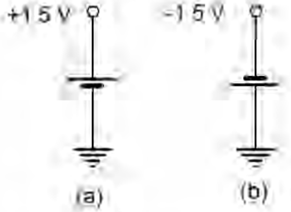

ছবি **11.1:** একটি ব্যাটারি দিয়ে পজেটিভ বা নেগেটিভ ভোল্টেজ দুটোই তৈরি করা সম্ভব।

উদাহরণ **11.2:** দুটি $1.5V$ ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে $1.5V$, $3.0V$, $\pm 1.5V$, $-1.5V$, $-3.0V$ তৈরি কর।

উত্তর: 11.4 ছবিতে করে দেখানো হয়েছে।

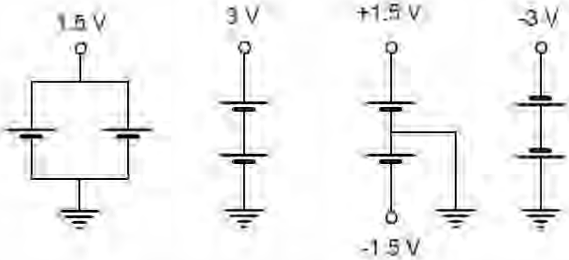

ছবি **11.2:** দুটি ব্যাটারি দিয়ে বিভিন্ন পজেটিভ বা নেগেটিভ ভোল্টেজ তৈরি করা

চার্জের প্রবাহ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা তড়িৎ প্রবাহ। আমরা এতক্ষণ সাধারণভাবে এটা বোঝার চেষ্টা করেছি এখন এটাকে আরো একটু নির্দিষ্ট করা যাক। বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহ বলতে আমরা সময়ের সাথে চার্জ প্রবাহের হারকে বোঝাই অর্থাৎ t সময়ে যদি Q চাজ প্রবাহিত হয় তাহলে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে :

$$I = \frac{Q}{t}$$

এবং চার্জের একক যদি কুলম্ব C এবং সময়ের একক সেকেন্ড s হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার A। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা কিন্তু চার্জের একক বের করার জন্য বলেছিলাম এক সেকেন্ডে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় সেটাই হচ্ছে কুলম্ব!

11.1.1 বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক

আমরা যদি পদার্থের গঠনটা ভালো করে বুঝে থাকি তাহলে একটা বিষয় খুব ভালো করে জেনেছি। কঠিন পদার্থে তার অণু-পরমাণু শক্ত করে নিজের জায়গায় বসে থাকে তাপমাত্রা বাড়লে তারা নিজের জায়গায় কাঁপাকাঁপি করতে পারে কিন্তু সেখান থেকে সরে অন্য জায়গায় চলে যায় না। কোনো কোনো পদার্থের পরমাণুর কিছু ইলেকট্রন প্রায় মুক্ত অবস্থায় থাকে সেগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে

এবং আমরা সেগুলোকে বলি পরিবাহী পদার্থ। পরিবাহী পদার্থ দিয়ে চার্জকে স্থানান্তর করা হয় তবে সব সময় মনে রাখতে হবে এই স্থানান্তর হয় ইলেকট্রন দিয়ে, বিদ্যুতের প্রবাহ হয় ইলেকট্রন দিয়ে, নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন।

তোমাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই এখন একটু ভাবনার মাঝে পড়েছ, কারণ আমরা যখন চার্জের প্রবাহ দিয়ে দুটি ভিন্ন বিভবের মাঝে সমতা আনার কথা বলেছি তখন কিন্তু একবারও বলিনি এটা শুধুমাত্র নেগেটিভ চার্জের জন্য সত্যি, কারণ শুধু নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রনই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। পজিটিভ চার্জের বেলায় তাহলে কী হয়? পজিটিভ আয়ন তো খুবই শক্তভাবে নিজের জায়গায় আটকে থাকে, তাহলে কেমন করে পজিটিভ চার্জ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়?

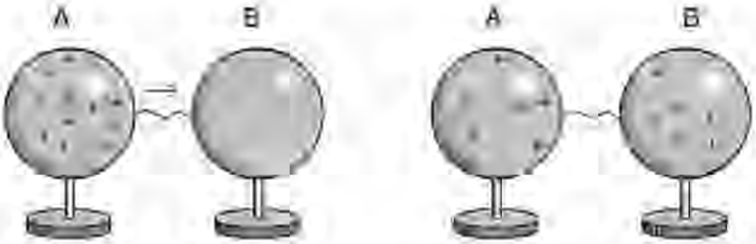

ছবি 11.3: চার্জ সংযুক্ত গোলক থেকে চার্জহীন গোলকে বিদ্যুত প্রবাহ।

তোমরা নিশ্চয়ই কী ঘটে সেটা অনুমান করে ফেলেছ ইলেকট্রনের অভাব হচ্ছে পজিটিভ চার্জ। তাই ইলেকট্রনকে সরিয়ে অভাব আরো বাড়িয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে পজিটিভ চার্জ সরবরাহ করা। কাজেই যদি বলা হয় A থেকে B তে পজিটিভ চার্জ গিয়েছে (ছবি 11.3) তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে B থেকে A তে ইলেকট্রন গিয়েছে।

কারেন্ট বা বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে চার্জ প্রবাহের হার, কোনো কিছু নেগেটিভ হলে সেটা আলাদা করে বলে দিতে হয়, আমরা যেহেতু আলাদা করে বলে দিই নি তাই ধরে নিতেই হবে A থেকে B তে যদি 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয় তার অর্থ 1 কুলম্ব পজিটিভ চার্জ A থেকে Bতে গিয়েছে। যার প্রকৃত অর্থ 1 কুলম্ব চার্জের সম পরিমাণ ইলেকট্রন B থেকে A তে গিয়েছে। যার অর্থ বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহের দিকের উল্টো। (ইলেকট্রনের চার্জকে পজিটিভ ধরে নিলেই সব সমস্যা মিটে যেতো কিন্তু সেটার জন্য এখন দেরি হয়ে গেছে।)

11.2 ও'মের সূত্র (Ohm's Law)

এবারে আমরা সত্যিকারের সার্কিটে সত্যিকারের বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা অনেকবার বলেছি যে দুটি জায়গায় যদি বিভব পার্থক্য থাকে এবং আমরা যদি একটি পরিবাহী তার দিয়ে সেই দুটি জায়গা জুড়ে দেই তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়– কিন্তু কতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে

সেটি নিয়ে কিছু বলা হয়নি। শুধু তাই নয় একটা সোনার পরিবাহী তার দিয়ে জুড়ে দিলে যেটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে একটা লোহার তার জুড়ে দিলেও কী সমান পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে?

বিষয়টা দেখার জন্য আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি। বিভব মাপার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম ভোল্ট মিটার, বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট মাপার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেটার নাম এমিটার। (আসলে একই যন্ত্রের সুইচ ঘুরিয়ে এটাকে কখনো ভোল্ট মিটার বা কখনো এমিটার হিসেবে ব্যবহার করা যায়) আমরা কয়েকটা ব্যাটারি নিতে পারি, একটা ব্যাটারির জন্য $1.5V$ হলে দুটি ব্যাটারির জন্য $2 \times 1.5 = 3V$, তিনটির জন্য $3 \times 1.5 = 4.5V$ এভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করতে পারি। শুধু তাই না আমরা ব্যাটারিগুলো উল্টো দিয়ে বিভব পার্থক্যের দিকও পরিবর্তন করে দিতে পারি। কাজেই আমরা যদি একটা তার বা অন্য কোনো পরিবাহীর দুই পাশে একটা বিভিন্ন পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করে কতো খানি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে সেটা মাপার চেষ্টা করি তাহলে দেখব

(a) যতো বেশি বিভব পার্থক্য তত বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ

(b) বিভব পার্থক্য নেগেটিভ হলে বিদ্যুৎ প্রবাহও দিক পরিবর্তন করছে।

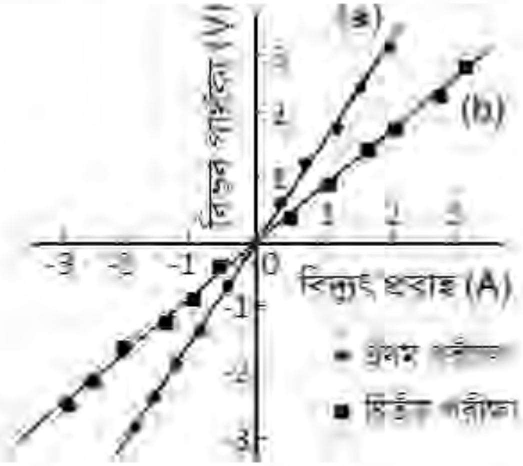

ছবি 11.4: রেজিস্ট্যান্স এর কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহের সাপেক্ষে বিভব পার্থক্য।

যদি গ্রাফ পেপারে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল লাগানো হলে সেটা 11.4 (a) ছবির মতো দেখাবে।

অর্থাৎ $I \propto V$

আমরা যদি অন্য কোনো উপাদানের তৈরি একটা তার দিয়ে একই পরীক্ষাটি করি তাহলে একই ধরনের ফলাফল পাব তবে সরল রেখায় ঢালটা হয়তো অন্য রকম হবে (ছবি 11.4 b)। এখন এই দুটি পরীক্ষার ফলাফল যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারব প্রথমে একটা নির্দিষ্ট বিভব পার্থক্যে যতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে দ্বিতীয় বস্তুর জন্য সেই একই বিভব পার্থক্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে কম। প্রথমটিতে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ তুলনামূলকভাবে সহজ, দ্বিতীয়টিতে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধা একটু বেশি। বিষয়টা ব্যাখ্যা করার জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধা (Resistance)

বা সত্যি সত্যি রোধ নামের একটা রাশি তৈরি করা হয়েছে। আমরা দেখতে পারি বিভব পার্থক্য এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্পর্কটি একটা সূত্র হিসেবে লেখা যায়

$$I = \frac{V}{R}$$

অর্থাৎ রোধ বেশি হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে কম। রোধ কম হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে বেশি।

এই রোধ বা Resistance এর একক হচ্ছে ohm এটাকে গ্রিক অক্ষর Ω (সিগমা) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটে $1\,V$ বিভব পার্থক্য দেয়ার পর যদি দেখা যায় $1\,A$ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে সেই সার্কিটের রোধ Ω

উদাহরণ 11.1: মজা করার জন্য ও'মের সূত্রটিকে অন্যভাবেও লিখতে পার-

$$\frac{V}{I \times R}$$

একটু বড় করে লিখে আঙুল দি V, I কিংবা R এর যে কোনো একটি ঢেকে দাও যেটি ঢেকে দিয়েছ তার মানটি বেটুকু ঢাকা পড়েনি সেখানে পেয়ে যাবে।

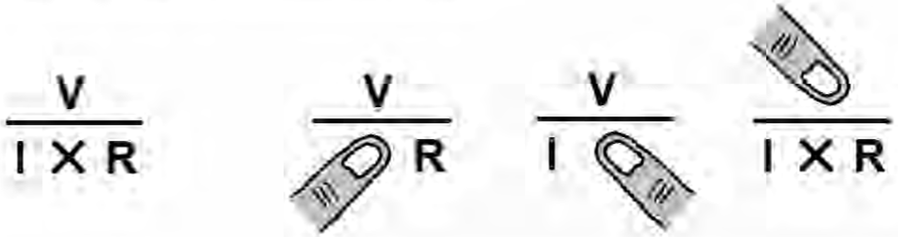

ছবি 11.5: ওমসের সূত্র এই ছবিটি দিয়ে ব্যবহার করা সম্ভব। আঙ্গুল দিয়ে ঢাকা রাশিটির মান বাকী দুটি রাশি দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব।

উত্তর: 11.5 ছবিতে বিষয়টি করে দেখানো হয়েছে।

রোধ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহের বাধা, তাই কোনো পদার্থের দৈর্ঘ্য (L) যত বেশি হবে তার বাধা তত বেশি হবে অর্থাৎ রোধও বেশি হবে।

$$R \propto L$$

আবার সরু একটা পথ দিয়ে যত সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারবে, চওড়া একটা পথ দিয়ে তার থেকে অনেক সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারবে অর্থাৎ প্রস্থচ্ছেদ (A) যত বেশি হবে রোধ তত কম হবে।

$$R \propto \frac{1}{A}$$

এই দুটি বিষয়কে আমরা যদি একসাথে আনুপাতিক না লিখে সমীকরণ হিসেবে লিখতে চাই তাহলে একটা ধ্রুবক ρ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ রোধ R হচ্ছে

$$R = \rho\frac{L}{A}$$

যেখানে ধ্রুবক ρ হচ্ছে

$$\rho = R\frac{A}{L}$$

একটা নির্দিষ্ট পদার্থের জন্যে ρ হচ্ছে আপেক্ষিক রোধ এবং তাই এর একক হচ্ছে Ωm. তোমাদের মনে হতে পারে এককটি বুঝি ঠিক হলো না– এটি হওয়া উচিত ছিল Ωm^{-3} যেন, একক আয়তনে রোধ জানা হলে পুরো আয়াতন দিয়ে গুণ করে পুরো রোধ পেয়ে যাব। দেখতেই পাচ্ছ ব্যাপারটি সে রকম না।

কোনো পদার্থ কতটুকু বিদ্যুৎ পরিবাহী সেটা বোঝানোর জন্য পরিবাহকত্ব বলে একটা রাশি σ তৈরি করা হয়েছে, যে পদার্থ যত বেশি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার পরিবাহকত্ব তত বেশি যেটা আপেক্ষিক রোধ ρ (টেবিল 11.1) এর ঠিক বিপরীত।

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

টেবিল **11.1**: পদার্থের আপেক্ষিক রোধ

পদার্থ	আপেক্ষিক রোধ (Ωm)
রুপা	1.59×10^{-8}
তামা	1.68×10^{-8}
সোনা	2.44×10^{-8}
গ্রাফাইট	2.50×10^{-6}
হীরা	1.00×10^{12}
বাতাস	1.30×10^{16}

এর একক হচ্ছে $(\Omega m)^{-1}$

এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে কোনো পদার্থের রোধ হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহের বাধা, অণু-পরমাণুগুলো যত বেশি কাঁপাকাঁপি করে একটা ইলেকট্রন তাদের ভেতর দিয়ে যেতে তত বেশি বাধাগ্রস্থ হয়, কিংবা তার রোধ তত বেশি। তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলে যেহেতু অণু-পরমাণুগুলো বেশি কাঁপাকাঁপি করে তাই সব সময়েই তাপমাত্রা বাড়ালে পদার্থের আপেক্ষিক রোধ বেড়ে যায়। সেজন্য যখন

কোনো পদার্থের রোধ বা আপেক্ষিক রোধ প্রকাশ করতে হয় তখন তার জন্য তাপমাত্রাটা নির্দিষ্ট করে বলে দিতে হয়।

উদাহরণ 11.4: রুপা, তামা, টাংস্টেন ও নাইক্রোম তারের রোধকত্ব ρ যথাক্রমে 1.6×10^{-8}, 1.7×10^{-8}, 5.5×10^{-8}, 100×10^{-8} Ωmএইগুলো ব্যবহার করে 1Ω রোধ তৈরি কর।

উত্তর: আমরা জানি রোধ

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

যেখানে l দৈর্ঘ্য এবং A প্রস্থচ্ছেদ।
কাজেই $A = 1m^2$ ধরে নিলে

$$l = \frac{RA}{\rho} = \frac{1 \times 1}{\rho}$$

রুপার জন্য :

$$l = \frac{1}{1.6 \times 10^{-8}} = 6.25 \times 10^7 m$$

তামার জন্য :

$$l = \frac{1}{1.7 \times 10^{-8}} = 5.9 \times 10^7 m$$

টাংস্টেনর জন্য :

$$l = \frac{1}{5.5 \times 10^{-8}} = 1.8 \times 10^7 m$$

নাইক্রোমর জন্য :

$$l = \frac{1}{100 \times 10^{-8}} = 10^6 m$$

দেখতেই পাচ্ছ মাত্র 1Ω রোধ তৈরি করার জন্য অনেক দীর্ঘ (প্রায় লক্ষ কিলোমিটার) পদার্থ নিতে হয়। বাস্তবে $A = 1m^2$কখনোই হয় না। অনেক সরু তার ব্যবহার করা হয়। যদি $0.1mm$ প্রস্থচ্ছেদ নির্দিষ্ট করে দিই তাহলে 1Ω রোধ তৈরি করতে কতো দীর্ঘ তারের প্রয়োজন?

আমরা জানি

$$l = \frac{RA}{\rho}$$

$$A = \pi r^2 = \pi (10^{-4})^2 m^2 = 3.14 \times 10^{-8} m^2$$

রুপার জন্য:

$$l = \frac{3.14 \times 10^{-8}}{1.6 \times 10^{-8}} = 1.96m$$

তামার জন্য :

$$l = \frac{3.14 \times 10^{-8}}{1.7 \times 10^{-8}} = 1.84m$$

টাংস্টেনের জন্য।

$$l = \frac{3.14 \times 10^{-8}}{5.5 \times 10^{-8}} = 0.57m$$

নাইক্রোমের জন্য।

$$l = \frac{3.14 \times 10^{-8}}{100 \times 10^{-8}} = 0.03m$$

পরিবাহীতে তাপমাত্রা বাড়ালে রোধ বেড়ে যায় কিন্তু সেমিকন্ডাক্টরের বেলায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটা ঘটে! সেমিকন্ডাক্টরে তাপমাত্রা বাড়ালে রোধ কমে যায়। তার কারণ কন্ডাক্টরে যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য মুক্ত ইলেকট্রন রয়েছে সেমিকন্ডাক্টরে তা নেই– সেখানে তাপমাত্রা বাড়ালেই শুধুমাত্র কিছু ইলেকট্রন বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য পাওয়া যায় তাই সেখানে তাপমাত্রা বাড়ালে রোধ কমে যায়।

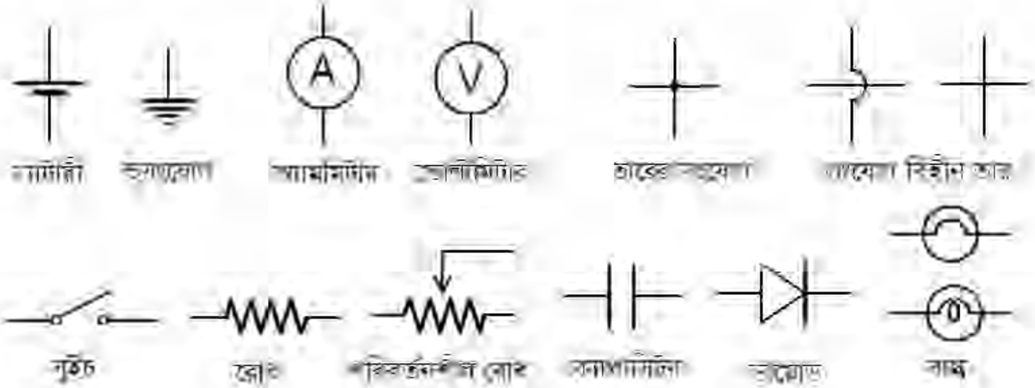

ছবি 11.6: সার্কিটে ব্যবহৃত হয় এ রকম কিছু প্রতীক

11.2.1 সার্কিট

আমরা যদি ও'মের সূত্র বুঝে থাকি তাহলে আমরা এখন সার্কিট বিশ্লেষণ করতে পারি। সেটা করার আগে সার্কিটে ব্যবহার করা হয় এ রকম কয়েকটি প্রতীকের সাথে আগে পরিচিত হয়ে নিই: (ছবি 11.6)

সব পদার্থেরই কিছু না কিছু রোধ আছে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সার্কিটে ব্যবহারের সময় বৈদ্যুতিক তারের রোধকে আমরা কর্তব্যের মাঝে নিই না। যখন রোধ প্রয়োজন হয় তখন আমরা বিশেষভাবে তৈরি বিভিন্ন মানের রোধ ব্যবহার করি। কখনো কখনো বিশেষ প্রয়োজনে এমন রোধ ব্যবহার করা হয়ে যেখানে তার মানটি পরিবর্তনও করা যায়, এগুলোকে পরিবর্তনশীল রোধ বলে।

কোনো সার্কিট বিশ্লেষণ করতে হলে নিচের কয়েকটা সোজা বিষয় মনে রাখাই যথেষ্ট:

(a) বিদ্যুতের উৎসের (ব্যাটারি জেনারেটর যাই হোক) উঁচু পটেনশিয়াল থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ বের হয় পুরো সার্কিটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঠিক সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ কম পটেনশিয়ালে ফিরে আসে।

(b) সার্কিটের যে কোনো জায়গায় যে কোনো বিন্দুতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ঢোকে ঠিক সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ বের হয়ে যায়, সার্কিটের ভেতরে বিদ্যুতের কোনো ধ্বংস নেই।

(c) সার্কিটের ভেতরে যে কোনো অংশের দুই বিন্দুতে ও'মের সূত্র সব সময় সত্যি হবে, অর্থাৎ সেই দুই অংশের যে পরিমাণ বিভব পার্থক্য রয়েছে তাকে সেই অংশের রোধ দিয়ে ভাগ দিলেই তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ বের হয়ে যাবে!

আমরা এখন যে কোনো সার্কিট বিশ্লেষণ করতে প্রস্তুত! একটা সার্কিটের যে কোনো অংশ দিয়ে কতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং যে কোনো অংশের বিভব কত সেটা জানলেই আমরা ধরে নেব সার্কিটটা আমরা পুরোপুরি বুঝে গেছি। একটা সার্কিটে ব্যাটারি, রোধ, ক্যাপাসিটর, ডায়োড, ট্রানজিস্টর অনেক কিছু থাকতে পারে– তবে আমরা আপাতত শুধু ব্যাটারি আর রোধ দিয়ে তৈরি সার্কিট বিশ্লেষণ করব। সার্কিটে বিভিন্ন রোধ তামার তার দিয়ে সংযুক্ত করা হয়– যদিও আমরা দেখেছি তামারও একটি আপেক্ষিক রোধ আছে– কিন্তু বাস্তব জীবনের সার্কিটে যে রোধ ব্যবহার করা হয় তাদের তুলনায় এটি এত কম যে আমরা এটাকে ধর্তব্যের মাঝেই আনব না– ধরে নেব তারের রোধ নেই– কাজেই একটা তারের সব জায়গায় বিভব সমান!

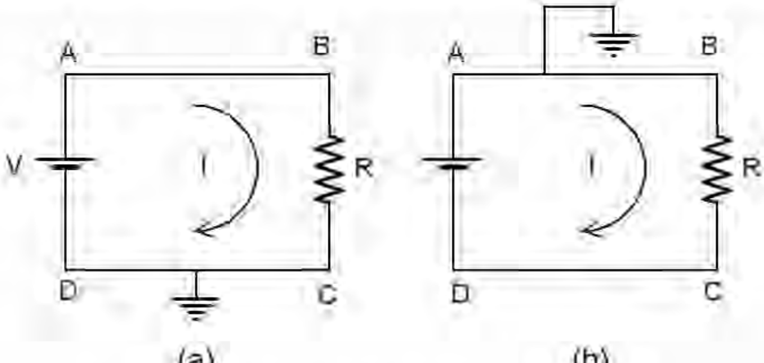

ছবি 11.7: একটি ব্যাটারী ও রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত দুটি সার্কিট।

এবারে 11.7 (a) ছবি দেখানো একটা সার্কিট বিশ্লেষণ করা যাক, এখানে একটা রোধকে দুটো তার দিয়ে একটা ব্যাটারির দুই মাথায় লাগানো হয়েছে। যেহেতু CD অংশটুকু ভূমিসংলগ্ন করা হয়েছে তাই

আমরা বলতে পারব ব্যাটারির নিচ প্রান্তটির বিভব হচ্ছে শূন্য। তাই ব্যাটারির উপরের প্রান্তের বিভব V এবং BC অংশে একটা রোধ, রোধের দুই পাশে বিভব পার্থক্য

$$V - 0 = V$$

কাজেই রোধ যদি R হয় তাহলে এর ভেতর দিয়ে যে I বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে তার মান

$$I = \frac{V}{R}$$

কাজেই ব্যাটারির A থেকে I বিদ্যুৎ বের হয়ে B বিন্দুতে ঢুকে যাচ্ছে। আমরা এই সার্কিটের প্রত্যেকটা বিন্দুতে বিভব আর বিদ্যুৎ বের করে ফেলেছি।

ধরা যাক হুবহু একই সার্কিটে আমরা যদি DC অংশ ভূমি সংলগ্ন না করে AB অংশ ভূমিসংলগ্ন করি তাহলে কী হবে? ব্যাটিরীটা যেহেতু V ভোল্টের তাই A এবং D এর পার্থক্য V থাকতেই হবে, যেহেতু A এর বিভব শূন্য তাই D এর বিভব নিশ্চয়ই $-V$. কাজেই B এবং C এর বিভব পার্থক্য

$$0 - (-V) = V$$

ভেতরকার রোধ R,কাজেই বিদ্যুৎ প্রবাহ :

$$I = \frac{V}{R}$$

অর্থাৎ ঠিক আগের মান, যেটাই হওয়ার কথা। লক্ষ কর পটেনশিয়ালের মান পরিবর্তন হয়েছে পার্থক্য পরিবর্তন হয়নি।

উদাহরণ 11.5: 11.8(a) সার্কিটে A, B, C ও D বিন্দুতে ভোল্টেজ কত?

উত্তর: C ও D বিন্দুতে ভোল্টেজ 0, A বিন্দুতে ভোলেটজ $3V$
B বিন্দুতে ভোল্টেজ বের করার জন্য সার্কিটের কারেন্ট I বের করতে হবে।

$$I = \frac{V}{R} = \frac{3}{1+2} A = 1.0\ A$$

কাজেই A থেকে B বিন্দুতে যে টুকু ভোল্টেজ কম তার পরিমাণ

$$V = RI = 1\Omega \times 1A = 1V$$

কাজেই B বিন্দুর ভোল্টেজ $3V - 1V = 2V$

যেহেতু প্রত্যেকটা বিন্দুর ভোল্টেজ (পটেনশিয়াল) বের হয়ে গেছে, যাচাই করে দেখো সব ক্ষেত্রে ও'মের সূত্র কাজ করছে কি না।

উদাহরণ 11.6: 11.8 (b) ছবির সার্কিটে A, B, C, D এবং E বিন্দুতে ভোল্টেজ কত?

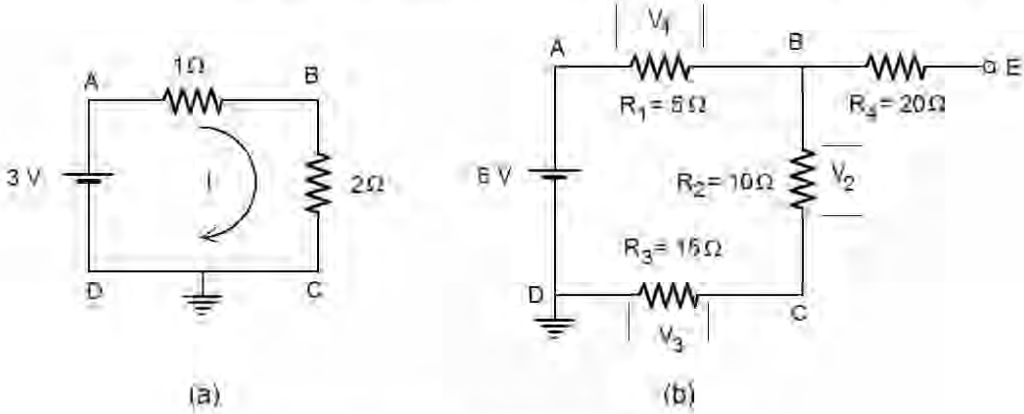

ছবি 11.8: ব্যাটারি ও রেজিস্টর বা রোধ দিয়ে তৈরি দুটি সার্কিট।

উত্তর: D বিন্দুতে ভোল্টেজ 0

A বিন্দুতে ভোল্টেজ $6V$

E বিন্দুতে ভোল্টেজ কত হতে পারে সেটা কেমন করে বের করা যেতে পারে সেটা নিয়ে অনেকেই নানা রকম দুশ্চিন্তা করতে দেখা যায়—আসলে ব্যাপারটা খুবই সহজ! রেজিস্টরের বা রোধের ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলেই ভোল্টেজের পরিবর্তন হয়। সার্কিটের এই অংশে কোনো কারেন্ট প্রবাহের সুযোগ নেই– B দিয়ে রওনা দিয়ে E বিন্দুতে পৌঁছে অন্য কোথাও যেতে পারবে না। কাজেই B এবং E (কিংবা এর ভেতরে যে কোনো বিন্দুতে) ভোল্টেজের কোনো পরিবর্তন নেই, B বিন্দুতে যে ভোল্টেজ E বিন্দুতে একই ভোল্টেজ। B এবং C বিন্দুর ভোল্টেজ বের করার জন্য কারেন্ট বের করতে হবে। কারেন্ট I হলে

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{5\Omega + 10\Omega + 15\Omega} = \frac{1}{5}A$$

কাজেই A থেকে B তে ভোল্টেজের পার্থক্য :

$$V_1 = R_1 I = 5\Omega \times \frac{1}{5} A = 1V$$

কাজেই A বিন্দুতে ভোল্টেজ $6V$ হলে B বিন্দুতে ভোল্টেজ $1V$ কম অর্থাৎ

$6V - V_1 = 6V - 1V = 5V$

B বিন্দুতে যেহেতু ভোল্টেজ $5V$, E বিন্দুতেও ভোল্টেজ V_1, ঠিক একইভাবে

$$V_2 = R_2 I = 10\Omega \times \frac{1}{5} A = 2V$$

কাজেই C বিন্দুর ভোল্টেজ B বিন্দুর ভোলেটজ থেকে $2V$ কম। অর্থাৎ C বিন্দুর ভোল্টেজ $5V - 2V = 3V$

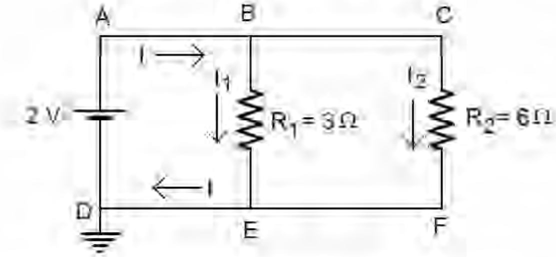

ছবি 11.9: সমান্তরাল ভাবে রাখা দুটি রেজিস্টরের একটি সার্কিট।

D বিন্দুর ভোল্টেজ 0 সেটা আমরা প্রথমেই বলে দিয়েছি, আসলেই সেটা সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখতে পারি। D বিন্দুর ভোল্টেজ C বিন্দুর ভোল্টেজ থেকে V_3 কম।

V_3 হচ্ছে

$$V_3 = R_3 I = 15\Omega \times \frac{1}{5} A = 3V$$

কাজেই D বিন্দুর ভোল্টেজ $3V - 3V = 0$, ঠিক যে রকম ভেবেছিলাম!

উদাহরণ **11.7:** 11.9 ছবিতে দেখানো সার্কিটে I_1 এবং I_2 এর মান কত?

উত্তর: A, B এবং C বিন্দুতে ভোল্টেজ $2V$
D, E এবং F বিন্দুতে ভোল্টেজ 0 ভোল্ট। কাজেই BE রেজিস্টারের ভেতর দিয়ে কারেন্ট

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{2}{3} A$$

CF রেজিস্টারে ভেতর দিয়ে কারেন্ট

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{2}{6} A = \frac{1}{3} A$$

মোট কারেন্ট

$$I = I_1 + I_2 = \frac{2}{3} A + \frac{1}{3} A = 1A$$

11.2.2 তুল্য রোধঃ শ্রেণি বর্তনী

এবারে একটি রোধ যুক্ত না করে সার্কিটে দুটো রোধ লাগানো যাক, যেহেতু C ভূমিসংলগ্ন তাই তার বিভব শূন্য এবং A এর বিভব V, আমরা B এর বিভব কত জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে R_1 এবং R_2 দুটোর ভেতর দিয়েই সমান পরিমাণ বিদ্যুৎ I প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা আমাদের কমন সেন্স ব্যবহার করে বলে দিতে পারি দুটো রোধের যোগফলটি হবে মোট রোধ R এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে $I = V/R$ কিন্তু সেভাবে না লিখে আমরা বরং এটা প্রমাণ করে ফেলি।

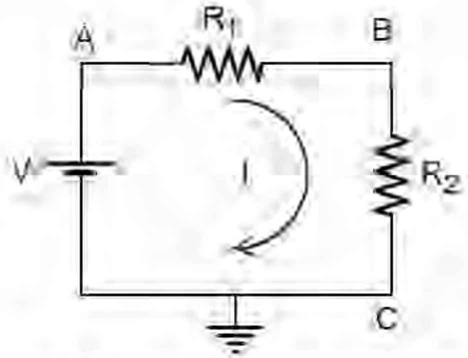

ছবি 11.10: একটি সার্কিটে দুটি রোধ পর পর লাগানো।

যদি ধরে নিই Bএর বিভব V_B তাহলে প্রথম রোধ R_1 এর জন্য লিখতে পারি :

$$I = \frac{V - V_B}{R_1}$$

আবার দ্বিতীয় রোধ R_2 এর জন্য লিখতে পারি

$$I = \frac{V_B - 0}{R_2} = \frac{V_B}{R_2}$$

কাজেই

$$I = \frac{V - V_B}{R_1} = \frac{V_B}{R_2}$$

$$(V - V_B)R_2 = V_B R_1$$

$$V_B(R_1 + R_2) = V R_2$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V$$

কাজেই

$$I = \frac{V_B}{R_2} = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

আমরা R_1 এবং R_2 এই দুটি রোধকে একটি রোধ $R = R_1 + R_2$ হিসেবে কল্পনা করতে পারি:

$$I = \frac{V}{R}$$

যদি এখানে দুটি না হয়ে তিন-চারটি বা আরো বেশি রোধ থাকত (ছবি 11.11) তাহলেও আমরা দেখাতে পারতাম যে সেগুলোকে সম্মিলিতভাবে একটি রোধ R কল্পনা করতে পারি যেটি সবগুলো রোধের

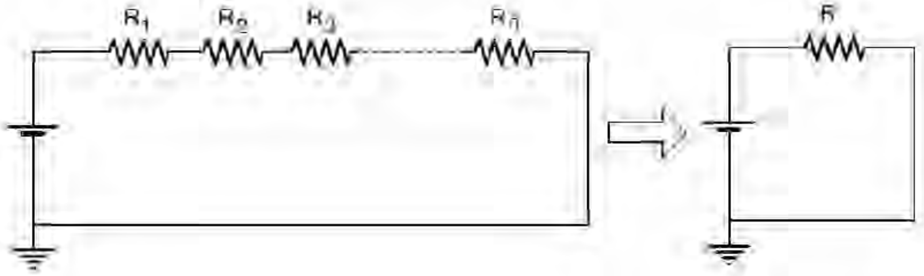

ছবি 11.11: অনেকগুলি পর্যায়ক্রম রেজিস্ট্যান্সকে একটি তুল্য রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কল্পনা করা যায়।

যোগ ফলের সমান। এটাকে তুল্যরোধ বলে। অর্থাৎ যখন কোনো সার্কিটে R_1, R_2, R_3..এ রকম অনেকগুলো রোধ পর পর থাকে (শ্রেণি বর্তনী) তখন তাদের তুল্য রোধ

$$R = R_1 + R_2 + R_3 \dots R_n$$

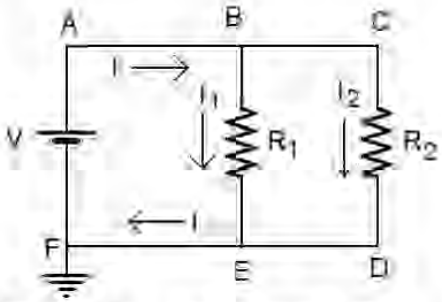

ছবি 11.12: একটি সার্কিটে দুটি রোধ সমান্তরালভাবে রাখা

11.2.3 তুল্য রোধ: সমান্তরাল বর্তনী

এবারে আমরা রোধগুলো পরপর না রেখে সমান্তরাল ভাবে রাখব (ছবি 11.12)।

এই সার্কিটে আমরা বিভিন্ন বিন্দুকে A, B, C, D, E এবং F নাম দিয়েছি। ছবিটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে D, E এবং F বিন্দু ভূমিসংলগ্ন হওয়ায় এই বিন্দুগুলোর বিভব শূন্য। কাজেই A, B এবং C বিন্দুতে বিভব V.

ব্যাটারি থেকে I কারেন্ট বের হয়েছে এই বিদ্যুৎ B বিন্দুতে দুই ভাগে ভাগ হয়ে R_1 এবং R_2 রোধের ভিতর দিয়ে যথাক্রমে I_1 এবং I_2 হিসেবে প্রবাহিত হয়ে E বিন্দুতে একত্রিত হয়ে I হিসেবে ব্যাটারিতে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি সার্কিটে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ বের হয় সার্কিটে ঘুরে আবার ব্যাটারিতে ফিরে যায়– পুরো সার্কিটে এর বাইরে কোনো বিদ্যুতের জন্ম হতে পারে না আবার ক্ষয় হতে পারে না। তাই

$$I = I_1 + I_2$$

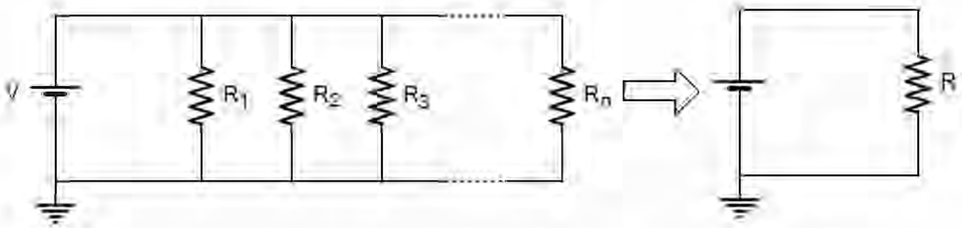

ছবি **11.13:** অনেকগুলি সমান্তরাল রেজিস্ট্যান্সকে একটি তুল্য রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কল্পনা করা যায়।

এবারে আমরা I_1 এবং I_2 কত হবে বের করতে পারি

$$I_1 = \frac{V_B - V_E}{R_1} = \frac{V - 0}{R_1} = \frac{V}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_C - V_D}{R_2} = \frac{V - 0}{R_2} = \frac{V}{R_2}$$

কাজেই

$$I = I_1 + I_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

অর্থাৎ এবারেও আমরা একটা তুল্য রোধ R সংজ্ঞায়িত করতে পারি যেখানে

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

এখানে যদি দুটো না হয়ে আরো বেশি রোধ থাকে (ছবি 11.13) তাহলেও আমরা দেখতে পারি: তূল্য রোধ R হচ্ছে

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \dots \quad \frac{1}{R_n}$$

11.3 তড়িৎ ক্ষমতা (Power)

আমরা যখন বিভব বা পটেনশিয়াল আলোচনা করছিলাম তখন দেখেছি পটেনশিয়াল প্রয়োগ করে চার্জকে সরানো হলে কাজ করা হয় বা শক্তি ক্ষয় হয়। তাই যদি একটা সার্কিটে V বিভব প্রয়োগ করে Q চার্জকে সরানো হয় তাহলে কাজের পরিমাণ বা শক্তি প্রয়োগের পরিমাণ

$$W = VQ\ Joule$$

ক্ষমতা P হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে কাজ করার ক্ষমতা কাজেই, যদি t সময়ে Q চার্জ সরানো হয়ে থাকে তাহলে

$$P = \frac{W}{t} = \frac{VQ}{t} = VI\ \ Watt$$

যদি একটা রোধ P এর ওপর এটা ব্যবহার করি তাহলে ও'মের সূত্র ব্যবহার করে লিখতে পারি যেহেতু

$$V = RI$$

$$P = I^2R$$

কিংবা

$$I = \frac{V}{R}$$

কাজেই

$$P = \left(\frac{V}{R}\right)^2 R = \frac{V^2}{R}$$

একটি রোধের ভেতর যদি t সময় বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তাহলে তার ভেতর Pt শক্তি দেয়া হয়– এই শক্তিটি কোথায় যায়? তোমরা যখন সার্কিটে একটি রোধ ব্যবহার করবে তখন দেখবে তার ভেতর দিয়ে যথেষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ করলে সব সময়েই সেটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অর্থাৎ শক্তিটুকু তাপ শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে।

ফিলামেন্ট দেয়া বাল্বগুলোর প্রচলন ধীরে ধীরে কমে আসছে কারণ এটা দিয়ে আলো তৈরি করার জন্য ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করতে হয়, বিদ্যুৎ শক্তির বড় অংশ তাপ হিসেবে খরচ হয়ে যায় বলে এখানে শক্তির অপচয় হয়। এই ধরনের বাল্বগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই দেখা যায় এখানে কী পরিমাণ তাপ শক্তি তৈরি হয় এবং এই তাপ শক্তি তৈরি হয় I^2R কিংবা $***$ হিসেবে।

উদাহরণ **11.8:** $100\ W$ একটা বাল্বে ফিলামেন্টের রোধ কত?

উত্তর: $220V$ এর বাল্বে $100W$ লেখা কাজেই

$$P = \frac{V^2}{R}$$

অর্থাৎ

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(220)^2}{100}\Omega = 484\Omega$$

এখানে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে?

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{484} = 0.45A$$

অন্যভাবেও বের করা সম্ভব: $P = VI$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{100}{220} = 0.45A$$

11.4 এসি ডিসি (AC and DC)

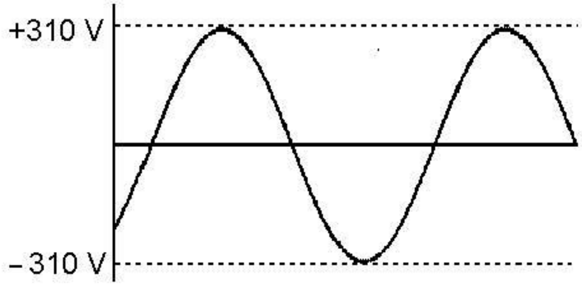

ছবি 11.14: 220 ভোল্ট এসি বিদ্যুতের তরঙ্গ

আমাদের ঘর-বাড়িতে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় দাবি করা হয় তার ভোল্টেজ 220 ভোল্ট। বাসার বিদ্যুৎ বর্ণনা করতে হলে 220 ভোল্ট বলেই কিন্তু থেমে যাওয়া হয় না, তার সাথে সব সময়েই যোগ করা হয় $50\ Hz$, এর অর্থ কী?

বিদ্যুতের বেলায় AC এবং DC এই দুটি শব্দাংশ ব্যবহার করা হয় যেখানে AC হচ্ছে Alternating Current এর সংক্ষিপ্ত রূপ ঠিক সে রকম DC হচ্ছে Direct Current এর সংক্ষিপ্ত রূপ। DC এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে ব্যাটারি যেখানে বিভব একটা নির্দিষ্ট মানে থাকে। $6V\ DC$ অর্থ এর বিভব $6\ V$ এবং সেটার কোনো পরিবর্তন হয় না।

AC এর বেলায় ভোল্টেজের মান কিন্তু অপরিবর্তনীয় নয়, $AC\ 50\ Hz$ অর্থ এর কম্পন $50\ Hz$, প্রতি সেকেন্ডে 50 বার এই ভোল্টেজ পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হচ্ছে। যখন বলা হয় $220\ V\ AC$ তার প্রকৃত অর্থ ভোল্টেজের সর্বোচ্চ মান $\sqrt{2} \times 220\ V$ এবং সর্বনিম্ন মান $-\sqrt{2} \times 220\ V$ যদিও এটি প্রায় $\left(\sqrt{2} \times 220\ V =\right)310V$ পজিটিভ থেকে নেগেটিভ $310V$ ভোল্ট পর্যন্ত যায়। তারপরও এটাকে $220\ V\ AC$ বলা হয় কারণ কোনো রোধে $220\ V\ DC$ লাগানো হলে যে পরিমাণ তাপশক্তি তৈরি করত পরিবর্তনশীল $310V$থেকে $-310V$ পর্যন্ত ভোল্টেজ সেই একই তাপ তৈরি করে।

তোমাদের মনে হতে পারে DC প্রক্রিয়াটি এত সহজ হওয়া সত্ত্বেও কেন AC এর মতো এত জটিল বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়েছে? তোমরা দেখবে এর নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা রয়েছে যার জন্য পৃথিবীর সব জায়গাতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সময় AC হিসেবে সরবরাহ করা হয়।

11.5 বিদ্যুৎ পরিবহন (Electric Supply)

যখন দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিদ্যুৎ পরিবহন করতে হয় তখন সেটি অনেক উচ্চ ভোল্টেজে নিয়ে যাওয়া হয়। বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুতের অপচয় কমানোর জন্য এটি করা হয়। তোমরা জানো তাপ হিসেবে যে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয় সেটি হচ্ছে I^2R কাজেই যদি বৈদ্যুতিক তারে কোনো রোধ না থাকত তাহলে কোনো তাপ হিসেবে শক্তির অপচয় হতো না। প্রতি সেকেন্ডে

বৈদ্যুতিক শক্তি যেহেতু VI হিসেবে যায় তাই যদি পটেনশিয়াল দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে দশগুণ কম কারেন্টে সমান শক্তি প্রেরণ করা সম্ভব। কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে তাপ শক্তি যেহেতু I^2R হিসেবে অপচয় হয় তাই দশগুণ কম কারেন্ট প্রবাহিত হলে 100 গুণ কম তাপ শক্তির অপচয় হবে– কারণ তারের রোধ R এর মান দুইবারই সমান।

এখানে তোমাদের মনে হতে পারে তাপ শক্তির অপচয় $\frac{V^2}{R}$ হিসেবেও লেখা যায় তাই দশগুণ বেশি ভোল্টেজ নেয়া হলে 100 গুণ বেশি তাপ শক্তির অপচয় কেন হবে না? মনে রাখতে হবে আমরা যখন প্রতি সেকেন্ডে তাপ শক্তির অপচয় হিসেবে $\frac{V^2}{R}$ বের করেছিলাম তখন V ছিল রোধের দুই পাশের বিভব পার্থক্য। এখানে আমরা যখন V বলছি সেটি বৈদ্যুতিক তারের দুই পাশের বিভব পার্থক্য নয়– এটি বৈদ্যুতিক তারের বিভবের মান! বৈদ্যুতিক তারের দুই পাশে বিভব প্রায় একই সমান– সেই পার্থক্য ধর্তব্যের মাঝে নয়।

11.6 বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার (Safe Use of Electricity)

বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা এখন এক মুহূর্তও চিন্তা করতে পারি না। আমাদের ঘরে এটি আলো সরবরাহ করে, গরমের সময় ফ্যান চালিয়ে এটা আমাদের শীতল রাখে। এটা দিয়ে আমরা টেলিভিশন চালাই, কম্পিউটার চালাই। খাবার সংরক্ষণ করার জন্য এটা দিয়ে ফ্রিজ চালানো হয়– কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। আমাদের মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে আমরা এই বিদ্যুৎ দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করি। বিলাসী মানুষ বিদ্যুৎ দিয়ে বাসায় এসি ব্যবহার করে, কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে, ইলেকট্রিক হিটার দিয়ে রান্না করে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার গরম করে।

বাসার বাইরে স্কুলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, খেতে খামার কারখানা, হাসপাতাল এসবের কথা বিবেচনা করলে আমরা বিদ্যুতের ব্যবহারের কথা বলে শেষ করতে পারব না। আমাদের দেশে সাধারণত বিদ্যুৎ $220\,V\ AC$ হিসেবে সরবরাহ করা হয়, এই বিদ্যুৎ- এর পরিমাণ মানুষকে ইলেকট্রিক শক দিতে পারে এমনকি সেই শকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে তাই সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন ভুলেও কখনো কেউ সরাসরি এর সংস্পর্শে চলে না আসে।

সরাসরি হৃৎপিন্ডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে গেলে মাত্র $10\,mA$ বিদ্যুতেই মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। ব্যবহার করার জন্য আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটি AC এবং AC বিদ্যুৎ DC বিদ্যুৎ থেকে প্রায় 5 গুণ বেশি ক্ষতিকর। শুকনো অবস্থায় মানুষের চামড়ার রোধ প্রায় $100{,}000\,\Omega$ থেকে $500{,}000\,\Omega$ হলেও ভেজা অবস্থায় সেটি হাজার গুণ কমে আসে। কাজেই ও'মের সূত্র ব্যবহার করে আমরা দেখাতে পারি আমাদের দেশের $220V$ শরীরের ভেতর দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার মতো

বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে। যখন কেউ ভেজা মাটিতে ভেজা পা নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সেটি হয় সবচেয়ে বিপজ্জনক।

যখন কেউ হঠাৎ করে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় তখন শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে হাত পা নাড়াতে পারে না, তাই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার কথা বুঝতে পারলেও সেখান থেকে সরে আসতে পারে না।

আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি সেটি যথেষ্ট বিপজ্জনক হতে পারে কিন্তু সাধারণ সতর্কতা কবজায় রাখলেই নিরাপদে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়– এবং সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিরাপদে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার করার জন্য নিচের কয়েকটা বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন:

(a) বিদ্যুৎ অপরিবহক আস্তরণ

বিদ্যুতের খোলা তার বিপজ্জনক তাই সবসময়েই সেটা প্লাস্টিক বা অন্য কোনো ধরনের বিদ্যুৎ অপরিবাহী একটা আস্তরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। যদি কোনো কারণে শর্ট সার্কিট হয় অর্থাৎ সরাসরি কোনো রোধ ছাড়াই পজিটিভ এবং নেগেটিভ স্পর্শ করে ফেলে তখন ও'মের সূত্র অনুযায়ী অনেক বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়, তার গরম হয়ে যায়, প্লাস্টিক পুড়ে গিয়ে আগুন পর্যন্ত ধরে যায়। তাই সব সময়েই সতর্ক থাকতে হয় যেন বৈদ্যুতিক তারের ওপর অপরিবাহী আস্তরটণটা অবিকৃত এবং অক্ষত থাকে।

(b) ভালো সংযোগ

যখন কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সময় অনেক বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তখন বৈদ্যুতিক সংযোগ গুলো খুব ভালো হতে হয়। বৈদ্যুতিক সংযোগ ভালো না হলে সেখানে বাড়তি রোধ তৈরি হয় এবং I^2R হিসেবে সেটা উত্তপ্ত হয়ে যেতে পারে, উত্তপ্ত হয়ে অপরিবাহী আস্তরণ পুড়ে যেতে পারে, বৈদ্যুতিক সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

(c) আর্দ্রতা

পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী, কাজেই কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটে পানি ঢুকে গেলে সেখানে শর্ট সার্কিট হয়ে বিপজ্জনক অবস্থা হতে পারে। হেয়ার ড্রায়ার বা ইস্ত্রির মতো জিনিস পানির কাছাকাছি ব্যবহার করা খুব বিপজ্জনক, হঠাৎ করে পানিতে পড়ে গেলে এবং সেই পানি কেউ স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে অনেক বড় বিপদ হতে পারে।

(d) সার্কিট ব্রেকার এবং ফিউজ

বিদ্যুতের বড় বড় দুর্ঘটনা হয় যখন হঠাৎ করে কোনো একটা ক্রুটির কারণে অনেক বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। হঠাৎ করে বিপজ্জনক বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করার জন্য সার্কিট ব্রেকার কিংবা ফিউজ ব্যবহার করা হয়। সার্কিট ব্রেকার এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এর ভেতর থেকে নিরাপদ সীমার বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলেই সার্কিট ব্রেক (বিচ্ছিন্ন) করে দেয়। ফিউজ সে তুলনায় খুবই সরল একটা পদ্ধতি, একটি যন্ত্রে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেটি যন্ত্রে ঢোকানোর আগে সরু একটা তারের ভেতর দিয়ে নেয়া হয়। যদি কোনো কারণে বেশি বিদ্যুৎ যাওয়ার চেষ্টা করে ফিউজের সরু তার সেই (রোধ বেশি, কাজেই I^2R বেশি অর্থাৎ তাপ বেশি) বিদ্যুতের কারণে উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে ফেলে।

(e) সঠিক সংযোগ

বিদ্যুৎ সরবরাহে সব সময়েই দুটি তার থাকে একটিতে উচ্চ বিভব (জীবন্ত বা Live) অন্যটি ভোল্টেজহীন নিরপেক্ষ (Neutral)। একটা যন্ত্র যখন ব্যবহার করা হয় তখন Live তার থেকে বিদ্যুৎকে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিরপেক্ষ তার দিয়ে তার উৎসে ফিরিয়ে নেয়া হয়। ভোল্টেজহীন নিরপেক্ষ তারটি নিরাপদ কিন্তু উচ্চ বিভবের তারটিকে সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হয়। কোনো যন্ত্রপাতিতে যখন একটা সুইচ দিয়ে বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া হয় তখন সুইচটি উচ্চ ভোল্টেজের তার কিংবা নিরপেক্ষ তার দুটিতেই দেয়া যায়। বুদ্ধিমানের কাজ হয় যাখন সুইচটি লাগানো হয় উচ্চ ভোল্টেজের তারের সাথে তাহলে শুধুমাত্র যখন যন্ত্রটি চাল করা হয় তখনই উচ্চ ভোল্টেজ যন্ত্রের ভেতর প্রবেশ করে। যখন যন্ত্রটি বন্ধ থাকে তখন যন্ত্রের ভেতর কোথাও উচ্চ ভোল্টেজ থাকে না!

(f) গ্রাউন্ড

তোমরা যদি তোমাদের বাসায় স্কুলে কিংবা অন্য কোথাও বিদ্যুতের সংযোগ লক্ষ করে থাক তাহলে দেখবে সব সময় অন্তত দুটি সংযোগ থাকে একটি উচ্চ ভোল্টেজ অন্যটি নিউট্রাল। কিন্তু সেই বিদ্যুতের সাথে যদি মূল্যবান কোনো যন্ত্র যুক্ত করা হয় (যেমন কম্পিউটার, ফ্রিজ) তাহলে দেখবে সেখানে উচ্চ বিভব আর নিউট্রাল ছাড়াও তৃতীয় একটা সংযোগ থাকে, যেটি হয়ে ভূমি সংযোগ বা ground. সাধারণত এটা যন্ত্রপাতির ঢাকনা বা কাঠামোতে লাগানো থাকে। যদি কোনো দুর্ঘটনায় যন্ত্রপাতিটি বিদ্যুতায়িত হয়ে যায় তাহলে ঢাকনা বা কাঠামোটি থেকে ভূমিতে সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়ে যায়– বিদ্যুতের এই প্রবাহের কারণে সাধারণত ফিউজ পুড়ে যন্ত্রটি বিপদমুক্ত হয়ে যায়। কাজেই কেউ যদি ভুলে যন্ত্রটি স্পর্শ করে তার ইলেকট্রিক শক খাওয়ার আশংকা থাকে না।

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

1. ক্যাপাসিটরকে কি ব্যাটারি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব?
2. ফিলামেন্ট যুক্ত লাইট বাল্বের ফিলামেন্ট ও'মের সূত্র মানছে কি না পরীক্ষা করা কঠিন কেন?
3. বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহ, যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় তখন ইলেকট্রনগুলোর গতি কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম থাকে। কিন্তু বিদ্যুৎ মুহূর্তের মাঝে প্রবাহিত হয়– কীভাবে?
4. সমান বিভব পার্থক্যে বেশি রোধ বেশি তাপ তৈরি করে নাকি কম রোধ বেশি তাপ তৈরি করে?

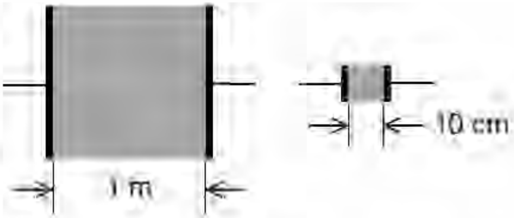

ছবি 11.15: 1 মিটার এবং 10 সে. মি. বর্গের দুটি সমাকৃতির দুটি রেজিস্টর

5. বৈদ্যুতিক তারে কাক বা পাখিকে মারা যেতে দেখা যায় না– কিন্তু বড় বাদুড় প্রায়ই মারা যায়– কারণ কী?

গাণিতিক সমস্যা:

1. অসীম সংখ্যক 1Ω রেজিস্টারের সবগুলো ব্যবহার করে 2Ω রেজিস্টার তৈরি করো।
2. তোমার বন্ধু $1mm$ পুরু নাইক্রোমের পাত দিয়ে $1m \times 1m$ বর্গের (ছবি 11.15) একটি রেজিস্টর তৈরি করেছে। তুমি $1cm \times 1cm$ বর্গের একটি রেজিস্টর তৈরি করেছ। তোমার বন্ধুর তৈরি রেজিস্টরের মান কত? তোমার রেজিস্টরের মান কত?

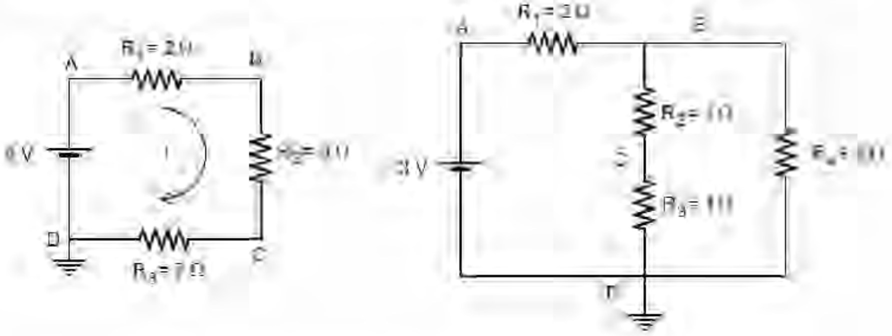

ছবি 11.16: ব্যাটারী ও রেজিস্টারসহ সংযুক্ত দুটি সার্কিট।

3. 11.16 (a) ছবিতে দেখানো সার্কিটে যদি D বিন্দুকে ভূমিসংলগ্ন করা হয় তাহলে A, B, C ও D বিন্দুতে ভোল্টেজ কত? I এর মান কত?
4. 11.16 (a) ছবিতে দেখানো সার্কিটে D বিন্দুকে ভূমিসংলগ্ন না করে যদি C বিন্দুকে ভূমিসংলগ্ন করা হয় তাহলে ভোল্টেজ কত? I এর মান কত?
5. 11.16 (b) ছবিতে দেখানো সার্কিটে D বিন্দুকে ভূমিসংলগ্ন করা হলে সার্কিটে A, B, C ও D বিন্দুতে ভোল্টেজ কত?

দ্বাদশ অধ্যায়
বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া
(Magnetic Effects of Current)

Enrico Fermi (1901-1954)

এনরিকো ফারমি

এনরিকো ফারমি একজন ইতালিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর শিকাগো-পাইল 1 তৈরি করেছিলেন। তাঁর কোয়ান্টাম থিওরি, নিউক্লিয়ার এবং পার্টিকেল থিওরিতে অনেক বড় অবদান রয়েছে। তিনি মাত্র 37 বছর বয়সে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকার জন্য আমেরিকাতে যে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হয় তিনি সেখান অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে তাঁর নামটি বোজনের পাশাপাশি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কণা ফারমিওনের মাঝে বেঁচে থাকবে।

12.1 চুম্বক (Magnet)

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই চুম্বক দেখেছ, একটা চুম্বক লোহা জাতীয় পদার্থের কাছে আনলে সেটা লোহাকে আকর্ষণ করে। চুম্বক এবং লোহার মাঝখানে কিছু নেই কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি সেটাকে টেনে আনছে সেটি প্রথমবার দেখার পর সবারই এক ধরনের বিস্ময় হয়। যারা দুটি চুম্বক হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ পেয়েছ তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ (ছবি 12.1) যে চুম্বকের দুটি মেরু এবং মেরু দুটি এক ধরনের হয়ে থাকে তাহলে সেটা বিকর্ষণ করে আর মেরু দুটি যদি ভিন্ন ধরনের হয় তাহলে আকর্ষণ করে। চুম্বকের মেরু দুটিকে উত্তর আর দক্ষিণ মেরু নাম দেয়া হয়েছে কারণ দেখা গেছে একটা চুম্বককে ঝুলিয়ে দিলে সেটা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকে, যে অংশটুকু উত্তর দিকে থাকে সেটার নাম উত্তর মেরু– যেটা

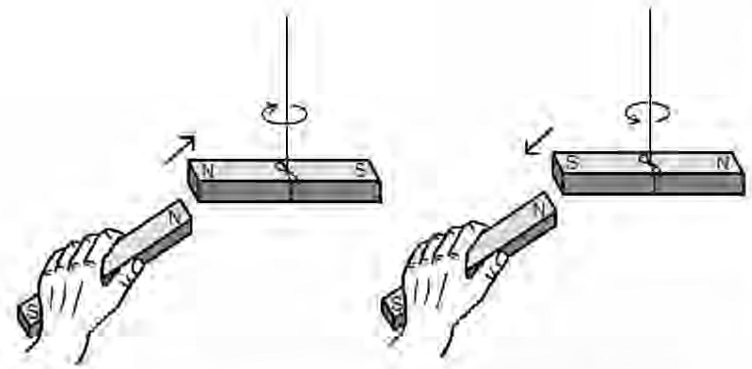

ছবি 12.1: চুম্বকের বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ ও সমমেরুতে বিকর্ষণ হয়।

দক্ষিণ দিক বরাবর থাকে সেটা দক্ষিণ মেরু। এটা ঘটে তার কারণ পৃথিবীর একটা চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, কোনো চুম্বক ঝোলালে সেই ক্ষেত্র বরাবর চুম্বকটা নিজেকে সাজিয়ে নেয়।

দুটো চুম্বক কেমন করে একে অন্যকে আকর্ষণ করে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতেই পারি কিন্তু সবার আগে জানা দরকার চুম্বকের যে বল সেটা আসে কোথা থেকে?

12.2 বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া (Magnetic Effect of Current)

যারা সাধারণভাবে চুম্বক হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে তার নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারবে না যে এটি বিদ্যুৎ থেকে আলাদা কিছু নয় এবং বিদ্যুতের প্রবাহ দিয়ে চুম্বক তৈরি করা যায়। একটা চার্জ থাকলে তার

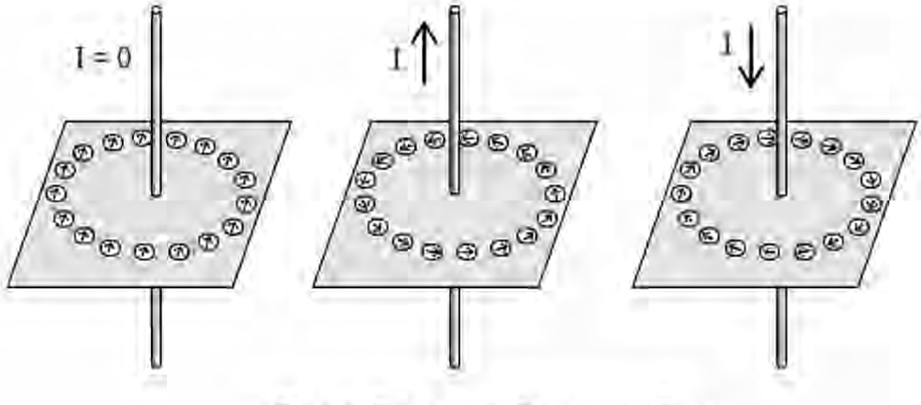

ছবি 12.2: বিদ্যুৎ প্রবাহকে ঘিরে কম্পাসের দিক।

পাশে যেমন তড়িৎ ক্ষেত্র থাকে ঠিক সে রকম একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেই তারের চার পাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। ধরা যাক তুমি একটা কার্ডবোর্ডের মাঝখান দিয়ে একটা তার ঢুকিয়েছ এবং কার্ডের ওপর অনেকগুলো ছোট ছোট কম্পাস রেখেছ (ছবি 12.2)। কম্পাসগুলো অবশ্যই

উত্তর দক্ষিণ বরাবর থাকবে ঠিক যে রকম থাকার কথা। এখন যদি এই তারের ভেতর দিয়ে কোনোভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে পার (মোটামুটি শক্তিশালী) তাহলে তুমি অবাক হয়ে দেখবে হঠাৎ করে সবগুলো কম্পাস একটা আরেকটার পেছনে সারিবদ্ধভাবে নিজেদের সাজিয়ে নেবে– তোমার স্পষ্ট অনুভূতি হবে যে এই বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য তারকে ঘিরে একটা বৃত্তাকার চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

তুমি যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দাও তাহলে আবার সবগুলো ছোট ছোট কম্পাস উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হয়ে যাবে। এবারে তুমি যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পাল্টে দাও তাহলে দেখবে আবার কম্পাসগুলো নিজেদের সাজিয়ে নেবে কিন্তু এবারে বৃত্তটায় কম্পাসের দিকটা হবে উল্টো দিকে! তার কারণ বিদ্যুৎ প্রবাহ সব সময় তাকে ঘিরে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী করে।

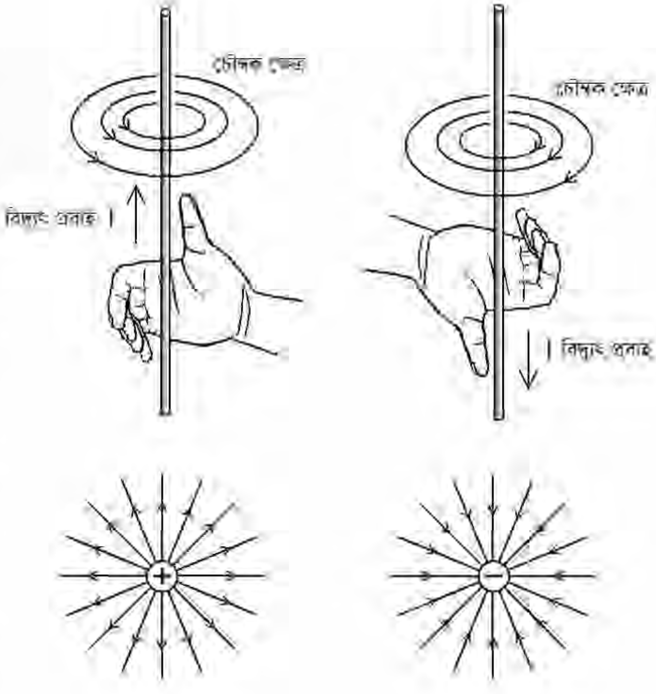

ছবি 12.3: বিদ্যুত প্রবাহকে ঘিরে তৈরী চুম্বক ক্ষেত্র। চুম্বক ক্ষেত্রের শুরু কিংবা শেষ নেই (উপরের ছবি)। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে শুরু কিংবা শেষ থাকে (নিচের ছবি)।

একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার জন্য তৈরি হওয়া চৌম্বক রেখাগুলোর দিক কোন দিকে হবে সেটা ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বের করা যায়। বুড়ো আঙুলটা যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক দেখায় তাহলে হাতের অন্য আঙুলগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকটি নির্দেশ করে।

বুঝতেই পারছ চার্জ রাখা হলে আমরা যে রকম তার জন্য তড়িৎ রেখা কল্পনা করে নিয়েছিলাম, বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে সেটা বোঝানোর জন্য চৌম্বক রেখা কল্পনা করে নেয়া যায়। তোমাদের আবার মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ছবিতে পজিটিভ চার্জ, নিগেটিভ চার্জ, নিচ থেকে উপরে বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং ওপর থেকে নিচে বিদুৎ প্রবাহের জন্য যে তড়িৎ রেখা এবং চৌম্বক রেখা হতে পারে সেটা এঁকে দেখানো হলো। (ছবিতে 12.3) চৌম্বক রেখার সাথে তুলনা করার জন্যে পজিটিভ এবং নিগেটিভ চার্জের তড়িৎ রেখা দেখানো হলো।

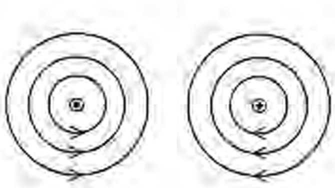

ছবি 12.4: বিদ্যুত প্রবাহী তারকে ঘিরে চৌম্বক ক্ষেত্র।

তোমরা যদি তড়িৎ রেখা এবং চৌম্বক রেখাগুলো তুলনা কর তাহলে একটা চমকপ্রদ বিষয় আবিষ্কার করবে। তড়িৎ রেখার শুরু আছে (পজিটিভ) কিংবা শেষ (নিগেটিভ) আছে। পজিটিভ চার্জ হলে সেখান থেকে তড়িৎ রেখা শুরু- হয় এবং নিগেটিভ চার্জ থাকলে সেখানে তড়িৎ রেখা শেষ হয়। কিন্তু চৌম্বক রেখার কোনো শুরু কিংবা শেষ নেই! চৌম্বক রেখা সব সময়ে পূর্ণাঙ্গ! এটি পদার্থবিজ্ঞানের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

উদাহরণ 12.1: 12.4 ছবিতে দেখানো উপায়ে বিদ্যুৎ বইয়ের ভেতর থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে, চৌম্বক ক্ষেত্র কোনটি সঠিক?

উত্তর: বাম দিকেরটি সঠিক।

12.2.1 কয়েল

একটা তার যদি সোজা থাকে এবং তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে চৌম্বক রেখা কেমন হয় সেটা 12.3 ছবিতে দেখানো হয়েছিল। যদি তারটা সোজা না হয়ে বৃত্তাকার হয় তাহলে চৌম্বক রেখা কেমন হবে? 12.5 ছবিতে সেটা দেখানো হয়েছে। বুঝতেই পারছ বিদ্যুৎ প্রবাহ যত বেশি হবে চৌম্বক ক্ষেত্রটি তত শক্তিশালী হবে। একটা তারের ভেতর দিয়ে কতখানি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা যায় তার একটা সীমা আছে, তারটা I^2R হিসেবে গরম হয়ে যায়– তাছাড়াও সবচেয়ে বেশি কতোখানি বিদ্যুৎ প্রবাহ দেয়া সম্ভব সেটা বিদ্যুতের উৎসের ওপর নির্ভর করে। তাই যদি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে হয় তাহলে একটা মাত্র বৃত্তাকার লুপ- এর ওপর নির্ভর না করে অপরিবাহী আস্তরণ দিয়ে ঢাকা তার দিয়ে অনেকবার প্যাঁচিয়ে একটা কুন্ডুলী বা কয়েল তৈরি করা হয়। সেই কুন্ডুলী দিয়ে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। কয়েলের প্রত্যেকটা লুপই তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করবে, তাই সম্মিলিত চৌম্বক ক্ষেত্র হবে অনেক গুণ বেশি।

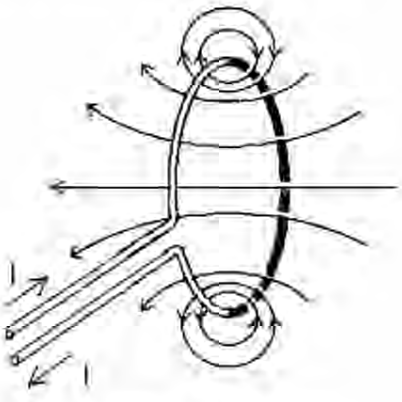

ছবি 12.5: লুপের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে তৈরি চৌম্বক ক্ষেত্র।

ছবি 12.6: লুপের ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহ করলে ডান হাতের নিয়ম ব্যবহার করে চৌম্বক ক্ষেত্র বের করা যায়।

বৃত্তাকার তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার চৌম্বক ক্ষেত্র কোন দিকে হবে সেটাও ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বের করা যায়। বুড়ো আঙুলটি হবে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক যদি অন্য আঙুলগুলো বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক দেখায়। একটা তারের কুন্ডলী আসলে দণ্ড চুম্বকের মতো কাজ করে এবং বুড়ো আঙুলের দিকটা হবে এই চুম্বকের উত্তর মেরু।

একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার জন্য তৈরি হওয়া চৌম্বক রেখাগুলোর দিক কোন দিকে হবে সেটা ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বের করা যায়। বুড়ো আঙুলটা যদি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক দেখায় তাহলে হাতের অন্য আঙুলগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকটি নির্দেশ করে।

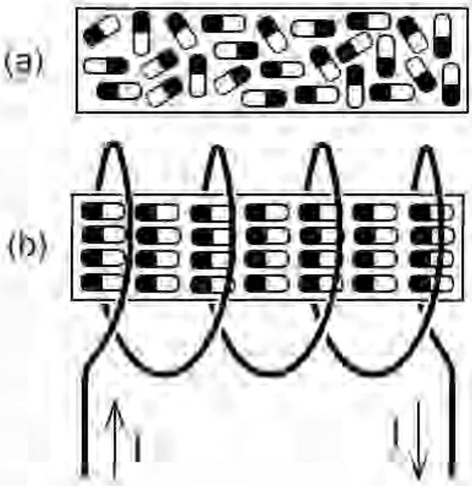

ছবি 12.7: বিদ্যুত প্রবাহের কারণে এলোমেলোভাবে থাকা ছোট ছোট চুম্বকগুলি সারিবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী করে।

12.2.2 তড়িৎ চুম্বক

শুধু মাত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায় তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব যদি এই কুন্ডলীর ভেতর এক টুকরো লোহা ঢুকিয়ে দেয়া যায়। লোহা, কোবাল্ট আর নিকেল এই তিনটি ধাতুর বিশেষ চৌম্বকীয় ধর্ম আছে। এ গুলোকে এলোমেলোভাবে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট চুম্বক হিসেবে কল্পনা করা যায়। যেহেতু সবগুলো ছোট ছোট চুম্বক এলোমেলোভাবে আছে তাই পুরো লোহার টুকরোটা কোনো চুম্বক হিসেবে কাজ করে না।

ছবি 12.8: স্পিকারে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু যখন এটাকে একটা কয়েল বা সলিনয়েডের মাঝে ঢোকানো হয় এবং সেই সলিনয়েডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তখন সেটা যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে সেটা লোহার টুকরার ছোট ছোট চুম্বকগুলোকে সারিবদ্ধ করে ফেলে তাই বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য তৈরি চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে সাথে লোহার নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র একত্র হয়ে অনেক শক্তিশালী একটা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায় (ছবি

12.7)। মজার ব্যাপার হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করার সাথে সাথে লোহার টুকরোর ভেতরকার সারিবদ্ধ ছোট ছোট চুম্বকগুলো সব আবার এলোমেলো হয়ে যাবে এবং পুরো চৌম্বক ক্ষেত্র অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এভাবে তৈরি করা চুম্বককে বলা হয় তড়িৎ চুম্বক। তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহারের কোনো শেষ নেই। স্পিকারে বা এয়ারফোনে যে শব্দ শোনা যায় সেখানে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়। (ছবি 12.8) এখানে শব্দের কম্পন এবং তীব্রতার সমান বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানো হয় সেই বিদ্যুৎ একটা তড়িৎ চুম্বকের চৌম্বকত্ব শব্দের কম্পন বা তীব্রতার উপযোগী করে তৈরি করে সেটা একটা ডায়াফ্রামকে কাঁপায় এবং সেই ডায়াফ্রাম সঠিক শব্দ তৈরি করে।

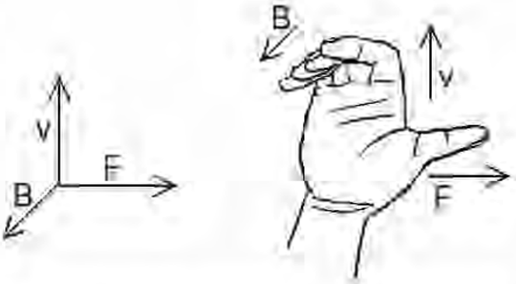

ছবি 12.9: চুম্বক ক্ষেত্রে চার্জ ধাবমান হলে একটি বল অনুভব করে। বলের দিক ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বের করা সম্ভব।

ছবি 12.10: চৌম্বক ক্ষেত্রে ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের গতির চিহ্ন। ইলেকট্রন এবং পজিট্রন তাদের ভিন্ন চার্জের জন্য যাবার সময় দুটি ভিন্ন দিকে বল অনুভব করে। তাই ইলেকট্রনের নিগেটিভ চার্জ সেটি এক দিকে বল অনুভব করে, পজিট্রনের পজিটিভ চার্জ তাই সেটি অন্য দিকে বল অনুভব করে।

12.3 তড়িৎ চৌম্বকীয় বল

আমরা জানি তড়িৎ ক্ষেত্রে একটা চার্জ রাখা হলে সেটা একটা বল অনুভব করে এবং আমরা সেটাকে কুলম্ব বল বলে থাকি। আমরা বলেছি চৌম্বক ক্ষেত্রে আরেকটা চুম্বক রাখলে সেটি আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বল অনুভব করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রে একটা চার্জ রাখা হলে সেটি কি কোনো বল অনুভব করে?

এর উত্তরটি খুবই বিস্ময়কর– চার্জটি যদি স্থির থাকে তাহলে কোনো বল অনুভব করে না কিন্তু চার্জটি যদি চলমান হয় অর্থাৎ চার্জের যদি বেগ থাকে তাহলে একটা বল অনুভব করে। এই বলটি চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকেও নয়, বেগের দিকেও

নয় – এই বলটি চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বেগ দুটোর সাথেই লম্বভাবে কাজ করে। কী বিচিত্র!

যদি বেগ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র একে অপরের ওপর লম্ব হয় তাহলে এই বলের পরিমাণ qvB যেখানে q হচ্ছে চার্জ, v হচ্ছে বেগ এবং B হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা। 12.9 ছবিতে দেখানো ডান হাতের নিয়ম ব্যবহার করে সেই বলটিরর দিক বের করতে পারবে।

তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্রে ইলেকট্রন এবং পজিট্রন যাবার সময় ভিন্ন দিকে বল অনুভব করে, কারণ ইলেক্ট্রনের চার্জ নেগেটিভ কিন্তু তার প্রতি পদার্থ পজিট্রনের চার্জ পজিটিভ তাই ইলেকট্রন যে দিকে বেঁকে যাচ্ছে পজিট্রন বেঁকে যায় তার উল্টো দিকে। (ছবি 12.10)

ছবি 12.11: চৌম্বক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে অনুভূত বল।

উদাহরণ 12.2: একটি তার চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করালে সেটি কোন দিকে বল অনুভব করাবে?

উত্তর: আমরা ডান হাতের নিয়ম (ছবি 12.11) থেকে জানি হাতের চার আঙুলের দিকটি যদি চার্জের বেগ, আঙুলগুলো $90°$তে ভাঁজ করে আনার পর দিক যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক হয় তাহলে বুড়ো আঙুলটি বল দেখাবে।

ছবিতে I এর দিকে চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে কাজেই সেটি v এর দিক, চৌম্বক ক্ষেত্র N থেকে S এর দিকে কাজেই ডান হাতের নিয়ম দিয়ে বলতে পারি বলটি উপরের দিকে।

12.3.1 তড়িৎ প্রবাহী তারের ওপর চুম্বকের প্রভাব

আমরা জানি একটা চুম্বক অন্য চুম্বকের সম মেরুতে বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুকে আকর্ষণ করে। আবার একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেটি তাকে ঘিরে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। কাজেই একটা চৌম্বক ক্ষেত্রে যদি একটা তার রাখা হয় এবং সেই তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ

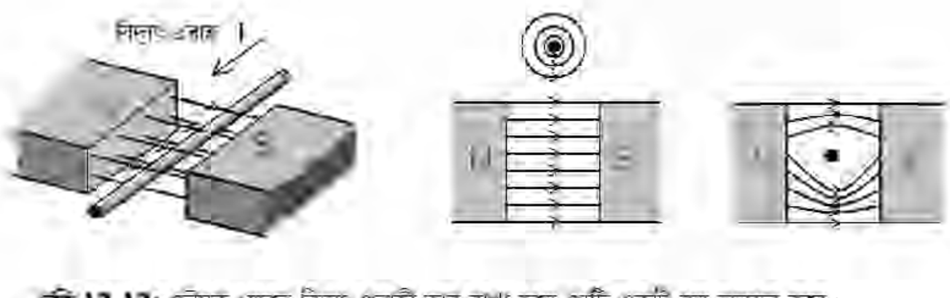

ছবি 12.12: চৌম্বক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহী তার রাখা হলে সেটি একটি বল অনুভব করে।

প্রবাহিত করা হয় তাহলে তারটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী করার কারণে একটি বল অনুভব করে। 12.12 ছবিতে একটা চুম্বকের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া চৌম্বক রেখা এবং তার মাঝে একটা তারকে দেখানো হয়েছে, তারটি কাগজের ভেতর থেকে উপরের দিকে বের হয়ে এসেছে। তারের ভেতর দিয়ে নিচ থেকে উপরে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে এটি তাকে ঘিরে বৃত্তাকার চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ যাওয়া চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হয়ে চৌম্বক রেখাকে পুনর্বিন্যাস করবে। তারের নিচে বেশী সংখ্যক চৌম্বক রেখা এবং উপরে কম সংখ্যক চৌম্বক রেখার তৈরি হবে– যেটি তারটিকে উপরের দিকে ঠেলে দিবে।

যদি তারটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করা হয় তাহলে তারকে ঘিরে বৃত্তাকার চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পাল্টে যাবে এবং তখন তারের উপর চৌম্বক রেখার ঘনত্ব বেড়ে যাবে যেটি তারটিকে নিচের দিকে ঠেলে দিবে।

ছবি 12.13: বৈদ্যুতিক মোটর একটি স্থায়ী চুম্বকের ভেতর দিয়ে এমনভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ করানো হয় যেন সব সময়েই এটি ঘুরতে থাকে

12.3.2 ডিসি মোটর

একটি তারের ভেতর দিয়ে খুব বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা যায় না তাই চৌম্বক ক্ষেত্রে তার ওপর শক্তিশালী বল প্রয়োগ করা যায়না। কিন্তু যদি অনেকগুলো পাক দিয়ে একটা তারের কুণ্ডলী তৈরি করা যায় এবং তার ভেতরে একটা লোহার টুকরো বা আর্মেচার রাখা হয় তাহলে তারের ভেতর হালকা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হলেই শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। এই কয়েলকে আমরা একটা দণ্ড চুম্বক হিসেবে কল্পনা করে অন্য চৌম্বক ক্ষেত্রে তাকে রাখা হলে সেটি কী ধরনের বলের মুখোমুখি হবে এবং সে কারণে সেটির কোন দিকে গতি হবে সেটা বিশ্লেষণ করতে পারি। 12.13 ছবিতে এ রকম একটা কয়েল চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনদিকে বল অনুভব করবে দেখানো হয়েছে। কয়েলটিকে যদি তার কেন্দ্র বরাবর একটা

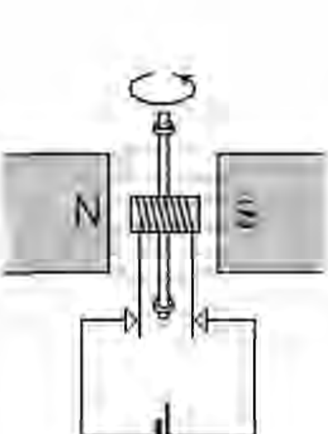

ছবি 12.14: একটি বৈদ্যুতিক মোটর

অক্ষে ঘুরতে দেয়া হয় তাহলে এটি পরের ছবির মতো অবস্থানে যাবার চেষ্টা করবে।

যদি কোনো বিশেষ অবস্থা তৈরি করে পরের অবস্থানে যাবার সাথে সাথে কয়েলের বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে দেয়া যায় তাহলে সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে কয়েল দিয়ে তৈরি দণ্ড চুম্বকটির উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে আর দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুতে পাল্টে যাবে তাই আবার সেটি সরে যাবার চেষ্টা করবে অর্থাৎ এটি একটি ঘূর্ণন বল অনুভব করবে! এটি চেষ্টা করবে পরের স্থায়ী অবস্থানে পৌঁছাতে কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে এটার বিদ্যুতের দিক পরিবর্তন করে দিলে এটি সেখানে থেমে যাবে না– আবার ঘুরতে শুরু করবে। তাই যখনই এটা একটা স্থায়ী অবস্থানে পৌঁছাবে তখনই যদি এটাতে এমনভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ করানো হয় যে এটি একটি ঘূর্ণন বল অনুভব করে তাহলে এটি ঘুরতেই থাকবে।

বিদ্যুতের দিক পরিবর্তন করার জন্য খানিকটা যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করতে হয়, মূল কয়েল যে অক্ষে ঘুরতে থাকে সেই ঘূর্ণায়মান অক্ষটির দুই পাশে কয়েলের দুটি তার এমনভাবে বসানো হয় যেন সেটি মূল বিদ্যুৎ প্রবাহের টার্মিনালকে স্পর্শ করে থাকে– সেটা যখনই স্পর্শ করে তখনই এমনভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করবে যেন সব সময়েই সেটি কয়েলটিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য (ছবি 12.14) এটাকে সহজভাবে দেখানো হয়েছে। সত্যিকার মোটরে আর্মেচারকে ঘিরে বেশ অনেকগুলো কয়েল থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটা কয়েল তারা নিজের মতো করে কমিউটার থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ পায় এবং আর্মেচারটি ঘুরতে থাকে।

12.3.3 এসি মোটর

ডিসি মোটরে আর্মেচার এবং কয়েলের ঘূর্ণনের জন্য প্রতি ঘূর্ণনেই বিদ্যুতের সংযোগ কেটে নূতন করে দিতে হয় যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়। এসি মোটরে সেটা প্রয়োজন হয় না তার কারণ তোমরা জান। এসি ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে সেকেন্ডে পঞ্চাশবার বিভব দিক পরিবর্তন করে। তাই আর্মেচারটি নিজে নিজেই তার চুম্বকের দিক পরিবর্তন করে ! ঘূর্ণনটি এমনভাবে সাজানো হয় যেন যখনই চুম্বকের দিক পরিবর্তন হয় তখন যেন সেটি এমন একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে থাকে যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রটি আর্মেচারকে সরিয়ে দিয়ে ঘুরানোর চেষ্টা করবে।

12.4 তড়িৎ চৌম্বক আবেশ (Electromagnetic Induction)

আমরা আমাদের চারপাশে অসংখ্য যন্ত্রপাতিকে ঘুরতে দেখি তাই আমাদের মনে হতে পারে এটাই বুঝি চুম্বক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অবদান! আসলে চুম্বকের এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় অবদান কিন্তু তার তড়িৎ আবেশ– অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা। বিজ্ঞানী ওয়েরস্টেড প্রথমে দেখিয়েছিলেন কোনো একটা পরিবাহী তারের লুপের ভেতর যদি চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করা

হয় তাহলে সেই লুপের ভেতর তড়িচ্চালক শক্তি (EMF) তৈরি হয় যেটা সেই লুপের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করাতে পারে। এই বিষয়টি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ জেনারেটর তৈরি করা হয়েছে যেখানে পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ তৈরি হয়।

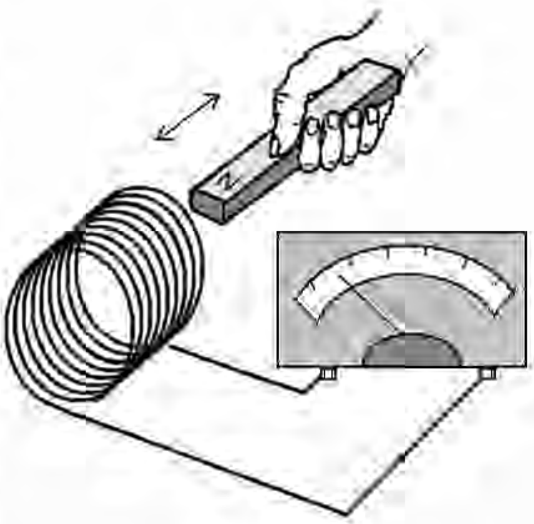

ছবি 12.15: কয়েলের ভেতর চুম্বক প্রবেশ করানোর সময় বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখা যায়।

একটা কয়েলের দুই মাথা যদি একটা এমিটারে লাগানো হয় এবং যদি সেই কয়েলের ভেতর একটা দণ্ড চুম্বক ঢোকানো হয় (ছবি 12.15) তাহলে আমরা ঠিক ঢোকানোর সময় এমিটারে এক ঝলক বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখতে পাব। আমরা যখন চুম্বকটা টেনে বের করে আনব তখন আবার আমরা এমিটারে এক ঝলক বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখব– তবে এবারে উল্টো দিকে। আমরা যদি চুম্বকের মেরু পরিবর্তন করি তাহলে এমিটারেও বিদ্যুতের দিক পরিবর্তন দেখতে পাব!

এই পরীক্ষাটি করার সময় আমরা কয়েলের ভেতর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করার জন্য একটা চুম্বককে কয়েলের ভেতর নিয়েছি এবং বের করে এনেছি। আমরা অন্য কোনোভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করতে পারতাম তাহলেও আমরা একই বিষয় দেখতে পেতাম। কয়েলের ভেতর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করার আরেকটা উপায় হচ্ছে এর কাছে চুম্বকের বদলে দ্বিতীয় একটা কয়েল নিয়ে আসা এবং সেই কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিয়ে সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা। যদি দ্বিতীয় কয়েলটিতে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য একটা ব্যাটারিকে একটা সুইচ দিয়ে সংযোগ দেয়া হয় তাহলে সুইচটি অন করে দ্বিতীয় কয়েলে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যাবে আবার সুইচটি অফ করে চৌম্বক ক্ষেত্র অদৃশ্য করে দেয়া যাবে। প্রথম কয়েলটির কাছে দ্বিতীয় কয়েলটি রেখে যদি সেটিতে চৌম্বক ক্ষেত্র একবার তৈরি করা হয় এবং আরেকবার নিঃশেষ করা হয় তাহলে প্রথম কয়েলের ভেতর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হবে এবং আমরা এমমিটারে সেজন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখব। সুইচ অন করে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি করা হবে তখন এমমিটারের একদিকে তার কাঁটাটি নড়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখাবে– সুইচটি অফ করার সময় আবার কাঁটাটি অন্য দিকে নড়ে বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখাবে!

এখানে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যখন চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন হয় শুধুমাত্র তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়। একটা কয়েলের মাঝখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা চুম্বক রেখে দিলে কিন্তু কয়েল দিয়ে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না। শুধুমাত্র যখন চুম্বকটি নাড়িয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তন করা হবে তখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে।

12.4.1 জেনারেটর

মোটর কীভাবে কাজ করে সেটা যখন আমরা বোঝার চেষ্টা করছিলাম তখন দেখেছি সেখানে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের মাঝে একটা কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহ করানো হয় যে কারণে সেটা ঘুরে। এবারে ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে চিন্তা করা যাক, মোটরের কয়েলে যদি আমরা ব্যাটারির সংযোগ না দিয়ে সেখানে একটা এমিটার লাগিয়ে কয়েলটা ঘোরাই তাহলে কী হবে ?

অবশ্যই তখন কয়েলের মাঝে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হবে কাজেই কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ করিয়ে যে মোটরের কয়েলকে আমরা ঘুরিয়েছি, সেই কয়েলটিকে ঘোরালে ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটা ঘটে– বিদ্যুৎ তৈরি হয়। এভাবেই জেনারেটর তৈরি হয়। অর্থাৎ ডিসি মোটরের আর্মেচারকে ঘোরালে সেটা ডিসি বিদ্যুৎ প্রবাহ দেয়, এসি মোটরকে ঘোরালে ঠিক সেভাবে এসি বিদ্যুৎ প্রবাহ দেয়।

12.4.2 ট্রান্সফর্মার

চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হলে বিদ্যুৎ তৈরি হয়– এটি ব্যবহার করে ট্রান্সফর্মার তৈরি করা হয়। ট্রান্সফর্মার কীভাবে কাজ করে বোঝার জন্য 12.16 ছবিতে একটি আয়তাকার লোহার মজ্জা বা কোর দেখানো হয়েছে। এই কোরের দুই পাশে পরিবাহী তার প্যাঁচানো হয়েছে– অবশ্যই এই পরিবাহী তারের উপর অপরিবাহী আস্তরণ রয়েছে যেন এটা ধাতব কোনো কিছুকে স্পর্শ করলেও "শর্ট সার্কিট" না হয়। ছবিতে দেখানো হয়েছে কোরের বাম পাশে একটা এসি ভোল্টেজের উৎস লাগানো হয়েছে। তারটি যেহেতু লোহার কোরকে ঘিরে লাগানো হয়েছে তাই যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তখন লোহার ভেতরে চৌম্বকত্ব তৈরি হবে এবং সেই চৌম্বক বল রেখা আয়তাকার লোহার ভেতর দিয়ে যাবে।

আমরা যেহেতু এসি ভোল্টেজের উৎস লাগিয়েছি তাই লোহার কোরে চৌম্বকত্ব বাড়বে কমবে এবং দিক পরিবর্তন করবে, অর্থাৎ ক্রমাগত চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হবে। লোহার কোরের অন্য পাশেও তার প্যাঁচানো আছে (অবশ্যই অপরিবাহী আবরণে ঢাকা) সেই কয়েলের মাঝে লোহার কোরের ভেতর দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রটির ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকবে এবং এই পরিবর্তন ডান পাশের কয়েলে একটা তড়িচ্চালক শক্তি বা EMF তৈরি করবে– একটা ভোল্ট মিটারে আমরা সেটা

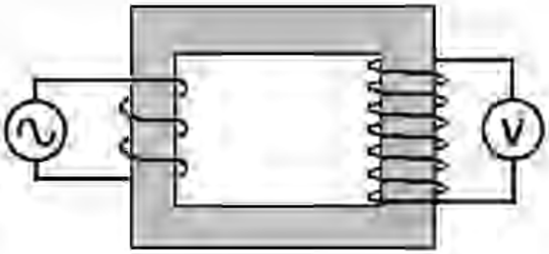

ছবি 12.16: ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারী কয়েলে এসি পটেনশিয়াল প্রদান করা হলো সেকেন্ডারী কয়েলে সেটি পটেনশিয়াল তৈরী করে।

ইচ্ছে করলে দেখতেও পারব। এই পদ্ধতিতে সরাসরি বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই একটি কয়েল থেকে অন্য কয়েলে বিদ্যুৎ পাঠানোর প্রক্রিয়াকে বলে ট্রান্সফর্মার।

এই ট্রান্সফর্মার দিয়ে আমরা অত্যন্ত চমকপ্রদ কিছু বিষয় করতে পারি। দুই পাশে কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যা যদি সমান হয় তাহলে বাম দিকে আমরা যে এসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করব ডান দিকে ঠিক সেই এসি ভোল্টেজ ফেরত পাব। ডানদিকে প্যাঁচের সংখ্যা যদি দশ গুণ বেশি হয় তাহলে ভোল্টেজ দশ গুণ বেশি হবে। প্যাঁচের সংখ্যা যদি দশগুণ কম হয় তাহলে ভোল্টেজ দশগুণ কম হবে। বাম দিকের কয়েল যেখানে এসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তার নাম প্রাইমারি কয়েল এবং ডান দিকে যেখান থেকে ভোল্টেজ ফেরত নেয়া হয় তার নাম সেকেন্ডারি কয়েল।

তোমরা হয়তো মনে করতে পার যদি সত্যি এটা ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে আমরা প্রাইমারিতে অল্প সংখ্যক প্যাঁচ দিয়ে হালকা ভোল্টেজ প্রয়োগ করে, সেকেন্ডারি কয়েলে অনেক বেশি প্যাঁচ দিয়ে বিশাল একটা ভোল্টেজ বের করে অফুরন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা করে ফেলি না কেন? এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটা পরিমাপ করা হয় VI দিয়ে, একটা ট্রান্সফর্মারে প্রাইমারিতে যে পরিমাণ VI প্রয়োগ করা হয় সেকেন্ডারি কয়েল থেকে ঠিক সেই পরিমাণ VI ফেরৎ পাওয়া যায়। কাজেই সেকেন্ডারিতে যদি ভোল্টেজ দশগুণ বাড়িয়ে নেয়া যায় তাহলে সেখানে বিদ্যুৎ I দশগুণ কমে যাবে।

তোমাদেরকে বুঝানোর জন্য আয়তাকার একটি কোর দেখানো হয়েছে। সত্যিকারের ট্রান্সফর্মার একটু অন্যভাবে তৈরি হয়, সেখানে প্রাইমারির উপরেই সেকেন্ডারি কয়েল প্যাঁচানো হয় এবং কোরটাও একটু অন্য রকম হয়।

প্রাইমারি কয়েলে প্যাঁচ সংখ্যা যদি n_Pএবং সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যা n_S হয় তাহলে প্রাইমারি কয়েলে যদি এসি V_P ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেকেন্ডারি কয়েলে যে এসি ভোল্টেজ V_S পাওয়া যাবে তার পরিমাণ হবে

$$V_S = \left(\frac{n_S}{n_P}\right) V_P$$

প্রাইমারি কয়েলে যদি I_P বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাহলে সেকেন্ডারি কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহ I_S হবে

$$I_S = \left(\frac{V_P}{V_S}\right) I_P = \left(\frac{n_P}{n_S}\right) I_P$$

উদাহরণ 12.3: একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যা 100, সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যা 1000, প্রাইমারি কয়েল দিয়ে $10V\ DC$ দেয়া হল। সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ কত?

উত্তর: শূন্য! ট্রান্সফর্মার ডিসি ভোল্টেজে কাজ করে না।

উদাহরণ **12.4**: একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যা 100, সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যা 1000, প্রাইমারি কয়েল দিয়ে $10V\ AC$ দেয়া হল। সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ কত?

উত্তর:

$$V_S = \left(\frac{n_S}{n_P}\right) V_P = \left(\frac{1000}{100}\right) \times 12V = 120V\ AC$$

উদাহরণ **12.5**: উপরের ট্রান্সমিটারে প্রাইমারি কয়েল দিয়ে $1A$ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সেকেন্ডারি কয়েলে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারবে?

উত্তর:

$$I_S = \left(\frac{V_P}{V_S}\right) I_P = \left(\frac{12}{120}\right) \times 1A = 0.1\ A$$

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

1. তোমার ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ইলেকট্রনের বীম পাঠাতে গিয়ে যদি দেখ সেটা উপরে উঠে যাচ্ছে তাহলে তুমি কী ব্যাখ্যা দেবে?
2. বৈদ্যুতিক চুম্বক বানানোর সময় এক টুকরো লোহার ওপর বিদ্যুৎ অপরিবাহী আবরণে ঢাকা তার প্যাঁচানো হকয়। মোটা তার দিয়ে একটি প্যাঁচ দেয়া ভালো নাকি সরু তার দিয়ে অনেকগুলো প্যাঁচ দেয়া ভালো? কেন?
3. দুটো লোহার দ— এর মাঝে একটি চুম্বক অন্যটি নয়, না ঝুলিয়ে বা অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার না করে কোনটা চুম্বক আর কোনটা সাধারণ লোহা বের করতে পারবে?
4. পৃথিবী একটা বিশাল চুম্বক, উত্তর মেরু সেই চুম্বকের উত্তর মেরু নাকি দক্ষিণ মেরু?

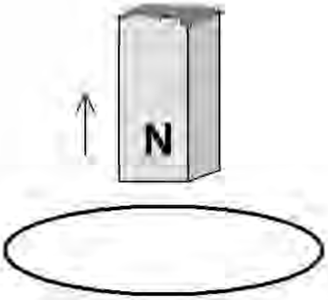

ছবি **12.17**: একটি লুপের ভেতর একটি চুম্বকের অবস্থানের পরিবর্তন।

5. চুম্বককে নাড়িয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়– সব সময়েই এটি পরিবর্তনকে বাধা দিতে চায়–এটা মনে রেখে ছবির চুম্বকটি উপরের দিকে নিলে লুপে কোন দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে বল।

গাণিতিক সমস্যা:

1. অপরিবাহী আবরণে ঢাকা একটি তার দিয়ে 10 প্যাঁচের একটি কয়েল তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে I পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ করার কারণে B চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। প্যাঁচের সংখ্যা 100 করা হলে চৌম্বক ক্ষেত্র কত হবে?
2. উপরের ক্ষেত্রে প্যাঁচ সংখ্যা আর 50 বৃদ্ধি করতে গিয়ে ভুলে উল্টো দিকে 50 প্যাঁচ দেয়ার কারণে চৌম্বক ক্ষেত্র কত হবে?
3. একটি গতিশীল ইলেকট্রন চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে যাবার কারণে F বল (evB) অনুভব করেছে। ইলেকট্রনের গতিশক্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হলে বলের পরিমাণ কত হবে?

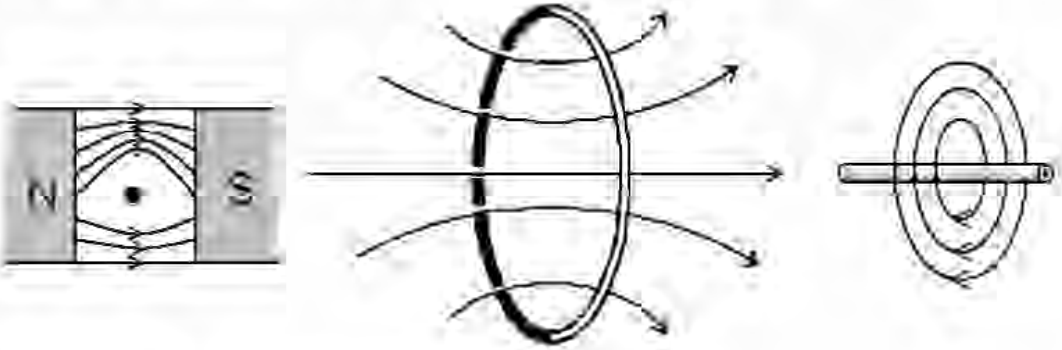

ছবি 12.18: বিদ্যুৎ প্রবাহী তারকে ঘিরে চৌম্বক ক্ষেত্র।

4. 12.18 ছবিটি দেখে বল কোন তারের ভেতর দিয়ে কোন দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে?
5. একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি কয়েলে প্যাঁচ সংখ্যা 100, এখানে $15V$ AC দিয়ে সেকেন্ডারি কয়েলে $105V$ AC পাওয়া গেছে সেকেন্ডারি কয়েলে প্যাঁচ সংখ্যা কত?

ত্রয়োদশ অধ্যায়
আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স
(Modern Physics and Electronics)

Werner Heisenberg (1901-1976)

ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ

ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ একজন জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একজন জনক এবং এজন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যে রহস্যময় অনিশ্চয়তার সূত্রটি রয়েছে সেটি হাইজেনবার্গের দেয়া। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানিতে তাঁর ভূমিকার জন্য তাঁকে অনেক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়।

13.1 কোয়ান্টাম মেকানিক্স (Quantum Mechanics)

আমরা সবাই জানি আলো হচ্ছে তরঙ্গ; একটা তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত, কম্পন কত আমরা তার সব কিছু আলোচনা করেছি। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেছে আলো যেন তরঙ্গ নয়– আলো হচ্ছে কণা এবং একটা কণা যে রকম ব্যবহার করে আলো ঠিক সে রকম ব্যবহার করছে! এ রকম একটা উদাহরণ হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট যেখানে আলোর কণা একটা ধাতব পদার্থকে আঘাত করে সেখান থেকে ইলেকট্রনকে মুক্ত করে দেয়। বিস্ময়কর এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্য আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল।

আবার আমরা সবাই জানি ইলেকট্রন হচ্ছে কণা; এর ভর আছে, এটা ছোটাছুটি ঠোকাঠুকি করতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে বিজ্ঞানীরা এক সময়ে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন হঠাৎ হঠাৎ ইলেকট্রন এমন ব্যবহার করে যেন এটি কণা নয় যেন এটি তরঙ্গ! এটা এমনই নিশ্চিতভাবে তরঙ্গের মতো ব্যবহার করে যে ইলেকট্রন দিয়ে রীতিমতো মাইক্রোস্কোপ তৈরি করে ফেলা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আলো কি তরঙ্গ নাকি কণা? আবার একই সাথে ইলেকট্রনের জন্যও একই প্রশ্ন করতে পারি। ইলেকট্রন কি কণা নাকি তরঙ্গ? তোমরা উত্তরটা শুনলে হকচকিয়ে যাবে তার কারণ উত্তর হচ্ছে: দুটোই! অর্থাৎ আলো একই সাথে তরঙ্গ এবং কণা এবং ইলেকট্রনও একই সাথে কণা এবং তরঙ্গ। তোমরা হয়তো ভাবছ এটি কেমন করে সম্ভব– কিন্তু জেনে রাখো সত্যিই এটা সম্ভব।

শুধু যে ইলেকট্রনকে তরঙ্গ হিসেবে দেখা যায় তা নয়– বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি প্রথমে বলেছিলেন যে যেকোন পদার্থ বা কণার সাথে একটা তরঙ্গ থাকে, শুধু তাই নয় সেই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে সেটাও তিনি বলে দিয়েছিলেন। কোনো কণার ভরবেগ যদি p হয় তাহলে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ হবে

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

যেখানে p হচ্ছে ভরবেগ এবং h হচ্ছে প্লাংকের ধ্রুবক যার মান হচ্ছে

$$h = 6.634 \times 10^{-34}\ Js$$

তোমার ভর যদি $50\ kg$ হয় আর তুমি যদি $2\ m/s$ বেগে দৌড়াও তাহলে তোমার ভরবেগ হবে

$$p = 50 \times 2\ kg\ m/s = 100 kg\ m/s$$

কাজেই তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

$$\lambda = \frac{6.634 \times 10^{-34}}{100} m = 6.634 \times 10^{-36} m$$

এটি এত ছোট যে এটা দেখার কোনোই বাস্তব সম্ভাবনা নেই– কিন্তু তুমি যদি ইলেকট্রন-প্রোটনের মতো ছোট কণা দিয়ে বিবেচনা করো তাহলে কিন্তু এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিংবা তরঙ্গের মতো ব্যবহার এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়।

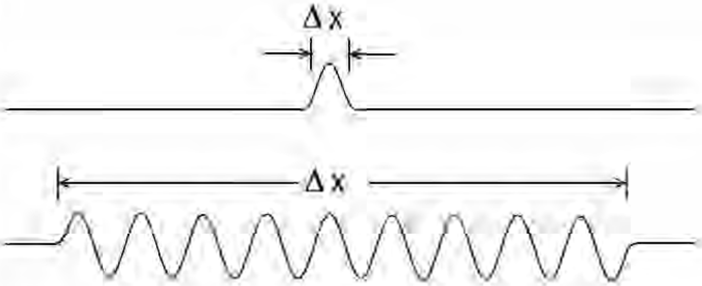

ছবি **13.1:** একটি ছোট এবং একটি বিস্তৃত তরঙ্গ।

খুব সংগত কারণেই প্রশ্ন করা যায় যে, সত্যিই সব কণার যদি একটা তরঙ্গ থাকে তাহলে সেটি কীসের তরঙ্গ? আবার হকচকিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও, এই তরঙ্গটি হচ্ছে সম্ভাবনার তরঙ্গ! একটি বস্তু বা কণাকে কোথায় পাওয়া যাবে সেই সম্ভাবনা। 13.1 ছবিতে আমরা কোনো একটা কণার সাথে থাকা তরঙ্গের ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি: প্রথম এবং দ্বিতীয় ছবির মাঝে পার্থক্যটা খুব স্পষ্ট– আমি যদি

তোমাকে জিজ্ঞেস করি কোন তরঙ্গে কণাটির অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে বলা সহজ? অবশ্যই তুমি বলবে প্রথম কণাটিতে কারণ এখানে তরঙ্গটি ছোট একটা জায়গায় কাজেই কণাটি নিশ্চয়ই সেখানে আছে।

এবারে আমি যদি জিজ্ঞেস করি কোন তরঙ্গটিতে কণাটির ভরবেগ নির্দিষ্ট করে বলা যাবে? আমরা একটু আগে দেখেছি ডি ব্রগলীর সূত্র অনুযায়ী ভরবেগ p হচ্ছে

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

কাজেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ যত নিশ্চিতভাবে মাপতে পারব ভরবেগও তত নিশ্চিতভাবে বলতে পারব। এবারে তরঙ্গ দুটির দিকে তাকাও– তুমি নিশ্চয়ই বলবে যে দ্বিতীয় তরঙ্গে আমি বেশি ভালো করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে পারব। প্রথমটিতে পুরো একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই নেই– কেমন করে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুমান করব ? দ্বিতীয়টিতে তরঙ্গটা অনেক বিস্তৃত সেখানে অনেকগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে নিখুঁতভাবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করা সম্ভব। আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য জানা থাকলে নিখুঁতভাবে ভরবেগও বের করা সম্ভব।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? যদি সব কণার সাথেই একটা তরঙ্গ থাকে তাহলে বলা যায় অবস্থানটা ভালো করে জানলে ভরবেগ অনিশ্চিত হয়ে যায় আবার ভরবেগ ভালো করে জানলে অবস্থানটা অনিশ্চিত হয়ে যায়। এটা হচ্ছে হাইজেনবার্গের জগদ্বিখ্যাত অনিশ্চয়তার সূত্র। এটাকে এভাবে লেখা হয়

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$
$$\hbar = h/2\pi$$

যেখানে Δx হচ্ছে অবস্থানের অনিশ্চয়তা (Δx কম হওয়া মানে অবস্থানে অনিশ্চয়তা কম, অর্থাৎ অবস্থানটা ভালো করে জানি), Δp হচ্ছে ভরবেগের অনিশ্চয়তা (Δp বেশি হওয়া মানে অনিশ্চয়তা বেশি অর্থাৎ ভরবেগ কত জানি না)। কেউ যেনো মনে না করে এটা বিজ্ঞানীদের অক্ষমতা– একসময় যখন বিজ্ঞান আরো বিকশিত হবে, আমাদের কাছে যখন আরো ভালো যন্ত্রপাতি থাকবে তখন আমরা বুঝি নিখুঁতভাবে একই সাথে অবস্থান আর ভরবেগ মেপে ফেলব। জেনে রাখ এটা কখনোই হবে না!

বিজ্ঞানে এই অনিশ্চয়তা সূত্রের একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে, বড় হয়ে তোমরা যারা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করবে তারা দেখবে এই অনিশ্চয়তার সূত্র থেকে ইলেকট্রন-প্রোটন, অনু-পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র কণাদের বিচিত্র একটা জগৎ তৈরি হয়– যেটাকে বলা হয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স!

উদাহরণ 13.1: ইলেকট্রন কেন নিউক্লিয়াসের ভেতর পড়ে যায় না?

উত্তর : অনিশ্চয়তার সূত্রের জন্য!

13.2 থিওরি অফ রিলেটিভিটি (Theory of Relativity)

আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি গড়ে উঠেছে দুটি সূত্র দিয়ে। সূত্র দুটি এ রকম :

(i) পদার্থবিজ্ঞান সব জায়গায় এক
(ii) আলোর গতিবেগ সব জায়গায় এক

আমরা জানি, তোমরা যারা এই সূত্র দুটি পড়ছ তারা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ভাবছ এটি আবার কী রকম সূত্র হলো ? বিজ্ঞান তো সব জায়গাতেই এক হতে হবে– আলোর বেগও ভিন্ন হবে কেন? ব্যাপারটি তাহলে আরেকটু ভালো করে দেখা যাক।

ধরা যাক তুমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছ এবং তোমার বন্ধু ট্রেনে বসে আছে যার গতিবেগ v, তোমার বন্ধুর কাছে দুটি আয়না একটি নিচে আরেকটি H উচ্চতায়; আলো নিচের আয়না থেকে উপরে এবং উপরের আয়না থেকে নিচে প্রতিফলিত হচ্ছে। (ছবি 13.2) এটাই তার ঘড়ি, আলো নিচ থেকে উপরে (কিংবা উপর থেকে নিচে) যেতে t_0 সময়ে ঘড়ির একটি ক্লিক হয়, অর্থাৎ

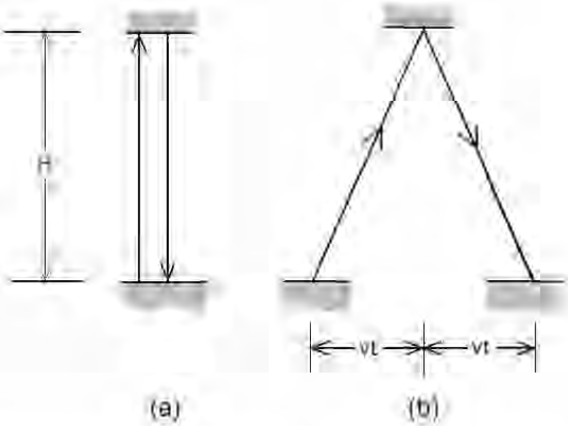

ছবি **13.2:** (a) স্থির এবং (b) ধাবমান আয়নায় প্রতিফলিত আলোক রশ্মি।

$$t_0 = H/c$$

যেখানে c হচ্ছে আলোর বেগ।

তুমিও ঠিক করলে তুমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেনের ভেতরে তাকিয়ে ক্লিকগুলো মাপবে। ট্রেনটি যেহেতু v বেগে যাচ্ছে তাই তুমি অবশ্যই দেখবে "তোমার" ঘড়ির প্রথম ক্লিকটি যখন ঘটেছে সেই t সময়ে উপরের আয়নাটি vt দূরত্বে সরে গেছে এবং দ্বিতীয় ক্লিকের সময় আরো vt দূরত্বে সরে গেছে। কাজেই তোমার কাছে মনে হবে ঘড়ির ক্লিক হওয়ার সময় আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে পিথাগোরাসের সূত্রানুযায়ী সেটা হচ্ছে:

$$\sqrt{H^2 + v^2t^2}$$

আইনস্টাইন বলেছেন সব জায়গায় আলোর বেগ c সমান, তাই তোমার ঘড়ির এক ক্লিকের সময়কে যদি t বলি তাহলে

$$t = \frac{\sqrt{H^2 + v^2 t^2}}{c}$$

$$t^2 = \frac{H^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2} t^2$$

কিন্তু আমরা জানি t_0 , তোমার বন্ধুর ঘড়ির ক্লিক

$$t_0 = \frac{H}{c}$$

কাজেই

$$t^2 = t_0^2 + \frac{v^2}{c^2} t^2$$

$$t^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = t_0^2$$

$$t^2 = \frac{t_0^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$$

অর্থাৎ

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

এই নিরীহ সমীকরণটি পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় সমীকরণের একটি এবং এটি আমাদের পরিচিত জগৎটি পুরো পুরি ওলট-পালট করে দিয়েছে। আবার মনে করিয়ে দিই, t হচ্ছে তোমার ঘড়ির সময় আর t_0 হচ্ছে তোমার বন্ধুর ঘড়ির সময়। তুমি স্থির দাড়িয়ে আছ এবং তোমার বন্ধু v বেগে যাচ্ছে, এটুকুই পার্থক্য। v এর মান কম হলে t এবং t_0 এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু যদি আলোর বেগের কাছাকাছি হয় তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ব্যপার। যেমন যদি $v = 0.99c$ হয় তাহলে

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - (0.99)^2}} = \frac{t_0}{\sqrt{0.0199}} = 7t_0$$

যার অর্থ তোমার বন্ধু যদি ট্রেনে দশ বৎসর কাটায় ($t_0 = 10$ বৎসর) তাহলে তার বয়স বাড়বে দশ বৎসর কিন্তু তোমার বয়স বাড়বে 70 বছর! পনেরো বছরে রওনা দিয়ে সে পঁচিশ বছরের যুবক হিসেবে ফিরে এসে দেখবে তুমি পনের বছরে শুরু করে এর মাঝে 85 বছরের থুরথুরে বুড়ো হয়ে গেছ!

উদাহরণ 13.1: তোমার তুলনায় তোমার বন্ধু v বেগে যাচ্ছে কিন্তু তোমার বন্ধুর তুলনায় তুমিও তো v বেগে যাচ্ছ। তাহলে উল্টোটা কেন সত্যি হয় না? দশ বৎসর কাটিয়ে দিয়ে তুমি কেন আবিষ্কার কর না যে তোমার বন্ধুর বয়স সত্তুর বছর বেড়ে গেছে?

উত্তর: থিওরি অফ রিলেটিভিটির এটা একটা অত্যন্ত মজার প্রশ্ন। কার বয়স বেড়েছে দেখার জন্য তোমার এবং তোমার বন্ধুর মাঝে একজনকে থামতে হবে এবং গতি পরিবর্তন করে ফিরে আসতে হবে। যে থামবে এবং গতি পরিবর্তন করবে তার সময় অতিক্রান্ত হবে কম। এটা খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়– এখানে আর করে দেখানো হলো না।

সময়ের প্রসারণের এই বিখ্যাত সমীকরণটি শুধুমাত্র একটা মজার সূত্র হতে পারত কিন্তু এটা মোটেও সেটা হয়ে থাকেনি। আমরা আমাদের জীবনে এর অসংখ্য উদাহরণ দেখেছি এবং আমরা জানি এটা সত্যি। বায়ুমণ্ডলের উপরে কসমিক রে এর আঘাতে মিউওন নামে এক ধরনের কণার জন্ম হয় যেটার আয়ু মাত্র দুই মাইক্রো সেকেন্ড। এত কম সময়ে এটা কোনোদিন বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছতে পারবে না, এটি যদি প্রায় আলোর বেগে ছুটে আসে তারপরও পৃথিবীতে পৌঁছাতে এর কমপক্ষে তিনশো মাইক্রোসেকেন্ড সময় লাগার কথা। কিন্তু আমরা নিয়মিতভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে মিউওনকে দেখি– তার কারণ মিউওন কিন্তু তার নিজের হিসেবে দুই মাইক্রোসেকেন্ড পরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার গতিবেগ যেহেতু আলোর বেগের কাছাকাছি তাই আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা পৃথিবীপৃষ্ঠে চলে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সময় টিকে আছে!

মিউওনের পৃথিবীপৃষ্ঠে চলে আসার ব্যাপারটি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যাবে, তোমরা ইচ্ছে করলেই দেখতে পারবে চলন্ত বস্তুর জন্য যে রকম সময়ের প্রসারণ হয় ঠিক সে রকম দৈর্ঘ্যের সংকোচন হয় এবং সেটা আমরা এভাবে লিখতে পারি:

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

এখানে আমাদের সাপেক্ষে স্থির কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য L_0 হলে আমাদের সাপেক্ষে v বেগে গতিশীল তার দূরত্ব হবে L যেটি L_0 থেকে কম।

কাজেই মিউত্তন যখন প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছিল তার মনে হচ্ছিল সে বুঝি স্থির বরং পৃথিবীটাই প্রচণ্ড বেগে তার দিকে ছুটে আসছে। কাজেই বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পুরো দূরত্বটাই সংকুচিত হয়ে ছোট একটুখানি হয়ে গেছে। তাই মিউত্তন মাত্র দুই সেকেন্ড বেঁচে থেকেই এই ছোট দূরত্বটা অতিক্রম করে ফেলেছে!

সময়ের প্রসারণ এবং দৈর্ঘ্যের সংকোচনের মতোই চমকপ্রদ আরেকটি সূত্র হচ্ছে বস্তুর ভর নিয়ে। স্থির অবস্থায় কোনো বস্তুর ভর যদি m_0 হয় তাহলে সেটা যদি v বেগে যেতে থাকে তাহলে তার ভর m হবে :

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

একটা প্লেন যদি $1000\ km/s$ বেগে উড়ে যায় তার ভর বাড়ে মাত্র $2 \times 10^{-10}\%$ যেটা ধর্তব্যের মাঝেই না। কিন্তু কোনো কিছু যদি $0.99c$ বেগে ছুটে যায় তাহলে তার ভর বেড়ে যাবে 7 গুণ। যদি বেগ আরো বেড়ে $0.999999c$ যার তাহলে ভর বেড়ে হয়ে যাবে 700 গুণ!

ভরের এই চমৎকার সূত্রটা ব্যবহার করে খুব সহজেই আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র বের করে ফেলতে পারি। সেটা হচ্ছে

$$E = mc^2$$

যার অর্থ পদার্থের ভর আসলে শক্তি। যদি কেউ ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে তাহলে একটুখানি ভর থেকে অচিন্ত্যনীয় পরিমাণ শক্তি তৈরি করতে পারবে। নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে ঠিক এই ব্যাপারটাই করা হয়, ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। আমাদের সূর্যের ভেতরেও এই পদ্ধতিতে শক্তি তৈরি হয় তাই হঠাৎ করে সব জ্বালানী ফুরিয়ে সূর্যের নিভে যাবার কোনো আশংকা নেই। মানবজাতির অনেক বড় দুর্ভাগ্য নিউক্লিয়ার বোমাতেও ঠিক এভাবে ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে অবিশ্বাস্য ধ্বংসলীলা চালানো হয়!

13.3 নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান (Nuclear Physics)

আমরা সবাই জানি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। সবচেয়ে ছোট পরমাণু হচ্ছে হাইড্রোজেন, তার কেন্দ্রে থাকে একটা মাত্র প্রোটন এবং তাকে ঘিরে ঘুরে মাত্র একটা ইলেকট্রন। প্রোটনের ভর ইলেকট্রন থেকে প্রায় 1800 গুণ বেশি, তাই একটা পরমাণুর ভর আসলে মূলত তার নিউক্লিয়াসের ভর। আমরা এর মাঝে অনেকবার দেখেছি প্রোটনের চার্জ পজিটিভ এবং ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ। তাই নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন প্রোটনের পজিটিভ চার্জের কুলম্ব বলের আকর্ষণে তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

হাইড্রেজেনের পরের পরমাণু হচ্ছে হিলিয়াম। হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে দুটি ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের আয়াতন খুবই ছোট $10^{-15}m$ এর কাছাকাছি এত কাছাকাছি দুটো প্রোটন রাখা হলে তাদের প্রবল কুলম্ব বিকর্ষণে তারা ছিটকে যাবে এবং সেটা যেন না ঘটে সেজন্য হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে দুটো প্রোটনের পাশাপাশি দুটো চার্জহীন নিউট্রনও থাকে। এভাবে তৈরি হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস খুব শক্ত এবং স্থিতিশীল নিউক্লিয়াস।

হিলিয়ামের পর লিথিয়াম,তারপর বেরিয়াম এভাবে একটার পর একটা পরমাণুর কথা বলতে পারি, যেখানে নিউক্লিয়াসে একটা একটা করে প্রোটনের সংখ্যা বেড়েছে এবং বাইরে একটার পর একটা ইলেকট্রনও বেড়েছে। (পরিশিষ্ট 2)

নিউক্লিয়াসকে স্থিতিশীল রাখার জন্য তার ভেতরে যখনই একটা প্রোটন বেড়েছে তখনই তার ভেতরে বাড়তি নিউট্রনকে জায়গা করে দিতে হয়েছে। অনেক নিউক্লিয়াস আছে যাদের প্রোটনের সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন। তাদেরকে বলে আইসোটোপ। যেমন হাইড্রোজেনের মতো সহজ পরমাণুরও তিনটি আইসোটোপ রয়েছে: হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম। হাইড্রোজেনে শুধু একটি প্রোটন, ডিউটেরিয়ামে একটা প্রোটন একটা নিউট্রন এবং ট্রিটিয়ামে একটা প্রোটন এবং দুইটা নিউট্রন। হাইড্রোজেনের তিনটা আইসোটোপের আলাদা আলাদা নাম দেয় আছে, সাধারণত অন্য পরমাণুর বেলায় সেটা সত্যি নয়। আইসোটোপগুলোকে তাদের নিউট্রন সংখ্যা দিয়ে আলাদা করা হয়ে। যেমন ধরা যাক কার্বনের কথা, এর আইসোটোপের সংখ্যা তিন, সেগুলো হচ্ছে :

C_{12}: নিউক্লিয়াসে 6 টা প্রোটন 6 টা নিউট্রন
C_{13}: নিউক্লিয়াসে 6 টা প্রোটন 7 টা নিউট্রন
C_{14}: নিউক্লিয়াসে 6 টা প্রোটন 8 টা নিউট্রন

C_{12} এ 12 সংখ্যাটি হচ্ছে নিউক্লিওন সংখ্যা বা সম্মিলিত নিউট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা। সে রকম C_{13} ও C_{14} এ 13 ও 14 হচ্ছে নিউক্লিওন সংখ্যা।

C_{12}, C_{13} ও C_{14}এর মাঝে C_{14} নিউক্লিয়াসটি তেজস্ক্রিয় বা অস্থিতিশীল অর্থাৎ C_{14} অনন্তকাল C_{14} হিসেবে থাকতে পারে না এটা অন্য কোনো নিউক্লিয়াসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের জন্য নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে কোনো একটা কণা বের হয়ে আসে। যেটা বের হয়ে আসে আমরা সেটাকে বলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি।

তেজস্ক্রিয়তার যে মূল তিনটি প্রক্রিয়া আছে সেগুলো হচ্ছে আলাফা, বিটা এবং গামা রশ্মি। প্রথম যখন তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে এগুলো বের হয়ে এসেছিল তখন সঠিকভাবে তার পরিচয় জানা ছিল না বলে এ রকম নাম দেয়া হয়েছিল এখন আমরা পরিষ্কার ভাবে এর পরিচয় জানি কিন্তু নামগুলো এখনো রয়ে গেছে।

13.3.1 আলফা কণা

আলফা কণা আসলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস! আমরা জানি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে থাকে দুটি প্রোটন আর দুটো নিউট্রন। কাজেই কোনো নিউক্লিয়াস থেকে যদি একটা আলফা কণা বের হয়ে আসে তাহলে সেই পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা কমবে দুই ঘর, নিউক্লিওন সংখ্যা কমবে চার ঘর। একটা নিউক্লিয়াসের ভেতর থেকে যখন একটা আলফা কণা বের হয়ে আসে তখন তার যথেষ্ট শক্তি থাকে এবং সেটা বাতাসকে তীব্র ভাবে আয়োনিত করতে পারে। অর্থাৎ এটা যখন বাতাসের ভেতর দিয়ে যায় তখন বাতাসের অণু-পরমাণুর সাথে যে সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষে সেগুলোকে আয়োনিত করতে পারে। আলফা কণার গতিপথ হয় সরল রেখার মতো– সোজাসুজি এগিয়ে যায়।

তবে আলফা কণা যেহেতু হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস তাই এটা পদার্থের ভেতর দিয়ে বেশিদূর যেতে পারে না– এটাকে থামিয়ে দেয়া সহজ। (একটা কাগজ বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়েই আলফা কণাকে থামিয়ে দেয়া যায়।) কোথাও আঘাত করলে ভেঙ্গে অনেক ক্ষতি করলেও আলফা কণা বেশি দূর যাবার আগেই থেমে যায়।

আলফা কণা যাবার সময় অনেক ইলেকট্রন এবং আয়ন তৈরি করে, সেগুলো নানাভাবে Detect করা যায়। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্সের অনেক উন্নতি হওয়ায় এই ধরনের আলফা কণার উপস্থিতি বের করা আরো সহজ হয়ে গেছে।

13.3.2 বিটা কণা

বিটা কণা আসলে ইলেকট্রন! তোমরা অবাক হয়ে ভাবতে পার নিউক্লিয়াসের ভেতর থাকে শুধু নিউট্রন আর প্রোটন সেখান থেকে ইলেকট্রন কেমন করে বের হয়? নিউক্লিয়াসের যে নিউট্রন রয়েছে সেখান থেকে ইলেকট্রনটা বের হয়ে, চার্জকে ঠিক রাখার জন্য নিউট্রনটা তখন প্রোটনে পাল্টে যায়।

$$n \rightarrow p + e + \overline{\nu_e}$$

উপরের সমীকরণে নিউট্রনকে প্রোটন এবং ইলেকট্রনে পাল্টে যাবার সাথে সাথে আরো একটি কণা $\overline{\nu_e}$ লেখা হয়েছে, সেটি কী? এটি হচ্ছে নিউট্রিনো নামের একটি কণার প্রতি পদার্থ এন্টি নিউট্রিনো! রহস্যময় এই কণা নিয়ে গবেষণার কোনো শেষ নেই তোমরা যখন পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আরো লেখাপড়া করবে তখন নিউট্রিনোর সাথে আরো ভালোভাবে পরিচিত হবে। বিটা কণা বের হবার পর নিউটক্লিয়াসের নিউক্লিওন সংখ্যা সমান থাকে কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা বেড়ে যায়।

নিউক্লিয়াস থেকে যখন আলফা কণা বের হয় তখন সে প্রতিবারই একটা নির্দিষ্ট শক্তি নিয়ে বের হয়। বিটা কণা বের হবার সময় তার শক্তিটা এন্টি নিউট্রিনোর সাথে ভাগাভাগি করে নেয় (প্রোটন যেহেতু নিউক্লিয়াসের ভেতরেই থাকে তাকে শক্তি দিতে হয় না) তাই বিটা কণার শক্তি নির্দিষ্ট থাকে না (এন্টি নিউট্রিনো কতোটুকু শক্তি নেবে তার ওপর নির্ভর করে বিটা কণার শক্তি বেশি কিংবা কম হতে পারে।)

বিটা কণা যেহেতু ইলেক্ট্রন তাই এটা পদার্থের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ঘর্ষণের কারণে পদার্থকে আয়োনিত করতে পারে। বিটা কণা কোনো কিছুর অনেক ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। আলফা কণা যে রকম সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে এক সময় থেমে যায় বিটা কণা (অর্থাৎ ইলেকট্রন) সে রকম নয়, বিভিন্ন অনু পরমাণুতে ঠোকা খেয়ে এর গতিপথ আঁকাবাঁকা হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, নিউক্লিয়াস থেকে শুধু যে ইলেকট্রন বের হতে পারে তা নয়, সেখান থেকে ইলেকট্রনের প্রতিপদার্থ পজিট্রনও বের হতে পারে। আমরা সেটাকেও বিটা বিকিরণ বলি। পজিট্রনের চার্জ পজিটিভ কাজেই সেটা তৈরি হয় প্রোটন থেকে:

$$p \rightarrow n + e^{+} + \nu_e$$

এখানেও তোমরা রহস্যময় নিউট্রিনোকে দেখতে পাচ্ছ! কোনো নিউক্লিয়াস থেকে পজিট্রন বের হলে সেই নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওন সংখ্যা সমান থাকলেও পারমানবিক সংখ্যা এক কমে যায়। পজিট্রন যেহেতু

ইলেকট্রনের প্রতি পদার্থ তাই এটা চারপাশের কোনো একটা ইলেকট্রনের সংস্পর্শে আসা মাত্র শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছ, প্রতিবার যখন বিটা বিকীরণ হয় তখন নিউট্রিনো কিংবা এন্টি নিউট্রিনো বের হয়, তাহলে শুধু আলফা বেটা গামা রশ্মির কথা বলছি কেন? নিউট্রিনো রশ্মির কথা কেন বলি না? তার কারণ নিউট্রিনোর চার্জ নেই, ভর বলতে গেলে নেই এবং পদার্থের সাথে এটি এত কম বিক্রিয়া করে যে আমরা সেটা দেখতে পাই না। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে এর বিক্রিয়া এত কম যে কয়েক আলোক বর্ষ দীর্ঘ শীসার পাত দিয়েও একটা নিউট্রিনোকে থামানো যায় না! সেজন্যে সবকিছু থেকে নিউট্রিনো বা এন্টিনিউট্রিনো বের হলেও তেজস্ক্রিয় রশ্মি হিসেবে এটাকে বিবেচনা করতে হয় না।

13.3.3 গামা রশ্মি

গামা রশ্মি আসলে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। তোমরা জান এর ভর বা চার্জ নেই। তাই যখন একটা নিউক্লিয়াস থেকে গামা রশ্মি বের হয় নিউক্লিয়াসটার কোনো পরিবর্তন হয় না। সাধারণত যখন কোনো নিউক্লিয়াস থেকে আলফা বা বিটা কণা বের হয় তখন নিউক্লিয়াসটা "উত্তেজিত" অবস্থায় থাকে তখন বাড়তি শক্তি গামা রশ্মি হিসেবে বের করে দিয়ে এটি "নিরুত্তেজ" হয়।

গামা রশ্মির যেহেতু চার্জ নেই তাই সেটা অণু-পরমাণুকে সরাসরি আয়োনিত করতে পারে না– তাই পদার্থের অনেক ভেতরে ঢুকতে পারে– গামা রশ্মি সরাসরি আয়োনিত করতে না পারলেও এটি অন্য কোনোভাবে কোনো পরমাণু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করে তার শক্তি ক্ষয় করে– সেই ইলেকট্রন তখন বিটা কণার মতো অণু-পরমাণুকে আয়োনিত করে।

তেজস্ক্রিয় রশ্মি দেখা কিংবা তার পরীক্ষা করার জন্য আসলে চমকপ্রদ যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর বড় বড় এক্সপেরিমেন্টে সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের নূতন নূতন জগৎ উন্মোচিত করা হচ্ছে।

13.3.4 অর্ধায়ূ

অণু-পরমাণুর ব্যবহার বোঝার জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করতে হয় এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে আমরা জানি এই কণাগুলোর ব্যবহার কখনোই সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়, আমরা শুধুমাত্র কিছু একটা ঘটার সম্ভাবনাটুকু বলতে পারি। তেজস্ক্রিয়তার বেলাতেও এটি সত্যি, যতি কোনো একটি নিউক্লিয়াস তেজস্ক্রিয় হয় তাহলে আমরা জানি তার ভেতর থেকে আলফা বিটা বা গামা বের হয়ে আসবে কিন্তু ঠিক কোন মুহূর্তে সেগুলো বের হবে সেটা কেউ বলতে পারে না! তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করার জন্য আমরা তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের অর্ধায়ূ বলে একটা কথা ব্যবহার করি। যদি অনেকগুলো নিউক্লিয়াস থাকে যে সময়ে তার অর্ধেক নিউক্লিয়াস থেকে তেজস্ক্রিয় কণা বের হয় সেটি হচ্ছে সেই নিউক্লিয়াসের অর্ধায়ূ। যে সমস্ত নিউক্লিয়াস স্থিতিশীল তাদের অর্ধায়ূ অসীম, কারণ সেগুলো থেকে কখনোই তেজস্ক্রিয় কণা বের হবে না। আমরা C_{14} এর কথা বলেছিলাম, তার অর্ধায়ূ 50 হাজার বছর, অর্থাৎ কোথাও যদি অনেকগুলো C_{14} থাকে 50 হাজার বছর পর তার অর্ধেক নিউক্লিয়াস থেকে তেজস্ক্রিয় কণা বের করবে।

যে নিউক্লিয়াসের অর্ধায়ূ যত কম সেই নিউক্লিয়াস তত দ্রুত তেজস্ক্রিয় কণা বের করে দিয়ে তার তেজস্ক্রিয় ক্ষমতা হারাবে। এখানে একটা বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে, তেজস্ক্রিয়তার কারণে

পরিবর্তনটা হয় নিউক্লিয়াসে। যখন নিউক্লিয়াসটি পরিবর্তিত হয় তখন তার বাইরের ইলেকট্রনগুলোর সংখ্যাও পরিবর্তন হয়। বাইরের ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর পরমাণুর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে– তাই তেজস্ক্রিয়তার কারণে একটি পরমাণু শেষ পর্যন্ত অন্য পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়– কিন্তু সেটি হয় পরোক্ষ ভাবে। নিউক্লিয়ার শক্তির তুলনায় পরমাণুর ইলেকট্রনের শক্তি খুবই কম। কাজেই পরমাণুর জন্য কাছাকাছি কোথা থেকে একটি ইলেকট্রন পাওয়া কিংবা কাছাকাছি একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়া খুব সহজ কাজ– সেটি কখনোই কোনো জটিল ব্যাপার নয়।

তেজস্ক্রিয়তার নানা ধরনের ব্যবহার আছে। খুব কম তেজস্ক্রিয়তার দ্রব্য শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে বাইরের থেকে তার গতিবিধি দেখে শরীরের অনেক তথ্য জানা যায়। সাধারণত সে রকম তেজস্ক্রিয় হয় খুব কম অর্ধায়ূ– হয়তো কয়েক মিনিট– কাজেই ঘণ্টা খানেকের মাঝে ঐ পদার্থের সব তেজস্ক্রিয়তা শেষ হয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয়তার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে প্রাচীন জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করাতে। আমাদের শরীরে প্রচুর কার্বন রয়েছে এবং তার ভেতরে নির্দিষ্ট পরিমাণ C_{14} আছে। যখন প্রাণী মারা যায় তখন তার শরীরের নূতন করে C_{14} ঢুকতে পারে না। আগে যতটুকু ছিল সেটা তখন অর্ধায়ূর কারনে কমতে থাকে। কাজেই কতটুকু C_{14} থাকা স্বাভাবিক এবং কতটুকু কমে গেছে সেটা থেকে সেই প্রাণী কতো প্রাচীন তা নিখুঁতভাবে বের করা যায়।

তেজস্ক্রিয় কণা শরীরের কোষের ক্ষতি করতে পারে সে জন্য নানা ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, আবার শরীরের ক্ষতিকর কোষ ধ্বংস করার জন্য এই তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার করা যায়। সে কারণে ক্যান্সার চিকিৎসায় ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করার জন্য তেজস্ক্রিয় কণা ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ 13.3: এক kg ভরের একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায় 100 বছর। দুইশ বছর পর তার ভর কত হবে?

উত্তর: তেজস্ক্রিয়তার কারণে সরাসরি ভরের পরিবর্তন হয়না। তেজস্ক্রিয় মৌলটির তিন চতুর্থাংশ নিউক্লিয়াস তেজস্ক্রিয় কণা বের করবে মাত্র!

13.3.5 তেজস্ক্রিয়তা থেকে সতর্কতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা খুব বেশি তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হই না কিন্তু পৃথিবীর নূতন প্রযুক্তির কারণে এখন অনেকেই তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হতে শুরু করেছে। নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করানো হয় সেখানে ভয়ংকর রকম তেজস্ক্রিয়তা তৈরি হয়, এবং অনেক গুলোর অর্ধায়ূ অনেক বেশি এবং লক্ষ বছর পর্যন্ত সেগুলো তেজস্ক্রিয় থাকে। নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের দুর্ঘটনায় বাইরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার উদাহরণও আছে। নিউক্লিয়ার শক্তি দিয়ে চালানো জাহাজ সাবমেরিন দুর্ঘটনাতেও অনেক মানুষ তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছিল যখন হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয়েছিল তখন অসংখ্য মানুষ তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হয়েছিল। কাজেই তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা শুরু হয়েছে এবং নিরাপদ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ইত্যাদি তৈরি করা শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করানো শুরু হয়েছে।

13.4 পার্টিকেল ফিজিক্স (Particle Physics)

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত কণা আছে তাদের সবগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের নাম ফারমিওন (Fermion) বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নাম অনুসারে। অন্য ভাগের নাম বোজন (Boson), আমাদের সত্যেন বোসের নাম অনুসারে। কেউ যদি একটু চিন্তা করে দেখে সে নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি হয়ে যাবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কণার অর্ধেকের নামকরণ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একজন বাঙালি অধ্যাপকের নামে।

পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেসব কণা দিয়ে তৈরি হয়েছে তার ভেতরে যেগুলো ফারমিওন সেগুলোকে বলা হয় বস্তুকণা। যেগুলো বোজন সেগুলো এই বস্তুকণার ভেতরে বল বা শক্তির আদান প্রদান করে। ফারমিওন নামের বস্তুকণাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগের নাম কোয়ার্ক অন্য ভাগের নাম লেপটন। কাজেই আমরা লিখতে পারি :

টেবিল 13.1: ফার্মিওন

কোয়ার্ক	u	আপ কোয়ার্ক
	d	ডাউন কোয়ার্ক
লেপটন	e	ইলেকট্রন
	ν_e	ইলেকট্রন নিউট্রিনো

নিউট্রন এবং প্রোটন তৈরি হয় আপ ও ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে (উদাহরণ 13.4)। এটা মোটেও অত্যুক্তি নয় যে, আমাদের পরিচিত দৃশ্যমান জগতের পুরোটাই তৈরি হয়েছে u, d এবং e (আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক এবং ইলেকট্রন) এই তিনটি মাত্র কণা দিয়ে। ν_e (ইলেকট্রন নিউট্রিনো) এর অস্তিত্ব রয়েছে তবে আগেই বলা হয়েছে সেটি সাধারণ মানুষের চোখে দৃশ্যমান নয় কিন্তু পুরোপুরি সঠিকভাবে বলার জন্য আমাদের এটাকেও গ্রহণ করতে হবে। এটা মোটামুটিভাবে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, পরিচিত পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড u, d, e এবং ν_e এই চারটি কণা দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

তবে শুধু যে এই চারটি কণা রয়েছে তা নয়, এর সাথে সাথে এই কণাগুলোর প্রতি পদার্থও রয়েছে। কাজেই আমাদের তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ করতে হলে ফার্মিওনের এই পরিবারে তাদের প্রতি পদার্থগুলোও যোগ করতে হবে। কাজেই তালিকাটি হবে এ রকম:

টেবিল 13.2: ফার্মিওন ও প্রতি পদার্থ

	পদার্থ	প্রতি পদার্থ
কোয়ার্ক	u	$\bar{u}$
	d	$\bar{d}$
লেপটন	e	$\bar{e}$
	ν_e	$\overline{\nu_e}$

উপরের কণাগুলো হচ্ছে বস্তুকণা, এদের ভেতর বল বা শক্তির বিনিময় করার জন্য আমাদেও অন্য কিছু কণার দরকার এবং এই কণাগুলোর নাম হচ্ছে বোজন। এই কণাগুলো হচ্ছে:

টেবিল 13.3: বোজন

ফোটন	γ	কোয়ার্ক ও ইলেকট্রনের ভেতর শক্তি বিনিময়
জি নট ডাবলিউ প্লাস/ডাবলিউ মাইনাস	Z^0 $W_{\pm}$	সকল ফার্মিওনের ভেতর শক্তি বিনিময়
গ্লুয়োন	g	শুধু কোয়ার্কের ভেতর শক্তি বিনিময়

সংগত কারণেই মনে হতে পারে এই বোজন কণার প্রতি পদার্থগুলো আমাদের তালিকায় নেওয়া দরকার। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বস্তুকণার ভেতরে বল বা শক্তি আদান-প্রদানকারী এই বোজন কণাগুলো নিজেরাই নিজেদের প্রতি পদার্থ। এখানে আমরা আমাদের পরিচিত ফোটন বা আলোর কণাকে নিশ্চয়ই দেখছি, অন্যগুলোর অস্তিত্ব খুব ভালোভাবেই আছে কিন্তু খাঁটি পদার্থবিজ্ঞানী ছাড়া অন্যরা হয়তো তাদের খবর রাখে না।

কাজেই একজন মোটামুটি এই ভেবে আনন্দ পেতে পারত যে, মাত্র চারটি ফার্মিওন এবং পাঁচটি বোজন দিয়েই এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থের গঠন ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু আসলে ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত এত সহজ থাকেনি। দেখা গেল ফার্মিওনের যে পরিবারটির কথা বলা হয়েছে সেটা যথেষ্ট নয়। ঠিক এ রকম আরও দুটো পরিবার দরকার। u, d, e, ν_e এর পরিবারটিকে প্রথম প্রজন্ম বলে আমরা হুবহু এ রকম আরও দুটি প্রজন্ম প্রস্তুত করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে: c, s, μ, ν_μ এবং t, b, τ, ν_τ

টেবিল 13.4: দ্বিতীয় প্রজন্ম

কোয়ার্ক	c	চার্ম
	s	স্ট্রেঞ্জ
লেপটন	μ	মিউওন
	ν_μ	মিউওন নিউট্রিনো

টেবিল 13.5: তৃতীয় প্রজন্ম

কোয়ার্ক	t	টপ
	b	বটম
লেপটন	τ	টাও
	ν_t	টাও নিউট্রিনো

এবং অবশ্যই তার সাথে সাথে রয়েছে তাদের প্রত্যেকটির প্রতি পদার্থ।

আমরা যদি প্রতি পদার্থগুলো আলাদাভাবে না লিখি তাহলে ছোট একটা ছকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মৌলকণা লিখতে পারি। কী চমৎকার! সেটা হবে এ রকম:

টেবিল 13.5: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মৌলকণা

	ফার্মিওন			বোজন	
	প্রথম প্রজন্ম	দ্বিতীয় প্রজন্ম	তৃতীয় প্রজন্ম		
কোয়ার্ক	u	c	t	γ	H
	d	s	b	Z^0	
লেপটন	e	μ	τ	$W_{\pm}$	
	ν_e	ν_μ	ν_τ	g	

এই সকল ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের যে মডেল দিয়ে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা হয় সেটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড মডেল। যে কণাগুলো দেখানো হয়েছে তাদের ভর নির্ধারণ করার জন্য হিগস বোজন (Higgs Boson) নামে আরো একটি বোজনের H অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছিল।

2013 সালে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন– এটি ছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটা অনেক বড় বিজয়। কোনো একটি বিচিত্র কারণে হিগস বোজনকে ঈশ্বর কণা বলা হয়!

উদাহরণ 13.4: u কোয়ার্কের চার্জ $\frac{2}{3}e$ এবং d কোয়ার্কের চার্জ $-\frac{1}{3}e$।
নিউট্রন এবং প্রোটন u ও d কোয়ার্ক দিয়ে কীভাবে তৈরি হয়?

উত্তর: নিউট্রন: udd মোট চার্জ শূন্য
প্রোটন : uud মোট চার্জ $1e$

উদাহরণ 13.5: কোয়ার্কের চার্জ যদি $\frac{1}{3}e$ হতে পারে তাহলে $1e$ কেন সবচেয়ে ছোট চার্জ? $\frac{1}{3}e$ কেন নয়?

উত্তর: কারণ কোয়ার্ককে কখনো আলাদাভাবে দেখা যায় না।

13.5 ইলেকট্রনিক্স (Electronics)

তোমরা সবাই ইলেকট্রিসিটি এবং ইলেকট্রনিক্স দুটি শব্দই শুনেছ, তাদের অর্থও ভিন্ন। যদিও দুটোর মাঝে অনেক কিছুতে মিল আছে কিন্তু এই দুটো শব্দ মোটামুটিভাবে দুটো ভিন্ন বিষয় বোঝায়। আমরা যখন ইলেকট্রিসিটি কথাটি বলি তখন বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার করা নিয়ে মাথা ঘামাই। বিদ্যুৎ প্রবাহ, সার্কিট, রেজিস্টর, পাওয়ার এ সবের মাঝে আলোচনাটা সীমাবদ্ধ থাকে। যখন ইলেকট্রনিক্স বলি তখন হঠাৎ করে

তার মাঝে নানা ধরনের তথ্যের আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণের বিষয়টা চলে আসে। 11 এবং 12 অধ্যায়ে ইলেকট্রিসিটির সাথে সম্পর্ক আছে এ রকম বিষয়গুলো নিয়ে খানিকটা আলোচনা হয়েছে, এখানে তোমাদের জন্য ইলেকট্রনিক্সের সূচনাটা করে দেয়া হচ্ছে।

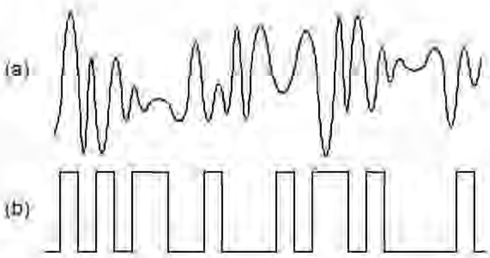

ছবি 13.3: অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সিগন্যাল।

আমরা যখন হেডফোন বা স্পিকারে গান শুনি তখন সেই হেড ফোন বা স্পিকারে গানের সুরেলা শব্দ তৈরি করার জন্য শব্দের কম্পন এবং তীব্রতার সাথে মিল রেখে বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হয়। আমরা যদি সেই বিদ্যুৎ প্রবাহ (বা বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি করার জন্য প্রয়োগ করা ভোল্টেজ) দেখি তাহলে 13.3 (a) ছবিতে দেখানো এক ধরনের সিগন্যাল দেখব। সময়ের সময়ের সাথে সাথে সিগন্যালের তীব্রতা বাড়ছে বা কমছে। সেই সিগন্যাল তীব্রতার যে কোনো মান নিতে পারে (অবশ্যই একটা সীমার ভেতর) এবং আমরা এই ধরনের বলি অ্যানালগ সিগন্যাল।

ধরা যাক আমরা হেড ফোন বা স্পিকারে যে গানটি শুনছি সেটা এসেছে কম্পিউটার থেকে এবং কম্পিউটারের কাছে সেই গানটি এসেছে ইন্টারনেট থেকে। ইন্টারনেট থেকে যে তার দিয়ে সিগন্যালটি কম্পিউটারে এসেছে সেই তারটির সিগন্যালকে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে সেটা দেখাবে 13.3 (b) ছবির মতো! এখানে অ্যানালগ সিগন্যালের মতো কারেন্ট (বা ভোল্টেজ) তীব্রতার যে কোনো মান নিতে পারে না, এটি শুধুমাত্র দুটি মান নিতে পারে, হয় কম (অনেক সময় শূন্য) কিংবা বেশি (ইলেকট্রনিক্সের ভার্সানের ওপর নির্ভর করে $3V$, $5V$ বা অন্য কিছু) হতে পারে। এ রকম সিগন্যালকে আমরা বলি ডিজিটাল সিগন্যাল। অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে তবু অনুমান করা যায় আসল সিগন্যালটি কেমন ছিল, শব্দের তীব্রতা কোথায় বেশি কোথায় কম, কম্পন কোথায় বেশি কোথায় কম কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যাল দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি এটা নিশ্চিত ভাবেই আমাদের গান শুনিয়েছে কাজেই গানের তথ্যটা এর মাঝেই নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে।

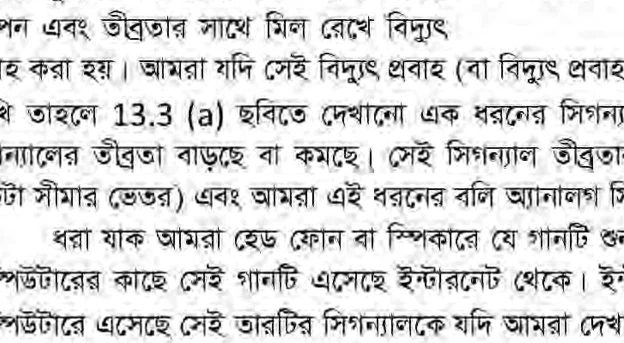

ছবি 13.4: ডেসিমেল এবং বাইনারি সংখ্যা।

অ্যানালগ সিগন্যালের তথ্য কেমন করে ডিজিটাল সিগনালে পাঠানো হয় সেটা অনুমান করা খুব কঠিন কিছু নয়। প্রথমে অ্যানালগ সিগন্যালকে ছোট ছোট সময়ের টুকরোয় এ ভাগ করে নিতে হয়, প্রত্যেকটা টুকরোয় অ্যানালগ সিগন্যালের মানটা কত বের করতে হয়, তারপর সেই মানটুকু সংখ্যায়

প্রকাশ করে সংখ্যাটা পাঠাতে হয়। সংখ্যার জন্য ডিজিট শব্দটা ব্যবহার করা হয় বলে ডিজিটাল শব্দটা এসেছে। আমরা দশমিক সংখ্যা দেখে অভ্যস্ত যেখানে সংখ্যা পাঠানোর জন্য $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ এই দশটা চিহ্ন দরকার। সংখ্যাকে দশভিত্তিক হতে হবে কে বলেছে? ষোল ভিত্তিক সংখ্যা Hexadecimal অহরহ ব্যবহার করা হয়– যেখানে ষোলটা চিহ্ন দরকার: $(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)$ আবার আট ভিত্তিক সংখ্যাও আছে যেখানে দরকার আটটা Symbol $(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$। মজার কথা হচ্ছে আমরা ইচ্ছে করলে দুই ভিত্তিক সংখ্যাও তৈরি করতে পারি যেখানে দরকার মাত্র দুটি চিহ্ন 0 এবং 1, এটাকে বলে বাইনারি সংখ্যা। তোমরা যখন দশমিক সংখ্যা শিখেছ সেখানে তোমরা দেখেছ ডান দিক থেকে প্রথম সংখ্যাটি একক (অর্থাৎ মান হচ্ছে $10^0 = 1$), দ্বিতীয়টি দশক (অর্থাৎ মান $10^1 = 10$), তৃতীয়টি শতক (অর্থাৎ মান $10^2 = 100$) ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক একই ভাবে বাইনারি সংখ্যায় ডান দিক থেকে প্রথমটির মান হচ্ছে $2^0 = 1$, দ্বিতীয়টির মান হচ্ছে $2^1 = 2$, তৃতীয়টির মান হচ্ছে $2^2 = 4$ ইত্যাদি। 13.4 ছবিতে একই সংখ্যা দশমিকে এবং বাইনারিতে প্রকাশ করে দেখানো হয়েছে।

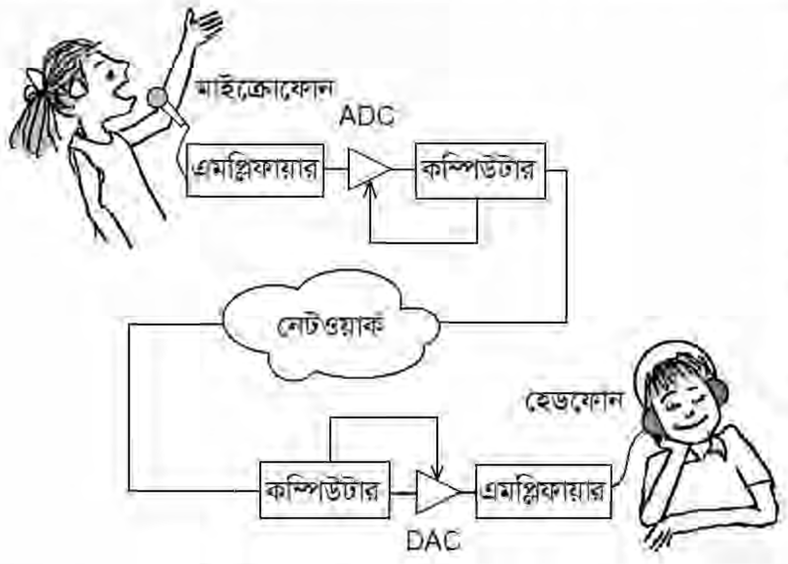

ছবি **13.5:** একটি কণ্ঠস্বরকে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্য কোথাও প্রেরণ করা।

যেহেতু যে কোনো সংখ্যাকে আমরা বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারি তাই অ্যানালগ সিগন্যালের মানটা বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করে নিলেই এটাকে ইলেকট্রনিক্স সিগন্যাল হিসেবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো যায়। যখন সিগন্যালটার মান বেশি হবে সেটা বুঝাবে 1, যখন মানটা কম হবে সেটা বুঝাবে শূন্য! পাঠানোর সময় আরো কিছু নিয়মকানুন দেয়া হয় যেন সিগন্যালটা নিয়ে কেউ গোলমাল পাকিয়ে না ফেলে, কোথায় শুরু কোথায় শেষ বোঝা যায়।

আমাদের জীবনে আমরা যখন কিছু একটা ব্যবহার করি সেটা প্রায় সময়েই হয় অ্যানালগ, সেটাকে ডিজিটালে পরিবর্তন করে পাঠানো হয়, প্রক্রিয়া করা হয়। পৌঁছানোর পর সেটাকে আবার অ্যানালগে পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয়। অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটালে পরিবর্তন করার জন্য কিংবা ডিজিটাল সিগন্যালকে অ্যানালগে পরিবর্তন করার জন্য বিশেষ ধরনের আই সি (Integrated Circuit) ব্যবহার করা হয় তাদেরকে Analog to Digitla Converter (সংক্ষেপে ADC) বা

Digital to Analog Converter (সংক্ষেপে DAC) বলা হয়। 13.5 ছবিতে কিভাবে এক জনের কাছ থেকে আরেক জনের কাছে কোনো একটা সিগন্যাল পাঠানো হয় সেটা দেখানো হলো।

উদাহরণ 13.6: 1 থেকে 32 পর্যন্ত ডেসিমেল সংখ্যায় বাইনারি সংখ্যাং প্রকাশ করে দেখাও।

উত্তরঃ 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 10000, 10001, 10010, 10011, 10100, 10101, 10110, 10111, 11000, 11001, 11010, 11011, 11100, 11101, 11110, 11111, 100000

তোমরা বুঝতেই পারছ অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করার সময় আমরা সেটা অনেকভাবে করতে পারি, সময়ের Slot কতটুকু হবে এবং সর্বোচ্চ মান কতো ধরে নেব তার উপর নির্ভর করে ডিজিটাল ডাটার পরিমাণ। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে করার প্রয়োজন হলে তার পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে। তার জন্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স জটিল হতে পারে এমন কি সময় সাপেক্ষও হতে পারে। কিন্তু তারপরও আধুনিক জগৎ খুব দ্রুত সবকিছুকে ডিজিটাল সিগন্যাল হিসেবে পরিবর্তন করে সেটাকে প্রক্রিয়া করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল সিগন্যালকে শুধু 0 এবং 1 হিসেবে প্রেরণ করতে হয় বলে এর মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত গোলমাল কম এবং অনেক সময়েই অ্যানালগ অংশটুকু চোখের আড়ালে রেখে সব কিছুই সরাসরি আমাদের কাছে ডিজিটাল হিসেবে চলে আসছে।

13.5.1 সেমিকন্ডাক্টর

আধুনিক জগৎ এবং আধুনিক সভ্যতা পুরোটাই ইলেকট্রনিক্সের উপরে গড়ে উঠেছে এবং এই ইলেকট্রনিক্সের জন্য আমরা যদি কোনো এক ধরনের পদার্থের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই তাহলে সেই পদার্থটি হবে সেমিকন্ডাক্টর। আমরা এর আগেও পরিবাহী এবং অপরিবাহী এবং অর্ধ-পরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টরের নামটি উচ্চারণ করেছি এখন ব্যাপারটার একটুখানি গভীরে যেতে পারি।

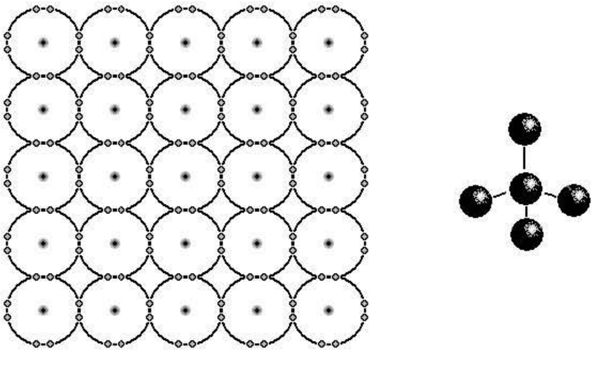

ছবি 13.6: সিলিকন ক্রিস্টাল। ডান দিকে সিলিকন ক্রিস্টালের ত্রিমাত্রিক রূপ।

13.6 ছবিতে সেমিকন্ডাক্টরের অনেকগুলো পরমাণুকে পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। পরমাণর গঠনের কারণে তাদের শেষ কক্ষ পথে যদি আটটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেটি কোন এক অর্থে পরিপূর্ণ হয় এবং অনেক স্থিতিশীল হয়। পরমাণুগুলো সবসময়েই চেষ্টা করে তাদের শেষ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন রাখতে। সিলিকন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সেমিকন্ডাক্টর তার শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংখ্যা চার, কিন্তু যখন আমরা সিলিকন ক্রিস্টালের দিকে তাকাই তখন অবাক হয়ে আবিষ্কার করি প্রত্যেকটি পরমাণুই ভাবছে তার শেষ কক্ষপথে আটটা ইলেকট্রন! এটা ঘটেছে কারণ প্রত্যেকটা পরমাণুই চারদিকে ভিন্ন চারটা পরমাণুর সাথে যুক্ত এবং সবাই নিজের ইলেকট্রনগুলো পাশের

পরমাণুর সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছে। (আমরা ছবিটা একেছি এক সমতলে, সত্যিকার সিলিকন পরমাণুগুলো ত্রিমাত্রিক, ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা পরমাণুই আসলে অন্য চারটি পরমাণুকে স্পর্শ করে থাকে।)

এমনিতে সেমিকন্ডাক্টরে ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর সাথে আটকে থাকে, তাপমাত্রা বাড়ালে হয়তো একটা দুটো ইলেকট্রন মুক্ত হতে পারে। পরিবাহকে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে তাই তখন সেমিকন্ডাক্টরটা খানিকটা পরিবাহকের মতো কাজ করতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা চমৎকার একটা ব্যাপার, কিন্তু ব্যবহারের জন্য এটা ততটা উপযোগী না। এটাকে সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করার জন্য খুবই মজার একটা কাজ করা হয়। সিলিকন ক্রিস্টালের সাথে এমন একটা পরমাণু (যেমন ফসফরাস) মিশিয়ে দেয়া হয় যার শেষ কক্ষপথে পাঁচটি ইলেকট্রন। তখন আমরা হঠাৎ করেই আবিস্কার করি যেহেতু প্রত্যেকটা পরমাণু অন্য পরমাণুর সাথে নিজের ইলেকট্রন ভাগাভাগি করে একটা শৃঙ্খলার মাঝে আছে এবং ফসফরাসের এই পঞ্চম ইলেকট্রনটি বাড়তি (প্রায় অবিকৃত) একটা ইলেকট্রন– কোনো পরমাণুরই তার প্রয়োজন নেই তাই সে সব পরমাণুর মাঝেই প্রায় মুক্তভাবে ঘুরোঘুরি করতে পারে! এটাকে ফসফরাসের পরমাণুর মাঝে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই– ফসফরাসকে পজিটিভ আয়ন বানিয়ে এই ইলেকট্রনটি মুক্ত ইলেকট্রনের মতো ব্যবহার করে। বলা যেতে পারে ফসফরাস মেশানো এ রকম সেমিকন্ডাক্টর অনেটাই পরিবাহী, কারণ চার্জ পরিবহনের জন্য মুক্ত এখানে কিছু ইলেকট্রন থাকে। ফসফরাসের মতো পঞ্চম ইলেকট্রনসহ পরমাণুর যোগ করে সেমিকন্ডাক্টরকে মোটামুটি পরিবাহক তৈরি করে ফেলা এই সেমিকন্ডাক্টরকে বলে n ধরনের সেমিকন্ডাক্টর।

এবারে তোমরা আরো চমকপ্রদ একটা বিষয় শোনার জন্য প্রস্তুত হও। শেষ কক্ষপথে বাড়তি পঞ্চম ইলেকট্রন এমন পরমাণু না দিয়ে যদি আমরা উল্টো কাজটি করি, শেষ কক্ষপথে একটি কম অর্থাৎ তিনটি ইলেকট্রন (বোরন) দেয়া কিছু পরমাণু মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে কী হবে? অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে বোরনের পরমাণুর কক্ষপথে একটা জায়গায় ইলেকট্রনের জন্য একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে এবং পরমাণুটি সেই ফাঁকা জায়গাটা পাশের একটা ইলেকট্রন এনে ভরাট করে ফেলতে পারে– তখন পাশের পরমাণুতে একটা ফাঁকা জায়গা হয়ে যাবে, সেই ফাঁকা জায়গাটি আবার তার পাশের পরমাণুর একটা ইলেকট্রন এসে ভরাট করে ফেলতে পারে– তখন সেখানে একটা ফাঁকা জায়গা হবে। অন্যভাবে বলা যায় আমাদের কাছে মনে হবে একটা ইলেকট্রনের অভাবযুক্ত একটা ফাঁকা জায়গা বুঝি পরমাণু থেকে পরমাণুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে! মনে হতে পারে এটা বুঝি আসলে এক ধরনের কণা এবং তার চার্জ বুঝি পজিটিভ! এটাকে বলা হয় হোল (Hole)। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি বোরন পরমাণুকে নেগেটিভ আয়ন হিসেবে রেখে তার হোলটি সিলিকন ক্রিস্টালের ভেতর ঘুরে বেড়াতে পারে। অর্থাৎ এই সেমিকন্ডাক্টরটি প্রায় পরিবাহক হিসেবে কাজ করে এবং তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে পজিটিব চার্জযুক্ত হোল! তিনটি ইলেকট্রন মিশিয়ে একটা সেমিকন্ডাক্টরকে যখন পরিবাহক করে ফেলা হয় তখন তাকে বলে p ধরনের সেমিকন্ডাক্টর।

এমনিতে আলাদাভাবে n ধরনের এবং p ধরনের সেমিকন্ডাক্টরের তেমন ব্যবহার ছিল না কিন্তু যখন n এবং p ধরনের সেমিকন্ডাক্টর একটার সাথে আরেকটা যুক্ত করা হলো তখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জগতের সবচেয়ে বড় বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল।

13.7 ছবিতে দেখানো হয়েছে একটা n ধরনের সেমিকন্ডাক্টর p ধরনের সেমিকন্ডাক্টরের সাথে যুক্ত করে তার সাথে একটা ব্যাটারি এমনভাবে যুক্ত করা হয়েছে যেন ব্যাটারির পজিটিভ অংশটি যুক্ত হয়েছে n এর সাথে এবং নেগেটিভ অংশটি যুক্ত হয়েছে p এর সাথে। আমরা জেনেছি n ধরনের

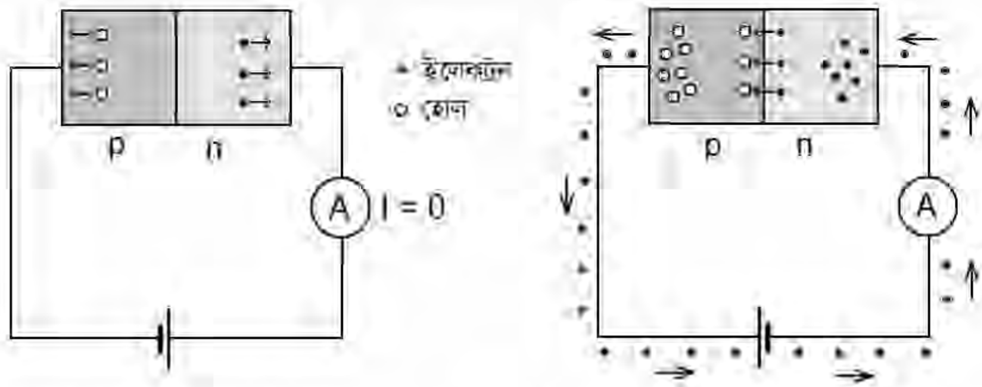

ছবি 13.7: n এবং p যুক্ত করে তৈরি করা ডায়োড। ব্যাটারির এক সংযোগে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় না, অন্য সংযোগে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়।

সেমিকন্ডাক্টরে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য ইলেকট্রন থাকে, কাজেই খুব দ্রুত এই ইলেকট্রনগুলো ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত নিজের কাছে টেনে নিবে কাজেই n টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য কোনো ইলেকট্রন থাকবে না– এটা হয়ে যাবে বিদ্যুৎ অপরিবাহী। ঠিক একইভাবে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন হাজির হবে p টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে এবং সবগুলো হোল একটা একটা ইলেকট্রন নিয়ে ভরাট হয়ে যাবে কাজেই খুব দ্রুত দেখা যাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ করার জন্য একটিও হোলও অবশিষ্ট নেই, অর্থাৎ এই p সেমিকন্ডাক্টরটিও বিদ্যুৎ অপরিবাহী হয়ে যাবে। কাজেই ব্যাটারির সাথে এই np সেমিকন্ডাক্টরটি যুক্ত করা হলে, এর ভিতর দিয়ে কোনো বিদ্যুৎই পরিবাহিত হবে না।

এবারে যদি np সেমিকন্ডাক্টরটিতে ব্যাটারীর উল্টো সংযোগ দেয়া হয় তাহলে কী হবে? অর্থাৎ ব্যাটারির পজিটিভ অংশ লাগানো হল p ধরনের সেমিকন্ডাক্টরে এবং নেগেটিভ প্রান্ত লাগানো হল n ধরনের সেমিকন্ডাক্টরে। এবারে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন ঢুকে যাবে n টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে এবং ইলেকট্রনগুলোকে np জাংশনের দিকে ঠেলে দেবে। ঠিক তেমনিভাবে p টাইপ সেমিকন্ডাক্টর থেকে ইলেকট্রন টেনে নিয়ে নূতন হোল তৈরি করতে থাকবে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এবং সেই হোলগুলো ছুটে যাবে pn জাংশনের দিকে। সেখানে ইলেট্রনগুলো হোলকে ভরাট করতে থাকবে– ব্যাপারটা চলতেই থাকবে এবং কেউ যদি ব্যাটারির তারগুলোর দিকে তাকায় তাহলে দেখবে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন যাচ্ছে n এর দিকে এবং p থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে ফিরে আসছে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তে। সেটা চলতেই থাকবে– এবং আমরা দেখব এই জাংশনের ভেতর দিয়ে

চমৎকার ভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে। n এবং p ধরণের সেমিকন্ডাক্টর তৈরি এই জাংশনকে বলে ডায়োড। ডায়োড এমন একটি ইলেট্রনিক্স ডিভাইস যেখানে ব্যাটারির এক ধরণের সংযোগে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় উল্টো সংযোগে হয় না।

ডায়োডের ব্যবহারের কোনো শেষ নেই, সাধারণ ডায়োড তো আছেই সত্যি বলতে কী তোমরা সব সময় যে লাল নীল সবুজ হলুদ ছোট ছোট আলোগুলো দেখো সেগুলো সব LED বা Light Emitting Diode ডায়োডের আরো একটা মজার ব্যবহার হচ্ছে AC সিগন্যাল DC তৈরি করা। ১৩.৮ ছবিতে দেখানো উপায়ে আমরা যদি ডায়োডের ভেতর AC ভোল্টেজ দিই অন্য পাশে নেগেটিভ অংশটুকু কেটে শুধু পজিটিভ অংশটুকু বের হয়ে আসবে।

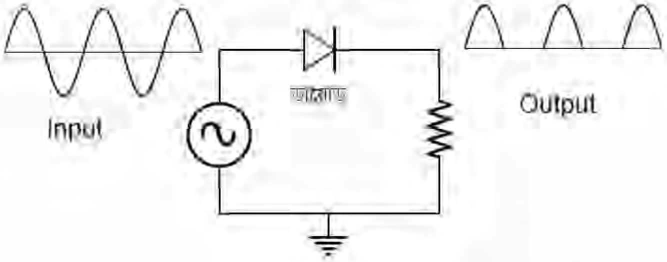

ছবি **13.8:** ডায়োড ব্যবহার করে এসি সিগন্যালের নেগেটিভ অংশ অপসারণ করে ফেলা যায়।

13.5.2 ট্রানজিস্টর

যারা বিজ্ঞানের ইতিহাস জানে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কী, সম্ভবত তারা ট্রানজিস্টরের কথা বলবে। ট্রানজিস্টর p এবং n ধরনের সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি এক ধরনের ডিভাইস, যেটা তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। npn এবং pnp দুই ধরনের ট্রানজিস্টর আছে। ছবিতে তোমাদের npn ধরনের ট্রানজিস্টর দেখানো হয়েছে। এটাকে অনেকটা পানির ট্যাপের সাথে তুলনা করা যায়, পানির ট্যাপ খুললে পানির প্রবাহ শুরু হয় আবার ট্যাপটি বন্ধ করলে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। npn ট্রানজিস্টরের যে দিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকে তার নাম কালেক্টর এবং যেদিক দিয়ে কারেন্ট বের হয় তার নাম এমিটার। মাঝখানে রয়েছে বেস, এই ব্যাসটি ট্যাপের মতো– এই বেসে অল্প একটু কারেন্ট দিলেই যেন ট্যাপটি খুলে যায় অর্থাৎ কারেন্টের প্রবাহ হতে থাকে। আবার এই অল্প কারেন্ট বন্ধ করে দিলেই বিদ্যুতের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়!

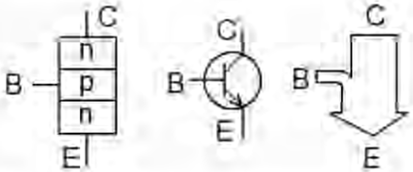

ছবি **13.9:** একটি npn ট্রানজিস্টরের গঠন, প্রতীক এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ

এই ট্রানজিস্টর দিয়ে অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। ছোট সিগন্যালকে বড় করার জন্য ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয় যেটাকে আমরা বলি এমপ্লিফায়ার। নানা ধরনের সিগন্যালকে প্রক্রিয়া করার জন্যও ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়।

ট্রানজিস্টর রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ডায়োড ইত্যাদি ব্যবহার করে অনেক প্রয়োজনীয় সার্কিট তৈরি করা হয়। ধীরে ধীরে প্রযুক্তির উন্নতি হতে থাকে এবং এই ধরনের নানা কিছু ব্যবহার করে তৈরি

করা আস্ত একটি সার্কিট ছোট একটা জায়গার মাঝে ঢুকিয়ে দেয়া শুরু হলো এবং তার নাম দেয়া হলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হয়তো একটা নখের সমান তার ভেতরে প্রথমে হাজার হাজার ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি সার্কিট ঢুকানো শুরু হয় এবং দেখতে দেখতে একটা আইসির ভেতর বিলিওন ট্রানজিস্টর পর্যন্ত বসানো সম্ভব হয়ে উঠতে থাকে! একটি ছোট চিপের ভিতর বিলিওন ট্রানজিস্টর ঢোকানোর এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় VLSI বা Very Large Scale Integration. এই প্রক্রিয়াটি এখনো থেমে নেই এবং চিপের ভিতর আরো ট্রানজিস্টর ঢুকিয়ে আরো জটিল সার্কিট তৈরি করার প্রক্রিয়া এখনো চলছে।

একটি ছোট চিপের ভিতর বিলিওন ট্রানজিস্টর ঢুকিয়ে অত্যন্ত জটিল সার্কিট তৈরি করার কারণে আমরা কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ক্যালকুলেটর, চমকপ্রদ মোবাইল টেলিফোন ইত্যাদি অসংখ্য নূতন নূতন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারছি। এক সময় ইলেকট্রনিক্সের যে কাজটি করতে কয়েকটি ঘর কিংবা একটা আস্ত বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন হতো এখন সেটা একটা ছোট চিপের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং সেগুলো দিয়ে তৈরি নানা ধরনের যন্ত্র আমরা এখন পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি !

13.5.3 এফ পি জি এ (FPGA, Fied Progammable Gate Array)

ইলেকট্রনিক্সের জগতের সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে এফ পি জি আই। এক সময় একটা আই সি'র লক্ষ-কোটি ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি সার্কিট একটা বিশেষ কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হতো। এখন সম্পূর্ণ নূতন ধরনের আই সি তৈরি হয়েছে যেখানে লক্ষ-কোটি ছোট ছোট সার্কিট (বা গেট) সাজানো থাকে কিন্তু তাদের ভেতরে কোনো কানেকশন দেয়া থাকে না। যে এটা ব্যবহার করতে চায় সে এই আই সি টিকে প্রোগ্রাম করে ভেতরের কানেকশন দিয়ে সেটাকে যে রকম ইচ্ছে সে রকম একটা সার্কিটে তৈরি করে নেয়। শুধু তাই নয় যদি এই সার্কিটটা পছন্দ না হয় তাহলে সেটা পরিবর্তন করে নূতন একটা সার্কিট পাল্টে দিতে পারে। সেটা যেখানে ইচ্ছে সেখানেই করা যায় বলে নাম দেয়া হয়েছে ফিল্ড প্রোগ্রামেবল বা কর্মক্ষেত্রে প্রোগ্রাম করার উপযোগী। গেট এরে (Gate Array) কথাটি এসেছে অসংখ্য সাজিয়ে থাকা গেট এর কারণে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যতই সময় যেতে থাকবে ইলেকট্রনিক্সের জগতে এই এফ পি জি এ ততই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুররু করবে। একটি সময় ছিল যখন পুরনো সার্কিট দিয়ে তৈরি একটা যন্ত্র ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে সেটা ফেলে দিয়ে সেখানে নূতন একটি সার্কিট বসাতে হতো। এখন কিছুই করতে হয় না– শুধুমাত্র এফ পি জি এ চিপের ভেতর পুরাতন সার্কিটের প্রোগ্রামটা সরিয়ে নূতন সার্কিটের প্রোগ্রামটি চালাতে হয়। এক সময় প্রোগ্রামিং এবং ইলেকট্রনিক্স সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয় ছিল কিন্তু এখন দুটির মাঝে একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের সমন্বয় ঘটেছে।

13.5.4 কম্পিউটার

তোমরা সবাই কম্পিউটার ব্যবহার করেছ। যারা একটু ইতস্তত করছ তাদেরকে বলা যেতে পারে কম্পিউটার বলতেই যাদের চোখের সামনে একটা মনিটর একটা সিপিইউ বা কি-বোর্ড কিংবা ল্যাপটপের ছবি ভেসে ওঠে– শুধু সেগুলোই কম্পিউটার নয়। আমরা যে মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করি তার মাঝেও ছোট ছোট এবং পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার রয়েছে।

আধুনিক জগতে কম্পিউটারের গুরুত্বটি বিশাল তার কারণ এটি অন্য দশটি যন্ত্রের মতো নয়। অন্য যে কোনো যন্ত্র বা টুল (tool) সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বাঁশি বাজানো সম্ভব নয় আবার বাঁশি দিয়ে স্ক্রু খোলা যায় না। কিন্তু কম্পিউটার এমন একটা যন্ত্র, যেটা দিয়ে সম্ভাব্য সকল কাজ করা যায় এবং কী কী করা যাবে তার সীমারেখা মাত্র একটি এবং সেটি হচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতা! একজন মানুষ যত সৃজনশীল সে কম্পিউটারের তত বেশি ব্যবহার বের করতে পারবে! তাই কম্পিউটার দিয়ে আমরা যে রকম হিসাব (Compute) করতে পারি ঠিক সে রকম গান শুনতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি– এমনকী যারা ঘাগু অপরাধী তারা এটা ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারণা পর্যন্ত করে ফেলে!

ছবি 13.10: একটি কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম।

কম্পিউটারের গঠন: যারা কম্পিউটারের ভেতর উঁকি দিয়েছ, নিঃসন্দেহে তাদের মনে হতে পারে এটি খুবই জটিল একটি যন্ত্র কিন্তু তোমরা জেনে খুশি হবে এর কাজ করার মূল বিষয়টি খুবই সহজ। একটা কম্পিউটারের মূল অংশ দুটি– একটি হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর অন্যটি হচ্ছে মেমোরি। (ছবি 13.10) মেমোরির ভেতর নানা ধরনের নির্দেশ বা ইনস্ট্রাকশন জমা করা থাকে, সেগুলো কিছু ডিজিটাল সিগন্যাল ছাড়া আর কিছুই নয়। মেমোরি থেকে এই ইনস্ট্রাকশনগুলো মাইক্রোপ্রসেসরে পাঠানো হয়, মাইক্রোপ্রসেসর কোন ইনস্ট্রাকশনের জন্য কী করতে হবে সেটি জানে এবং তার জন্য বরাদ্দকৃত কাজটি শেষ করে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন ফলাফলটি আবার মেমোরিতে জমা করে দেয়। এভাবে মেমোরিতে রাখা সবগুলো ইনস্ট্রাকশন শেষ করা হলে আমরা বলে থাকি এটা তার প্রোগ্রাম পুরোটা শেষ করেছে। কম্পিউটারের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য শুধু মেমোরির ওপর নির্ভর করা হয় না, পাকাপাকিভাবে যেখানে তথ্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়– সেটাকে আমরা হার্ড ড্রাইভ বলে থাকি।

কম্পিউটারে একটা প্রোগ্রাম চালাতে হলে তার সাথে বাইরে থেকে যোগাযোগ করতে হয়। যে সব যন্ত্রপাতি (কিবোর্ড কিংবা মাউস) দিয়ে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা হয় তাদেরকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস। কম্পিউটার আবার তার তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে দিতে পারে, যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কম্পিউটার বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করে (মনিটর, প্রিন্টার) তাকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস।

তবে আজকাল কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং: প্রত্যেকটা কম্পিউটারেই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC) থাকে যেটি দিয়ে সেটি একটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে এবং কম্পিউটার সেটি দিয়ে তথ্য গ্রহণ করে আবার তথ্যকে প্রেরণ করে।

13.5.5 নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট

একটা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারগুলোকে সাধারণত একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয় যেন একটা কম্পিউটার অন্য একটা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে আবার প্রয়োজন হলে একটা কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের Resource ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের নেটওয়ার্ককে LAN (Local Area Network) বলা হয়ে থাকে। আজকাল LAN তৈরি করার জন্য একটা সুইচের সাথে অনেকগুলো কম্পিউটার যুক্ত করে সুইচগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দিতে হয়। যখন একটা কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের যোগাযোগ করতে হয় সেটি যদি তার নিজের সুইচের সাথে যুক্ত কম্পিউটারের মাঝে পেয়ে যায় তাহলে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে। সেখানে না পেলে অন্য সুইচে খোঁজ করতে থাকে।

ছবি 13.11: নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত একাধিক LAN

একটি প্রতিষ্ঠানের একটি LAN কে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অন্য একটি LAN এর সাথে যুক্ত করার জন্য রাউটার (Router) ব্যবহার করা হয়। (ছবি 13.11) বিভিন্ন নেটওয়ার্ক (Network)- এর নিজেদের মাঝে Inter Connection করে Networking কে Internet বলা হয়। বলা যেতে পারে সারা পৃথিবীর সকল কম্পিউটারই এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অন্যের সাথে যুক্ত আছে।

ইন্টারনেটের ব্যবহার পৃথিবীর তথ্য আদান-প্রদানের জগতে একটি খুব বড় মৌলিক পরিবর্তন এনেছে, এর সত্যিকারের প্রভাব কী হবে, সেটি দেখার জন্য সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

অনুশীলনী

প্রশ্ন:

1. $\hbar$ এর মান খুব কম বলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনিশ্চয়তার সূত্র কোনো প্রভাব ফেলে না। যদি $\hbar$ এর অনেক বড় হতো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী সমস্যা হতো?
2. ভর থেকে যদি শক্তি তৈরি করা যায়, তাহলে কি শক্তি থেকে ভর তৈরি করা সম্ভব হবে?
3. নিউট্রন যদি বিটা কণা বের করে প্রোটনে পরিবর্তিত হতে পারে তাহলে নিউক্লিয়াসের ভেতর সব নিউট্রন ধীরে ধীরে প্রোটনে পরিবর্তিত হয়ে যায় না কেন?
4. আমাদের পরিচিত জগৎটুকু শুধু মাত্র তিনটি ফার্মিওন কণা দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেই তিনটি ফার্মিওন কী কী?
5. তাপমাত্রা বাড়ালে রেজিস্টরের রোধ বেড়ে যায় কিন্তু সেমিকন্ডাক্টরে কমে কেন?

গাণিতিক সমস্যা:

1. একটি ইলেকট্রন 10^6m/s বেগে যাচ্ছে তার ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত? একটি প্রোটন একই বেগে গেলে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত? (সবুজ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $5 \times 10^6 \text{m/s}$)
2. একটা ইলেকট্রনকে একটা প্রোটনের সমান ভর পেতে হলে তাকে কতো বেগে যেতে হবে?
3. $1kg$ ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা হলে সেটি কী পরিমাণ শক্তি দেবে?
4. একটি জীবাশ্মতে যে পরিমাণ C_{14} থাকার কথা তার থেকে 16 গুণ কম আছে। জীবাশ্মটি কত পুরাতন?
5. 317 সংখ্যাটিকে বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সা-ডেসিমেলে প্রকাশ করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

মানুষের জন্য পদার্থবিজ্ঞান
(Physics for Humanity)

Richard Feynman(1918-1988)

রিচার্ড ফাইনম্যান

রিচার্ড ফাইনম্যান একজন আমেরিকান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, কোয়ান্টাম ইলেকট্রো ডিনামিক্সে অবদানের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। পদার্থবিজ্ঞানের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এক ধরনের ছবি ব্যবহার করে গাণিতিক হিসাবের একটি নূতন পদ্ধতি তৈরি করেন, যেটি ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম হিসেবে পরিচিত। স্পেস শাটল দুর্ঘটনার পর তাঁকে তদন্ত কমিশনে রাখা হয় এবং তিনি দুর্ঘটনার কারণটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালটেকে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন শিক্ষক ছিলেন। ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করার আগে পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালটেকে ছিলেন।

অজানাকে জানার জন্য মানুষের একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং সে জন্য বিজ্ঞানী গবেষকরা বিজ্ঞানের নানা রহস্য উন্মোচন করে যাচ্ছেন। পদার্থবিজ্ঞানের অসংখ্য চমকপ্রদ আবিষ্কার আমাদেরকে হতবাক করে দেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, একই সাথে এই চমকপ্রদ আবিষ্কারগুলোকে ব্যবহার করে মানুষের জীবনকে আরো সহজ, আনন্দময় এবং অর্থপূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বিজ্ঞানের এ রকম চমৎকার কয়েকটি আবিষ্কারের কথা এখানে বলা হলো:

14.1 থিওরি অফ রিলেটিভিটি (Theory of Relativity)

তোমরা জান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি বলেছে বস্তুর ভর আর শক্তি একই ব্যাপার, এবং ভর m কে যদি শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাহলে সেই শক্তি E একক এর পরিমাণ হচ্ছে $E = mc^2$, যেখানে c হচ্ছে আলোর বেগ। আলোর বেগ ($3 \times 10^8 m/s$) বিশাল, সেটাকে বর্গ

করা হলে আরো বিশাল হয়ে যায়, যার অর্থ অল্প একটু ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে আমরা বিশাল শক্তি পেয়ে যাব, নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে ঠিক এই ব্যাপারটিই করা হয়।

নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে যেসব জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তার একটি হচ্ছে ইউরেনিয়াম 235 এখানে 92 টি প্রোটন এবং 143 টি নিউট্রন রয়েছে। প্রকৃতিতে এর পরিমাণ খুব কম, মাত্র 0.7%, এর অর্ধায়ু 703,800,000 (704 মিলিয়ন) বৎসর। এই ইউরেনিয়াম 235 নিউক্লিয়াস খুব সহজেই আরেকটা নিউট্রনকে গ্রহণ করতে পারে (যদি সে নিউট্রনের গতি কম হয়) তখন ইউরেনিয়াম 235 পুরোপুরি অস্থিতিশীল হয়ে যায় এটা তখন Kr^{92} এবং Ba^{141} এই দুটো ছোট নিউক্লিয়াসে ভাগ হয়ে যায় তার সাথে সাথে আরো তিনটা নিউট্রন বের হয়ে আসে (ছবি 14.1) যেটা নিচের সমীকরণে দেখানো হয়েছে। কেউ যদি সমীকরণের বাম পাশে যা আছে তার ভর বের করে এবং সেটাকে ডান পাশে যা আছে তার ভরের সাথে তুলনা করে তাহলে দেখবে ডান পাশে ভর কম, যেটুকু ভর কম সেটুকু আসলে $E = mc^2$ এর শক্তি হিসেবে বের হয়ে এসেছে।

$$ {}_{0}^{1}n + {}_{92}^{235}U \rightarrow {}_{36}^{92}Kr + {}_{56}^{141}Ba + 3\,{}_{0}^{1}n $$

এই বিক্রিয়ায় যে তিনটি নিউট্রন বের হয়ে এসেছে, তারা আসলে প্রচণ্ড গতিতে বের হয়ে আসে তাই খুব সহজে অন্য ইউরেনিয়াম (U^{235}) সেগুলো ধরে রাখতে পারে না। কোনোভাবে যদি এগুলোর গতি শক্তি কমানো যায় তাহলে সেগুলো অন্য ইউরেনিয়াম (U^{235}) নিউক্লিয়াসে আটকা পড়ে সেটাকেও ভেঙ্গে দিয়ে আরো কিছু শক্তি এবং আরো তিনটি নূতন নিউট্রন বের করবে। সেই নিউট্রনগুলো আবার অন্য নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে দেবে— এবং এভাবে চলতেই থাকবে, এই প্রক্রিয়াকে বলে চেইন রি-অ্যাকশন।

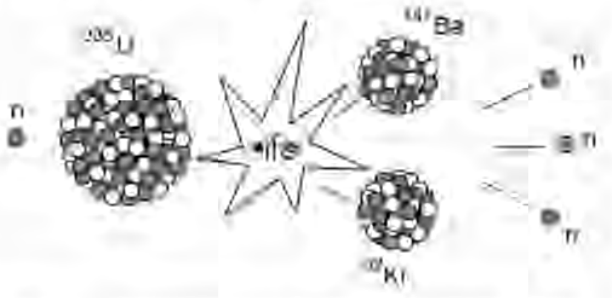

ছবি 14.1: U^{235} নিউক্লিয়াস ভেঙে শক্তি হালকা নিউক্লিয়াস, নিউট্রন এবং শক্তির উৎপাদন।

এই পদ্ধতিতে প্রচণ্ড তাপ শক্তি বের হয়ে আসে, সেই তাপশক্তি ব্যবহার করে পানিকে বাষ্পীভূত করে সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় এবং এ রকম বিদ্যুৎকেন্দ্রকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র! এরকম একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে খুব সহজেই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। তবে এই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার পর যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় সেগুলো ভয়ংকর রকম তেজস্ক্রিয়, তাই সেগুলো প্রক্রিয়া করার সময় অনেক রকম সাবধানতা নিতে হয়। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার পর যে বাড়তি নিউট্রন বের হয় কোনোভাবে সেগুলোকে অন্য কোথাও শোষণ করিয়ে নিতে পারলেই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। নিউট্রনকে শোষণ করার জন্য বিশেষ ধরনের রড নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরে থাকে যেগুলোকে বলে কন্ট্রোল রড।

14.2 লেজার (Laser)

একটা পরমাণুর মাঝে শক্তি দেয়া হলে সেটি উচ্চতর শক্তিতে চলে যেতে পারে। তোমরা যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে পরমাণুর সম্ভাব্য কী কী শক্তি থাকতে পারে বের করো তাহলে দেখবে এই শক্তিগুলোর স্তর একেবারেই সুনির্দিষ্ট– ছবিতে একটা পরমাণুর দুটি শক্তি স্তর সবচেয়ে কম শক্তির স্তর এবং তার উপরের স্তরটি দেখানো হয়েছে। এখন যদি এই পরমাণুর কাছে এই দুটো শক্তিস্তরের পার্থক্যের ঠিক সমান শক্তি আছে এ রকম একটি আলোর কণা পাঠানো হয় তাহলে পরমাণুটি সেই আলোর কণাটিকে গ্রহণ করে নিচের শক্তিস্তর থেকে উপরের শক্তিস্তরে চলে যাবে। এই প্রক্রিয়াটির নাম শোষণ (absorption)। (ছবি 14.2)

কোনো একটা প্রক্রিয়ায় যখন একটি পরমাণু উচ্চতর কোনো শক্তিস্তরে পৌঁছে যায় সেটি কিন্তু সেখানে বেশী সময় থাকতে পারে না– কোনো এক সময় সেটি শক্তির নিচের স্তরে নেমে আসে এবং যেটুকু শক্তি কমে আসে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তির একটি আলোক কণা বের হয়ে আসে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে মোটামোটি একটা আন্দাজ করতে পারলেও ঠিক কোন সময় আলোক কণাটি বের হয়ে আসবে সেটি সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারে না। অর্থাৎ আমরা জানি পরমাণুটি নিচের স্তরে চলে এসে একটি আলোক কণা বের করে দেবে কিন্তু কখন সেটি ঘটবে আমরা সেটি জানি না। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বিচ্ছুরণ (emission)।

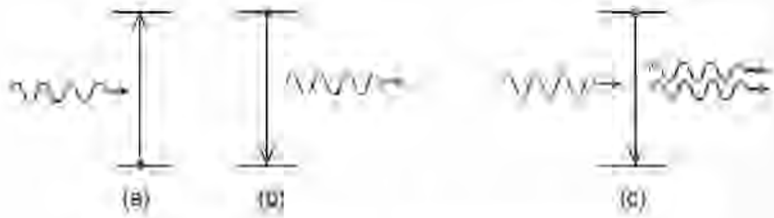

ছবি 14.2: (a) শোষণ (b) বিচ্ছুরণ (c) স্টিমুলেটেড বিচ্ছুরণ

এখন কল্পনা করে নাও যে একটি পরমাণু উপরের শক্তি স্তরে আছে– তুমি জান যে এটা নিচের স্তরে নেমে এসে একটি আলোর কণা বের করে দেবে, কিন্তু কেউই জানে না সেটি ঠিক কখন ঘটবে। কিন্তু তুমি যদি ঠিক একই শক্তির একটি আলোক কণা সেই পরমাণুর কাছে পাঠাও তাহলে একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে। এই আলোক কণাটি তখন পরমাণুকে বাধ্য করবে ঠিক সেই মুহূর্তে আলোক কণাটি ত্যাগ করতে ! অর্থাৎ তুমি একটি আলোক কণা পাঠাবে এবং দুটি আলোক কণা ফেরত পাবে। এই ধরনের আলোর বিচ্ছুরণকে বলে স্টিমুলেটেড এমিশন (stimulated emission)। এই স্টিমুলেটেড এমিশনই হচ্ছে লেজার তৈরির রহস্য।

লেজার তৈরি করতে হলে কোনো একটা পদ্ধতিতে পরমাণুগুলোকে উচ্চ শক্তিস্তরে নিয়ে যেতে হয়। যে পদ্ধতিতে পরমাণুগুলো উচ্চ শক্তি স্তরে নেয়া হয় সেটাকে বলে পাম্পিং। পাম্পিং করে পরমাণুগুলোকে উচ্চ শক্তি স্তরে নেয়ার পর সেখানে সেগুলো নিচের শক্তিস্তরে এসে আলোক কণা বের করে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তখন যদি একটি আলোক কণা হাজির হয় সেটি একটি পরমাণু থেকে আরেকটি আলোক কণা বের করে আনে। সেই দুটি আলোকে কণা তখন অন্য দুটি পরমাণু থেকে

আরো দুটি আলোক কণা বিচ্ছুরিত করে। এই চারটি তখন অন্য চারটি থেকে বিচ্ছুরিত করে এবং মুহূর্তে সবগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে তীব্র শক্তিশালী আলোক রশ্মির জন্ম দেয়। আমরা সেই আলোকে বলি LASER যেটি আসলে Light Emission by Stimulated Emission or Radiation কথাটির প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর।

সব পরমাণুতেই শক্তি প্রয়োগ করে উচ্চ শক্তিস্তরে নেয় যায়, কিন্তু আসলে যে কোনো পরমাণু দিয়ে লেজার তৈরি করা যায় না– পরমাণুর শক্তির স্তরগুলোর অন্য বৈশিষ্ট্যও থাকতে হয়। কাজেই সঠিক শক্তি স্তর পাম্পিং সহজ পদ্ধতি ইত্যাদি অনেকগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় থাকলেই সেটাকে লেজার বানানো যায়। 14.3 ছবিতে একটা আরগন আয়ন লেজারের ছবি দেখানো হয়েছে।

ছবি **14.3:** একটি আর্গন আয়ন লেজার

14.3 প্লেন (Plane)

তোমরা সবাই আকাশে প্লেনকে উড়ে যেতে দেখেছ এবং এটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যে কেমন করে এত বড় এবং ভারী একটা প্লেন আকাশে উড়ে যেতে পারে এবং উড়তে উড়তে কেন এটা নিচে পড়ে যায় না। এর উত্তরটাও আসলে পদার্থবিজ্ঞানের একটা সূত্রের মাঝে লুকিয়ে আছে। সূত্রটিকে বলা হয় বার্নুলির সূত্র। কোথাও যদি বাতাসের প্রবাহ হয় তাহলে সেই প্রবাহটিকে বিবেচনায় রেখে শক্তির নিত্যতার সূত্রটিকে এভাবে লেখা যায়: যদি বাতাসের চাপ হয় P, ঘনত্ব ρ বেগ v এবং উচ্চতা h হয়, তাহলে

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h$$

এর মান অপরিবর্তিত থাকে।

আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করে দেখাতে পারি কেন প্লেন আকাশে উঠতে পারে। খালি চোখে পাখার প্রস্থচ্ছেদের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই মনে হলেও আসলে কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে: এর নিচের অংশ সোজা কিন্তু উপরের অংশ বাঁকা। 14.4 ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে সেভাবে পাখার নিচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দূরত্ব কম, কিন্তু পাখার উপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দূরত্ব

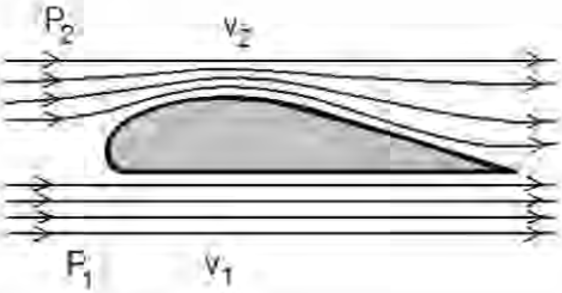

ছবি **14.4:** যানের পাখা ঘিরে বহমান বাতাসের স্তর।

তুলনামূলকভাবে বেশি।

একটা প্লেন যখন সামনের দিকে এগিয়ে যায় তখন পাখার উপর এবং নিচ দিয়ে বাতাসে বয়ে যায়। আমরা ব্যাপারটিকে সহজভাবে বোঝার জন্য কল্পনা করে নিই যে পাখাটি স্থির বরং বাতাসের স্তরটি প্লেনের গতিতে পাখার নিচ এবং উপর দিয়ে অতিক্রম করছে।

ধরা যাক পাখার নিচ দিয়ে যে বাতাস অতিক্রম করছে তার বেগ v_1, তাহলে পাখার উপর দিয়ে যে বাতাস অতিক্রম করছে তার গতিবেগ যদি v_2 হয় তাহলে v_2 নিশ্চয়ই v_1 থেকে বেশি হবে। কারণ পাখার উপরের অংশের দূরত্ব নিচের অংশ থেকে বেশি এবং একই সময়ে সেই বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে তার বেগ v_2 বেশি হতেই হবে। এখন পাখার নিচের অংশে বাতাসের চাপ P_1 এবং উপরের অংশের চাপ যদি P_2 হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি :

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

চাপকে ক্ষেত্রফল দিয়ে গুণ করলে বল পাওয়া যায়। পাখার উপরে এবং নিচে উচ্চতা সমান ধরে নিলে $h_1 = h_2$

$$P_1 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) + P_2$$

অর্থাৎ P_1 এর চাপ P_2 থেকে $\frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$ বেশি।

যেহেতু নিচে চাপ বেশি তাই সেটা বিমানের পুরো পাখার উপর বাড়তি বল প্রয়োগ করবে। এই বলটি যখন বিমানের ওজন থেকে বেশি হয়ে যায় তখন বিমানটি আকাশে উড়ে যেতে পারে।

তোমরা খুব সহজে এই পরীক্ষাটি করে দেখতে পার। 14.5 ছবিতে দেখানো উপায়ে একটা কাগজের উপর ফুঁ দাও, তোমার মনে হতে পারে ফুঁ- এর কারণে কাগজটা নিচে নেমে যাবে, কিন্তু দেখবে আসলে কাগজটা উপরে উঠে আসবে ঠিক বার্নুলির সূত্র যেভাবে দাবি করেছে!

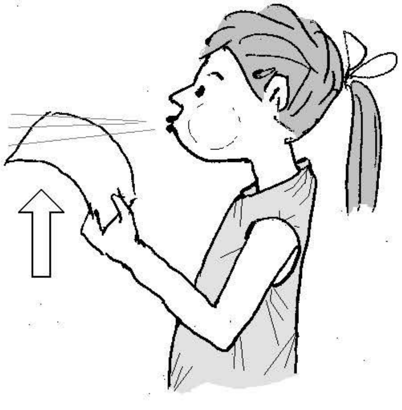

ছবি **14.5:** কাগজে ফুঁ দিলে সেটি উপরে উঠে যায়।

14.4 প্রতিপদার্থ (Anti Particle)

পদার্থ বিজ্ঞানের সবচে চমকপ্রদ একটি বিষয় হচ্ছে প্রতিপদার্থ। প্রত্যেকটি পদার্থেরই একটি প্রতি পদার্থ থাকে এবং যদি পদার্থ এবং প্রতিপদার্থ একে অন্যের সংস্পর্শে আসে তাহলে তারা একে অপরকে অদৃশ্য করে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনেকের ধারণা হতে পারে এটি বুঝি পদার্থবিজ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক

বিষয় এবং বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই; কিন্তু সেটি সত্যি নয়, এর শুধু যে অস্তিত্ব আছে তা নয় পদার্থ এবং প্রতিপদার্থের শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়াকে ব্যবহার করে Position Emission Tomography নামে শরীরের ভেতরে ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার একটি বিস্ময়কর যন্ত্র পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। (ছবি 14.6)

ছবি 14.6: পজিট্রন এমিশান টমোগ্রাফি (Position Emission Tomography) নামে শরীরের ভেতরে ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার একটি বিস্ময়কর যন্ত্র

কারো শরীরের ভেতরে ছবি তোলার আগে সেই মানুষটির শরীরে পজিট্রন নির্গত করে এ রকম একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মেশানো গ্লুকোজ ঢুকিয়ে দেয়া হয়। শরীরের যে কোষ যত বেশি সক্রিয় সেই কোষ তত বেশি গ্লুকোজ ব্যবহার করে এবং সেখানে এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটি জমা হয়। এই আইসোটোপ থেকে পজিট্রন নামে ইলেকট্রনের প্রতিপদার্থটি বের হয় এবং প্রায় সাথে সাথে কাছাকাছি কোনো ইলেকট্রনের সংস্পর্শে এস শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং শক্তি হিসেবে দু'টো গামা রশ্মি ত্যাগ করে

$$e + e^{+} \rightarrow 2\gamma$$

PET নামে শরীরের ভেতরকার সক্রিয় অংশের ছবি তোলার এই যন্ত্রটি এই দুটি গামা রশ্মিকে detect করে এবং নিখুঁত হিসাব করে গামা রশ্মি দুটি ঠিক কোথা বের হয়ে এসেছে সেটি বের করে ফেলে। সেই তথ্যগুলো দিয়ে কোথায় কোথায় শরীরের কোষ বেশি সক্রিয় সেটি বের করা হয়।

Position Emission Tomography ব্যবহার করে মস্তিস্কের ভেতরে কোন অংশ বেশি সক্রিয় সেটিও বের করা যায়। একজন মানুষ যখন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তখন কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় মস্তিস্কের কোন অংশ সক্রিয় হয়ে উঠে সেখান থেকে মস্তিস্কের কার্যকলাপের একটি নূতন দিগন্ত বের হয়ে আসতে শুরু করেছে।

এটি হয়তো খুব বেশি দেরি নেই যখন একজন মানুষের মস্তিস্কের সক্রিয়তা দেখেই আমরা সেই মানুষের মনের কথা বলে দিতে পারব।

মানুষের কল্যাণের জন্য পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে আরো কী কী আবিষ্কার করা হয়েছে তার তালিকা কখনো শেষ হবার নয়। এই বইয়ে এই চারটি মাত্র উদাহরণ দেয়া হল তোমরা নিশ্চয়ই এ রকম আরো অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে বের করতে পারবে!

পরিশিষ্ট - 1

A1.1 ঘন কোণ

আমরা জ্যামিতি পড়ার সময় যে কোণ আঁকি, সেটি সব সময় একটি সমতলে আঁকা হয়। সেই কোণগুলি দ্বিমাত্রিক। কিন্তু ত্রিমাত্রিক কোণও হতে পারে (ছবি A.1)। সেই কোণটিকে বলে ঘন কোণ, তার পরিমাণ

$$\Omega = \frac{A}{r^2}$$

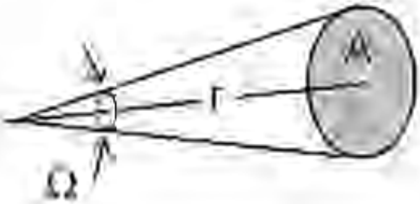

ছবি A1.1: ঘন কোণ

যেখানে A হচ্ছে একটি ক্ষেত্রফল এবং r হচ্ছে আপতিত কোণ থেকে সেই ক্ষেত্রফলের দূরত্ব। তোমরা জান সমতলে একটি বিন্দুতে সর্বোচ্চ কোণ 2π, ঘন কোণের বেলায় একটি বিন্দুতে সবচেয়ে বড় কোণ 4π Steredion.

A1.2 এসি ডিসি

এসি (AC) বলতে বোঝানো হয় Alternating Current অর্থাৎ যে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়মিতভাবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে পরিবর্তন হয়। ডিসি (DC) হচ্ছে Direct Current অর্থাৎ যার পরিবর্তন হয় না। নবম অধ্যায়ে সেটি আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা আছে।

পরিশিষ্ট - 2

পরমানুর তালিকা (List of Elements)

(প্রথম কলামে পারমানবিক সংখ্যা, দ্বিতীয় কলামে পরমানুর নাম, তৃতীয় কলামে পরমানুর প্রতীক। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি তারকা দিয়ে দেখানো হয়েছে।)

1	Hydrogen	H
2	Helium	He
3	Lithium	Li
4	Beryllium	Be
5	Boron	B
6	Carbon	C
7	Nitrogen	N
8	Oxygen	O
9	Fluorine	F
10	Neon	Ne
11	Sodium	Na
12	Magnesium	Mg
13	Aluminum	Al
14	Silicon	Si
15	Phosphorus	P
16	Sulfur	S
17	Chlorine	Cl
18	Argon	Ar
19	Potassium	K
20	Calcium	Ca
21	Scandium	Sc
22	Titanium	Ti
23	Vanadium	V
24	Chromium	Cr
25	Manganese	Mn
26	Iron	Fe
27	Cobalt	Co
28	Nickel	Ni

29	Copper	Cu
30	Zinc	Zn
31	Gallium	Ga
32	Germanium	Ge
33	Arsenic	As
34	Selenium	Se
35	Bromine	Br
36	Krypton	Kr
37	Rubidium	Rb
38	Strontium	Sr
39	Yttrium	Y
40	Zirconium	Zr
41	Niobium	Nb
42	Molybdenum	Mo
43	Technetium*	Tc
44	Ruthenium	Ru
45	Rhodium	Rh
46	Palladium	Pd
47	Silver	Ag
48	Cadmium	Cd
49	Indium	In
50	Tin	Sn
51	Antimony	Sb
52	Tellurium	Te
53	Iodine	I
54	Xenon	Xe
55	Cesium	Cs
56	Barium	Ba

57	Lanthanum	La
58	Cerium	Ce
59	Praseodymium	Pr
60	Neodymium	Nd
61	Promethium*	Pm
62	Samarium	Sm
63	Europium	Eu
64	Gadolinium	Gd
65	Terbium	Tb
66	Dysprosium	Dy
67	Holmium	Ho
68	Erbium	Er
69	Thulium	Tm
70	Ytterbium	Yb
71	Lutetium	Lu
72	Hafnium	Hf
73	Tantalum	Ta
74	Tungsten	W
75	Rhenium	Re
76	Osmium	Os
77	Iridium	Ir
78	Platinum	Pt
79	Gold	Au
80	Mercury	Hg
81	Thallium	Tl
82	Lead	Pb
83	Bismuth	Bi

84	Polonium*	Po
85	Astatine*	At
86	Radon*	Rn
87	Francium*	Fr
88	Radium*	Ra
89	Actinium*	Ac
90	Thorium*	Th
91	Protactinium*	Pa
92	Uranium*	U
93	Neptunium*	Np
94	Plutonium*	Pu
95	Americium*	Am
96	Curium*	Cm
97	Berkelium*	Bk
98	Californium*	Cf
99	Einsteinium*	Es
100	Fermium*	Fm
101	Mendelevium*	Md
102	Nobelium*	No
103	Lawrencium*	Lr
104	Rutherfordium*	Rf
105	Dubnium*	Db
106	Seaborgium*	Sg
107	Bohrium*	Bh
108	Hassium*	Hs
109	Meitnerium*	Mt

পরিশিষ্ট - 3

মৌলিক ধ্রুব সমূহ (Fundamental Constants)

নাম	প্রতীক	মান
আলোর বেগ	c	$2.9979258 \times 10^{8}\, m/s$
প্লাংকের ধ্রুবক	h	$6.62660755 \times 10^{-34}\, Js$
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক	G	$6.67259 \times 10^{-11} m^{3}/kg\, s^{2}$
বোল্টজম্যান ধ্রুবক	k	$1.380658 \times 10^{-23}\, J/K$
গ্যাস ধ্রুবক	R	$8.3144621\, J/mol\, K$
অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা	N_A	$6.0221 \times 10^{23}/\, mol$
ইলেক্ট্রনের চার্জ	e	$1.6021733 \times 10^{-9}\, C$
কুলম্বের ধ্রুবক	K	$8.987552 \times 10^{5}\, N\, m^{2}/C$
ইলেক্ট্রনের ভর	m_e	$9.1093897 \times 10^{-31}\, kg$
প্রোটনের ভর	m_p	$1.6726231 \times 10^{-27} kg$
নিউট্রনের ভর	m_n	$1.6749286 \times 10^{-27} kg$
বাতাসের চাপ	atm	10132.5 Pa